শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রত্যাশা

ড. আলী আসগর

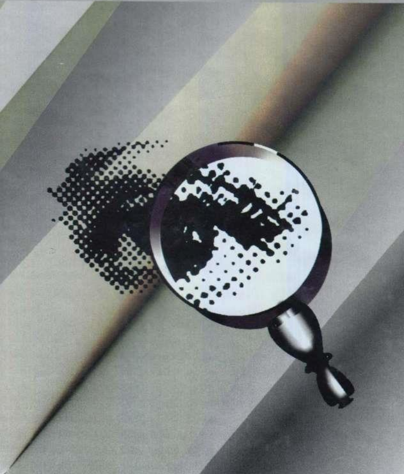

শিক্ষা
ও
উন্নয়ন প্রত্যাশা

ড. আলী আসগর

আগামী প্রকাশনী

www.pathagar.com

(শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রত্যাশা)

তৃতীয় মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৮ আগস্ট ২০১১
দ্বিতীয় মুদ্রণ মাঘ ১৪০৬ জানুয়ারি ২০০০
প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৪০৪ নভেম্বর ১৯৯৭

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১

প্রচ্ছদ সমর মজুমদার

মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন ঢাকা

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

Shikkha O Unnayan Prattasha. By Dr. Ali Asger

Published by Osman Gani of Agamee Prakashani
36 Banglabazar, Dhaka-1100, Bangladesh.
Phone : 711-1332, 711-0021
e-mail : info@agameeprakashani-bd.com

ISBN 984 401 454 9

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

www.pathagar.com

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ সোনার তরী কবিতায় একটি করুণ ছবি এঁকেছেন। ছোট্টতরী তাঁরই সোনার ধানে ভরে গেছে, সেখানে কবির ঠাঁই নেই। কিন্তু ভাবা যাক একজন অদক্ষ কৃষকের কথা। বিশাল মাঠে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে অজস্র ফসল জন্মেছে। কিন্তু সেগুলো সোনালী বরণ লাভ করার আগেই বন্যায় ডুবে যাচ্ছে ফসলের ক্ষেত। কৃষককে সামান্য কিছু অপক্ক ফসল দ্রুত তুলে দিতে হচ্ছে ভাঙ্গা ডিঙিতে। কৃষকের ঠাঁই পাবার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যে দুঃখটি বড় হয়ে ধরা পড়ছে তা হল—কত সামান্য ফসলই না তোলা হল এবং সেটাও অযত্নে, অদক্ষতায়, অপক্ক অবস্থায়। তবু একটি শান্ত্বনা ফসলের জমিতেই কৃষক থেকে যাচ্ছে। হয়তো আগামী মৌসুমে আরো সুন্দর ফসল আরো যত্নে, সে না হোক অন্য কেউ, তুলে দেবে বড় কোন তরী পূর্ণ করে। এক্ষেত্রে প্রকাশক বন্যার মতই সৃষ্টি করেছিল সময়ের তাড়া।

শিক্ষার সম্পর্ক জ্ঞানের সঙ্গে যার জগৎ বিপুল ও বিকাশমান। মানুষের সবচেয়ে দুঃসাহসিক অভিযান হল জ্ঞানের জগতে। জ্ঞানের সংগ্রহ, সঞ্চারণ, সংযোজন এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টির যে আয়োজন, যাকে আমরা শিক্ষা বলি, সেটাই মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় উদ্ভাবন। জ্ঞানের বিকাশমানতার যে গল্প, তা ভাল হোক অথবা মন্দ, সেটা মানুষেরই গল্প। জ্ঞানের সাধনা মানুষকে দিয়েছে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের অপরিসীম ক্ষমতা। মানুষের এই জ্ঞান ক্রম বিস্তারমান। এই জ্ঞান শুধু পুঞ্জিভূত হয়না, এর বৃদ্ধি লাভ ও বিকাশ ঘটে বিপকীয় প্রক্রিয়ায় যেখানে সঞ্চিত জ্ঞান অথবা বাইরে থেকে পাওয়া তথ্য ও অভিজ্ঞতাই এর খাদ্য। শিক্ষা তাই যান্ত্রিক নয়, একটি জৈব ব্যবস্থার মতন।

আমরা এমন একটি সময়ে এসে পৌঁছেছি যেখানে জ্ঞানের সংগ্রহ ও অগ্রগতি জ্ঞানের বিকাশের ইতিহাস ও জ্ঞানের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেও বোধগম্য করছে। শুধু বাইরের জগৎ সম্পর্কেই উপলব্ধি দিচ্ছে না, জ্ঞানের গঠন, এর নানা উপাদান ও এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কেও উপলব্ধি সৃষ্টি করছে। ভৌতজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবিক বিদ্যা, সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও আচরণ বিজ্ঞান অভূতপূর্ব বিকাশ লাভ করেছে— যা একই সঙ্গে মানুষের উদ্ভব, তার আত্মপরিচয়, অন্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং সমাজ, প্রকৃতি ও মহাবিশ্বে তার অবস্থান জানতে সাহায্য করেছে। বহির্বিশ্ব সম্পর্কে মানুষের নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞান যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, অর্থাৎ মানুষ আত্মকেন্দ্রিকতা কাটিয়ে নিরপেক্ষ ও নির্মোহ দৃষ্টিতে বিশ্বকে জানতে পেরেছে, তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে তার জ্ঞানের আভ্যন্তরীণতা ।

নিজেকে নিগূঢ়ভাবে জানার একটি দৃষ্টান্ত হল, ইতিহাস সচেতনতা। ইতিহাস এখন আর বাহ্যিক যুদ্ধবিগ্রহ বা মহাকাশ ভ্রমণের ঘটনার বিন্যাসে নির্মিত নয়। বাহ্যিক ইতিহাসের ঘটনার আড়ালে ব্যক্তি মানুষের অবদান, তার মনস্তত্ত্ব, তার উদ্ভাবন ও

www.pathagar.com

আবিষ্কার, কর্মস্পৃহা ও অনুপ্রেরণা কাজ করে। আধুনিক ইতিহাসের মূল উপাদান এই জ্ঞানের আবিষ্কার ও তার আবিষ্কারক।

বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতির মূলে কাজ করেছে দুটো ঘটনা। এর একটি হল মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। অভিনব সব যন্ত্রের উদ্ভাবন, পরীক্ষা ও পরিমাপ মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সূক্ষ্মতা ও বিস্তার অপরিসীম বৃদ্ধি করেছে। পরমাণুর অভ্যন্তর থেকে দূরতম অপসৃয়মান গ্যালাক্সির খবর সে জানছে। এটা মানুষের বাহ্যিক জ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির দৃষ্টান্ত।

অন্যটি হল বিজ্ঞানীদের গণিতের ব্যবহার ও তত্ত্ব সৃষ্টি। গণিত বস্তুত মানুষের মস্তিষ্কের অন্তর্গত গঠন ও চিন্তা, তার কল্পনা, যুক্তি ও স্বজ্ঞার বাহ্যিক প্রতিচ্ছবি। এটা মানুষের অন্তর্নিহিত নিগূঢ় চিত্র তুলে ধরে। আধুনিক মানুষ এই ভিতরের জ্ঞান ও বাইরের জ্ঞানকে সমন্বিত করে উদঘাটন করছে বিশ্বজগতের রহস্য। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব, যা মানুষের মননশীলতার চরম পরাকাষ্ঠা, তা সমগ্র মহাবিশ্বকে ধারণ করেছে একটি গাণিতিক সূত্রের মধ্যে। এই তত্ত্বেরই অনিবার্য চিত্র বিস্ফোরমান মহাবিশ্বের যা ধরা পড়েছে হাবল্ এর বাহ্যিক পর্যবেক্ষণে।

প্রকৃতির নিয়মগুলো জেনে আমরা এখন পরিকল্পনা করতে পারি এখন থেকে অনেক বৎসর পরের ভবিষ্যৎ, আগে যা সম্ভব ছিল না। এই দক্ষতা অর্জনের পিছনের কাজ করেছে মহাবিশ্বের ও জীবজগতের বিবর্তনের তত্ত্ব আবিষ্কার। বিশ্বজগতের পরিবর্তনের প্যাটার্ন সম্পর্কে সচেতনতা এখন জ্ঞানের বিবর্তন সম্পর্কেও আমাদের সচেতন করেছে। সময়ের সঙ্গে আমরা ক্রমাগত গভীরতর রূপে জানছি জ্ঞানের সৃষ্টি তত্ত্ব, জানছি জ্ঞান কিভাবে সঞ্চারিত হয়, সংরক্ষিত হয়, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও উদ্ভাবিত হয়। আমরা এখন আগে থেকে জ্ঞানকে প্রোগ্রাম করতে পারি। জ্ঞান যদি ক্ষমতা হয়, তাহলে জ্ঞান কিভাবে সৃষ্টি করা যায় ও নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই জ্ঞান হচ্ছে উন্নততর জ্ঞান।

জ্ঞান আগে এত দ্রুত বৃদ্ধি পেত না এখন যা ঘটছে। এক সময় যেখানে জ্ঞান দ্বিগুণ হতে সহস্র বছর লেগে যেত অথবা তারও বেশি, এখন সেই জ্ঞান দ্বিগুণ হচ্ছে প্রায় প্রতি দশ বছরে। এটি সম্ভব হচ্ছে কারণ, জ্ঞানকে আমরা ক্রমাগত বেশি করে মস্তিষ্কের বাইরে সংরক্ষণ করতে পারছি। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য জ্ঞানের সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু জ্ঞান যেখানে নিছক উপাত্ত বা তথ্যের স্থির কাঠামো, সেখানে তা বুদ্ধির ব্যাপার নয়। এক সময় তথ্য মুখস্থ করা শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। এখন সে কাজটা করতে পারে কম্পিউটারের স্মৃতিধর।

জ্ঞানের বিকাশের এই ত্বরান্বিত গতি একটি জটিল প্রক্রিয়া। জ্ঞানের বিকাশ জ্ঞানের নতুন মাধ্যম দিয়েছে, যা আবার কাজ করেছে জ্ঞানের ত্বরান্বিত বিকাশে এবং এর গঠনকে বদলে দিতে। এই নতুন অবস্থা জ্ঞানের মাধ্যমকেও বদলে দিচ্ছে ত্বরান্বিতগতিতে। আমরা জ্ঞানের বিকাশের কালিক চিত্রকে দেখতে পারি একটি ফানেলের মতন, যার প্রশস্ত মুখটা সময়ের সম্মুখ দিকে। শুধু তাই না এই ফানেলের প্রশস্ততাও সময়ের সঙ্গে বেশি হারে বাড়ছে।

www.pathagar.com

এ কথা এখন স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, উন্নয়ন এখন মানবিক প্রচেষ্টার ফসল। অর্থ সংগ্রহের জন্যেও শিক্ষিত মানুষ চাই, যেমন চাই প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহারের জন্যে ও বাজার সৃষ্টির জন্যে। অর্থনৈতিক ফলগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্নয়ন এনে দেয় না। মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং উচ্চমানের সাধারণ শিক্ষা অর্থনীতির চাকাকে ঘুরায়। একটি জাতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ তাই এর শিক্ষিত জনশক্তি। শিক্ষা অগ্রাধিকার না পেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে উন্নয়ন প্রত্যাশা ও কর্মস্পৃহা সৃষ্টি হয় না, এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় — যোগ্য, দক্ষ ও সৎ নেতৃত্ব নির্বাচনেও তারা ব্যর্থ হয়। একটি দেশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও অব্যাহত অগ্রগতির ধারায় পরিচালিত করতে হলে প্রাথমিকভাবে বড় ধরনের বিনিয়োগ করতেই হবে শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং সেজন্য ত্যাগও স্বীকার করতে হবে সবাইকে।

জ্ঞান কোন নিরপেক্ষ ও নিরীহ ব্যাপার নয়। জ্ঞান সমস্যার সমাধান দিতে পারে, আবার সমস্যা সৃষ্টিও করতে পারে। কারণ, ব্যক্তি মানুষের আচরণ যেমন, তেমনি সামাজিক আচরণ বদলে দেয় শিক্ষা। একটি মানুষের সামগ্রিক আচরণ শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত তার জানা তথ্য, তার অভিজ্ঞতা ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে তার উপলব্ধির দ্বারা। এর অর্থ এই নয় যে, উপদেশ বা শাসন কিংবা কিছু তথ্য মুখস্ত করালে কোন ব্যক্তির আচরণ বদলে যাবে।

পরিবেশিত তথ্য,তত্ত্ব বা আদর্শ কতটা গ্রহণ করবে কোন শিক্ষার্থী, তা নির্ভর করে তার আগের লব্ধ জ্ঞান ও উপলব্ধির উপরে। একটি জাতিও কতটা জ্ঞান শোষণ করে নেবে তা নির্ভর করে এর প্রস্তুতির উপরে। কোন ব্যক্তি বা জাতির আচরণ এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টির ভিতর দিকে পরিবর্তিত হবার যে শক্তি, তা উপলব্ধ জ্ঞানের অপেক্ষক এটা জানা গেলেও, এদের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া ও নির্ভরতার গঠন বা রূপটি এখনো অনাবিষ্কৃত। শিক্ষাদান প্রক্রিয়া তাই জটিল।

জ্ঞান যে বিপজ্জনক তার দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই ইতিহাসে। সক্রেটিসকে বিষ পান করিয়ে হত্যা, ব্রুনোকে পুরিয়ে মারা, গ্যালিলিওকে গৃহ বন্দী করা— সবই নতুন জ্ঞানের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিক্রিয়া। এ সমস্যা এখনো আছে এবং ততদিন থাকবে, যতদিন না নতুন জ্ঞান ও তার প্রভাবকে সাহসিকতা ও দায়িত্বের সঙ্গে সমাজ গ্রহণ করতে পারে। এটি তখনই ঘটে যখন একটি সমাজ বা রাষ্ট্রের জনগন এই দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করে যে, একটি স্বাধীন ও উন্নত জাতি সত্যি গড়ে তোলা সম্ভব, শিক্ষার ভিতর দিয়ে।

সমাজ যতই বিভক্ত হোক ও পশ্চাদপদ—সব মানুষকে যথার্থ যোগ্যতায়, স্বাধীনতাবোধে ও আত্মবিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব, এই বিশ্বাস ও উপলব্ধি ছাড়া কোন শিক্ষক বা সমাজকর্মী সফল হতে পারে না তাঁর কাজে।

শিক্ষা মানুষকে বদলে দিতে পারে এবং সমাজকেও, ফলে, আমাদের উন্নয়ন প্রত্যাশা ও অস্তিত্বের ভিত্তি শিক্ষা এমন একটি প্রতীতি নিয়েই এই বইয়ের প্রবন্ধগুলো লেখা। "শিক্ষা ও উন্নয়ন" এবং "শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ" এই দুটি ছাড়া বাকী সবগুলো প্রবন্ধই বিভিন্ন পত্রিকা ও সেমিনারের জন্য লেখা হয়েছিল। সময়ের ব্যবধান ও পরিবেশের ভিন্নতা প্রবন্ধগুলোকে স্বভাবতই কিছুটা বিচ্ছিন্নতা দিয়েছে। একটি বইয়ে

www.pathagar.com

একত্রে সন্নিবেশিত করার পূর্বপরিকল্পনা নিয়ে লেখা হলে যে অন্তর্গত মিল বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারতো, তা এক্ষেত্রে হয়তো ঘটেনি। একই কারণে কিছু কিছু বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কিন্তু এটি শিক্ষাবিষয়ক পূর্ণাঙ্গ কোন গ্রন্থ নয়। শিক্ষা ও গবেষণার কাজে, ক্লাসরুমে ও গবেষণা ল্যাবে, বা ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে যে সব বাস্তব সমস্যা উপলব্ধি করেছি, তারই আলোকে প্রবন্ধগুলো লেখা।

পরিপাটি পোশাকে দূরে পারে দাঁড়িয়ে নদীর দৃশ্য যিনি দেখেন, নদী সম্পর্কে তার দৃষ্টি হতে পারে দার্শনিকের বা শিল্পীর। শিক্ষার তরঙ্গায়িত অস্থির নদীতে শিক্ষক ও গবেষকের অবস্থান ধীবরের মতন। তাঁর সাথে কাঁদা মাটির গন্ধ ও অবিন্যাসের চিহ্ন থাকবেই।

আমি ব্রুনোর মতন সাহসী নই অথবা গ্যালিলিউয়ের মতন প্রতিভাবান। তবু তাঁদের দুর্ভোগের যন্ত্রনা কিছুটা হলেও অনুভব করেছি। ধর্মের অপব্যাখ্যা এবং বুদ্ধির অসততা যে উন্মাদনা ও হিংস্রতার আগুন জ্বালাতে পারে, তার উত্তাপ কিছুটা অন্তত অনুভব করেছি অনেটা ব্রুনোর মতন। এবং প্রায় গৃহবন্দী থেকে এই বইয়ের কাজ শেষ করার সময়, কিছুটা হলেও, উপলব্ধি করেছি গ্যালিলিউ-এর নির্বাসিত ও নিঃসঙ্গ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা। যাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে এই উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে এবং যাঁরা সব জেনেও নীরবতা ও ভীরুতা দিয়ে পরোক্ষ সমর্থন দিয়েছে সন্ত্রাসকে তাঁদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। বরং আমি তাদের কাছে একার্থে কৃতজ্ঞ এই জন্যে যে তাদের আচরণে আমি আরো স্পষ্ট করে বুঝতে পেরেছি সমস্যাটি শিক্ষার। যে জ্ঞান প্রকাশসাধ্য নয়, ব্যক্তিগত, তা যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, সাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সে শিক্ষা বাধ্যতামূলক ভাবে প্রদানের চেষ্টা অনিবার্যভাবে সংঘাত সৃষ্টি করবে, এই পূর্বাভাসের বাস্তব প্রমাণ আমরা পেয়েছি—শিক্ষা দর্শন ও আমাদের শিক্ষা কাঠামো প্রবন্ধে এই কথাটি আগে উল্লেখ করেছিল।

গত শতাব্দীর মাঝামাঝি ডিজরেলি যুক্তরাজ্যে শিক্ষার অসম বিস্তার প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'একটি দেশ কিন্তু দুটি জাতি'। আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এই উক্তিটি একাধিক অর্থে সত্যি। আমরা জাতি হিসাবে বিভক্ত হয়ে পড়ছি শিক্ষা ব্যবস্থা নানাভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ার জন্যে। লক্ষণীয় যে বৈচিত্র্য শিক্ষাকে বিভক্ত করে না, যতক্ষণ বিষয়গুলো প্রকাশসাধ্যতার শর্ত মানে। শুধু দেশের সীমার মধ্যেই নয়, সমগ্র বিশ্বের পটভূমিতে ও প্রবহমান কালের প্রেক্ষাপটে শিক্ষাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গতিশীল রাখতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে আধুনিক। শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হবে না পূর্ব নির্ধারিত কোন অবিচল নীতি, বা আদর্শ দ্বারা, বরং শিক্ষাই নবনব জ্ঞানের অন্তহীন ধারায় নির্ধারণ করবে আমাদের নীতি ও আদর্শ। এই বইয়ের প্রবন্ধগুলো যদি একক কোন ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে তা হল, জ্ঞানের এই বিকাশমানতা।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
১০ অক্টোবর ১৯৯৭

ড. আলী আসগর

www.pathagar.com

সূচীপত্র

শিক্ষাদর্শন ও আমাদের শিক্ষা কাঠামো ১১
উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ২৬
শিক্ষার জৈব ভিত্তি ৬০
মানব শিশু-শিক্ষা লাভের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যার জন্ম ৭০
শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ৮০
বিজ্ঞান শিক্ষা ৯৭
জীবনের মান উন্নয়নে বিজ্ঞান ১১০
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ১১৭
বিশ্ববিদ্যালয় গোলযোগের কেন্দ্র নয়—ভবিষ্যতের স্বপ্নরাজ্যও ১২৩
প্রসঙ্গ: বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৪
সেশন জট—যান্ত্রিক উপমার আলোকে ১৪০
পরীক্ষা ব্যবস্থা ১৪৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

শিক্ষাদর্শন ও আমাদের শিক্ষা কাঠামো

শিক্ষাদর্শন একটি জটিল,ব্যাপক ও বিতর্কিত বিষয়। ফলে এই বিষয়টি নিজেই একটি বিশাল পরিসর দাবি করে। যদি শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র আমরা তুলে ধরতে চাই স্বভাবতঃই এজন্য একটি সহজ পথ হল, শিক্ষাদর্শনকে দার্শনিক আলোচনার বিষয় হিসেবে শিক্ষাকাঠামোর আলোচনা থেকে বাইরে রাখা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদর্শনকে শিক্ষাকাঠামো নির্ধারণের আলোচনায় না আনলেও, পরোক্ষভাবে শিক্ষাদর্শন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সামগ্রিক আয়োজনকে প্রভাবিত করতে পারে। এই কারণেই বিতর্কিত হবার এবং শিক্ষাদর্শনের গভীর আবর্তে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়েও, শিক্ষাদর্শনের প্রসঙ্গটি শিক্ষা কাঠামোর আলোচনায় টেনে আনা শেষ বিচারে সহায়ক।

দুটি ব্যাপার শিক্ষাদর্শন আলোচনার প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই। শিক্ষা কি? শিক্ষা কেন? শিক্ষা কাদের জন্য? কোন্ ধরনের শিক্ষা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? শিক্ষাখাতে কতটা বিনিয়োগ আমরা করব? শিক্ষা বিষয়-কেন্দ্রিক হবে? শিক্ষক-কেন্দ্রিক হবে? অথবা শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক? আমাদের শিক্ষার আয়োজনে সকল মানুষের ব্যক্তিগত প্রতিভা, কর্মদক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ বেশি গুরুত্বলাভ করবে? অথবা জাতি হিসেবে আমাদের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও উপলব্ধিগত সুচরম (Maxomum) সাফল্য বেশি আকাঙ্খিত? শিক্ষা কি আমাদের নৈতিক উন্নয়নের জন্য? অথবা বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি এবং কৃৎকৌশলগত দক্ষতা বাড়াবার লক্ষ্যে নিয়োজিত হওয়া উচিত? এ ধরনের অসংখ্য প্রশ্ন আছে যা নিয়ে প্রায় সবাই আমরা আলোচনায় অংশ নেই। এজন্য কাউকে দার্শনিক হতে হয় না — এমন কি শিক্ষক, শিক্ষাবিদ অথবা শিক্ষিত।

শিক্ষা সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহ হয়ত এতে ধরা পড়ে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি গভীরভাবে যা ধরা পড়ে তা হল, শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে এবং শিক্ষাদর্শনকে বিশেষজ্ঞের নির্বাচিত বিষয় হিসেবে অনেকেই গণ্য করেন না। বিভিন্ন মানুষের বিচিত্র সব অভিমতের পটভূমিতে কাজ করে বলেই আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনা ও শিক্ষা কাঠামো কোনো সামঞ্জস্য ও ধারাবাহিকতা বজায় না রেখে বারবার পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তা এমন সব রাষ্ট্র প্রধানদের নির্দেশে, যাঁরা বন্দুক চালনা, রাজনৈতিক

www.pathagar.com

ক্ষমতা দখল এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক কাজে দক্ষ হলেও, শিক্ষার সঙ্গে যাদের সম্পর্ক সবচেয়ে দূরের।

শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে আলোচনা আমাদের শিক্ষানীতি নির্ধারণের কাজে যেমন সহায়ক হতে পারে, তেমনি একটি জাতীয় ঐক্যমত্য—শিক্ষা সম্পর্কে গড়ে উঠতে পারে। অবশ্য একথা ঠিক যে, শিক্ষা একটি বিকাশমান ও গতিশীল কর্মধারা, সেই সঙ্গে অসংখ্য জ্ঞানী মানুষের নানা উদ্ভাবন ও বিচিত্র সব মৌলিক ভাবনা, এবং অসংখ্য স্রোতধারা— শিক্ষার বিস্তৃত প্রবাহের মধ্যে ধারণ করা আছে। পূর্ব নির্ধারিত নির্দিষ্ট পথে শিক্ষা পরিচালিত হবে এবং সবার জন্য অভিন্ন একটি শিক্ষাব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করতে হবে, এমনটিও বাঞ্ছিত নয়। এর কারণ, নির্ভুল আদর্শ শিক্ষাব্যবস্থা কি? তা বলে দিতে পারেন এমন কোনো মহাজ্ঞানী বা সর্বজ্ঞ ব্যক্তি নেই। নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা ক্রমাগত একটি শুদ্ধতর ও যথাযোগ্য শিক্ষাকাঠামো গড়ে তোলার পথেই একমাত্র এগুতে পারি।

শিক্ষাব্যবস্থা একটি মুক্ত ও অন্তহীন প্রবাহ। নদীর স্রোতের মত এর একটি উৎস আছে, একটি লক্ষ্য আছে এবং প্রবাহের দিক। কিন্তু এর উৎস, লক্ষ্য ও পথ সবই পরিবর্তনশীল, নানা ঘটনার প্রভাবে যা নিয়ন্ত্রিত। এই পরিবর্তনশীলতাকে মেনে নিয়েই আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করতে হয়। শিক্ষার্থীর জন্য একটি পাঠ্যসূচি ও একটি শিক্ষাক্রম নির্বাচনের কাজ অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। কারণ, শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের বয়স থেমে থাকছেনা, শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অভিমতে আমাদের না পৌঁছা পর্যন্ত।

শিক্ষাদর্শনের আলোচনা দ্বিতীয় যে কারণে গুরুত্বপূর্ণ তা হল, শিক্ষা সম্পর্কিত আমাদের নানা প্রশ্ন ও নানা অভিমতকে যাচাই করা ও সমন্বিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিক্ষাদর্শন গভীরভাবে সাহায্য করতে পারা। বস্তুত স্পষ্টভাবে কোনো শিক্ষাদর্শন উচ্চারিত হোক বা না হোক, বাস্তবে শিক্ষার পরিকল্পনায় ও শিক্ষা কাঠামোর নির্মাণে নিয়োজিত ব্যক্তিরা কতকগুলো মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে অগ্রসর হন, যা মূলত শিক্ষা দর্শনের ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা একটি ঐতিহ্যবাহী কর্মকাণ্ড। ফলে, একটি রক্ষণশীলতা এখানে কাজ করবেই। শিক্ষা দানের যে পদ্ধতি, সেখানে শিক্ষক, পাঠ্যবই, শিক্ষণীয় তথ্য ও তত্ত্ব, পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও একটি স্থিতি বজায় রাখে। কারণ, শিক্ষার উপকরণগুলো রাতারাতি বদলে দেয়া সম্ভব নয়। যে শিক্ষক কয়েক যুগ ধরে শিক্ষাদানে নিয়োজিত এবং যে পাঠাগার দীর্ঘদিন ধরে গড়ে উঠেছে, তা স্বভাবতই জ্ঞানের ঐতিহ্যকে ধারণ করে রাখবে। শিক্ষাব্যবস্থার এই ঐতিহ্য এক ধরনের জড়তা যা আবার সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে। যেমন, সভ্যতার প্রথম দিকে মানুষের জ্ঞান দ্বিগুণ হতে হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হতো, এখন সে সময় নেমে এসেছে এক দশকেরও নিচে। শিক্ষাদর্শনের প্রভাব ও শিক্ষাপদ্ধতি তেমনি রূপান্তরিত হয়েছে, সংগৃহীত ও উদ্ভাবিত নতুন জ্ঞানের আলোকে।

বাংলাদেশে শিক্ষা কাঠামো বেশ কয়েকবার বদলানো হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়েছে। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হল, শিক্ষাকাঠামোর

www.pathagar.com

পরিবর্তন শিক্ষাকমিশনের আলোকে ঘটেনি। ঘটেছে পেশীবলের আধিপত্যে, রাজনৈতিক ডিগবাজির কারণে, অথবা অজ্ঞতা, কুসংস্কার বা বিশেষ মতলবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে। অন্যদিকে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালা শিক্ষাদর্শন ও জ্ঞানের জগতের রূপান্তর দ্বারা নির্ধারিত অতটা হয়নি, যতটা হয়েছে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে।

শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে কোনো গূঢ় আলোচনা ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এ প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। কিন্তু দর্শন যে অর্থে কোনো বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছতর ধারণা ও উপলব্ধি দিতে সহায়তা করে এবং যে অর্থে বিশ্লেষণ ও যুক্তির অবতারণা করে কোনো বিষয় সম্পর্কে, আমাদের ধারণা ও যোগাযোগ সাধ্যতা স্পষ্টতর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সাহায্য করে — সেই অর্থেই শুধু শিক্ষাদর্শনের অবতারণা করব আমরা।

শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে আলোচনার একটি বড় সমস্যা হল, খ্রিস্টপূর্ব প্লেটো, অ্যারিস্টোটল ও সক্রেটিসের যুগ থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত অসংখ্য দার্শনিক নানামত প্রকাশ করেছেন - শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ এবং শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে। এঁদের দর্শনে যে পার্থক্য তা যেমন প্রভাবিত হয়েছে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণার দ্বারা, তেমনি নানা সমাজ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক ও ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধারণার দ্বারাও। ধর্ম, মানুষ সম্পর্কে যে ধারণা প্রদান করেছে, সেটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও শিক্ষার কাঠামো নির্ধারণে। যেমন, প্লেটো বিশ্বাস করতেন জন্মগতভাবেই মানুষ উচ্চ এবং নিম্নমানের বুদ্ধি ও মেধার অধিকারী। তিনি উন্নত মানুষগুলোকে তুলনা করেছিলেন মূল্যবান সব ধাতুর সঙ্গে, যেমন সোনা, রূপা ইত্যাদি, এবং নিম্ন শ্রেণীর মানুষগুলোকে তুলনা করেছিলেন সস্তা ধাতু লোহার সঙ্গে। অন্যদিকে খ্রিস্ট ধর্মে এই বিশ্বাস বদ্ধপরিকর যে, মানুষের জন্মই আজন্ম পাপ। শিক্ষা সম্পর্কে ও জ্ঞানচর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে বিপুল আগ্রহ এবং মানুষের প্রতি গভীর অনুকম্পা এবং সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও মানব সন্তান সম্পর্কে এই হীনমন্যতার মনোভাব রানসাঁস এর পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে রেখেছে।

প্রথম এবং প্রধান যে দার্শনিক —পাশ্চাত্যের শিক্ষা এ প্রাচীন ধারাকে, এবং সেই কারণেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে, গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলেন — তিনি হলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর জিনজ্যাকুয়েস রুশো। তিনি সম্পূর্ন বিপ্লবাত্মক ধারণা নিয়ে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মূল ধারণা হল নিয়মতান্ত্রিকতা, বিধি নিষেধ ও শাসনের সমস্ত আয়োজনকে বিসর্জন দিয়ে মানব শিশুকে সম্পূর্ণ মুক্ত পরিবেশে বিকশিত করতে হবে। তিনি অবশ্য প্লেটো, জন লক প্রমুখ দার্শনিকের শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিল—সম্পূর্ণ নতুনভাবে আমাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে সাজাতে হবে।

শিশুকে তিনি প্রথমবারের মত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে শিশুকে একজন মহৎ মানুষরূপে গড়ে তুলতে হলে তাকে একটি সুন্দর স্বাধীন শৈশব দিতে হবে। রুশো ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক এবং তাঁর আঁকা চরিত্র এ্যামিলি হচ্ছে আদর্শ পরিবেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশু—যে স্বাধীনভাবে এই পৃথিবীর পথে হেঁটে চলে এবং

www.pathagar.com

অভিজ্ঞতার অবগাহনে তার বুদ্ধির সহজাত বিকাশ ঘটায়। রুশোর শিক্ষাদর্শন পরবর্তীতে প্রোস্তালৎসি, হাবার্ড, ফ্রোএবেল, মেকমিলানস, মনটেসরি এমনকি হোয়াইটহেড এবং ডিউইকে প্রভাবিত করে। আর একজন দার্শনিক যিনি বৃটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা, যেখান থেকে আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ধার করেছি, সম্পর্কে অত্যন্ত সমালোচনামুখর ছিলেন—তিনি হলেন ব্রিটিশ গণিতবেত্তা আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড। হোয়াইটহেডের ধারণা হলো প্রকৃতিতে একটি শৃঙ্খলা আছে, মানুষ এই সুশৃঙ্খল বিশ্বের অংশ হিসেবে তার বিকাশকেও সহজাতভাবে পরিচালিত করতে পারে। স্বভাবতঃই তিনি ডারউইনের বিবর্তনতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। ফলে, বিকাশ ও প্রগতির ভিতর দিয়ে মানবজাতি ক্রমাগত শুদ্ধতর ও উচ্চতর স্তরে বিকশিত হবে—এটাই স্বাভাবিক বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য এই বিকাশের ধারাকে সহায়তা দেয়া। শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের ধারাকে নানা অনুশাসন দিয়ে বদলে দেয়া শিক্ষকের উচিত নয়। বিংশ শতাব্দীর এই শিক্ষাদার্শনিকের মতে শিক্ষার্থীর মন কোনো যন্ত্র নয়-একটি সজীব বিকাশমান অস্তিত্ব। খ্রিষ্টিয় বিশ্বাসের বিপরীতে তার প্রস্তাবিত মত হল শিশুর বিকাশের ছন্দিত, অন্তর্নিহিত রূপ আছে, আছে একটি প্রেরণা এবং একটি উন্নততর স্তরে পৌঁছাবার প্রবণতা, শিশুকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যই হল তার মনকে নাড়া দেয়া, তার বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর করা। শিক্ষা দান কোনো যান্ত্রিক ব্যাপার নয়। একটি জৈব অভিব্যক্তির মতন।

হোয়াইটহেড বলেছেন শিক্ষা অবশ্যই জীবনের জন্য সহায়ক হতে হবে। শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হল জীবনকে নানাভাবে বিকশিত ও সার্থক করে তোলা। শিক্ষা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। তৎকালীন ব্রিটিশ শিক্ষার ত্রুটি হিসেবে এর নিষ্ক্রিয়তাকে তিনি তুলে ধরেন। যে শিক্ষা শুধু তথ্যকে জমা করে স্মৃতিতে—একে ব্যবহার করে না, পরীক্ষা করে না, রূপান্তরিত করে না নতুন সম্পর্কে—তা শিক্ষা নয়। পাঠ্যসূচির নানা বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে জানা কোনো কাজে আসে না, যতক্ষণ না এগুলো পারস্পরিক সম্পর্কে সমন্বিত হয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ জীবন্ত, সজীব ও সামগ্রিক রূপ নেয়। শিক্ষাক্রম তাই হতে হবে সমন্বিত ও পূর্ণাঙ্গ।

শিক্ষার্থীর একটি ভৌত ও একটি মানসিক উপাদান আছে। একটি স্থিতিশীল ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করতে হবে। সংক্ষেপে, হাত ও মস্তিস্ক ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে। প্রযুক্তিগত ও প্রায়োগিক শিক্ষার সঙ্গে মানবিক শিক্ষাকে সংযুক্ত করা তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্লেটোর মতে, হাতের কাজ ও মানসিক কাজকে পৃথক ভাবা হতো। হোয়াইটহেড একে ভুল ধারণা বলে মনে করেন। মানুষের মনের একমাত্র নৈতিকতা হল সৌন্দর্য-বুদ্ধি। অপচয় বন্ধ ও সাজুয্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই এই নৈতিকতা সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পর্কে হোয়াইটহেড সবচেয়ে সমালোচনা মুখর ছিলেন। কারণ, প্রচলিত শিক্ষাদান শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের সহজাত প্রবণতাকে ধ্বংস করে দেয়।

শিক্ষার বিষয়, শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীর মানসিক স্তর শিক্ষা গ্রহণের একটি ছন্দে সমন্বিত করাই হল শিক্ষকের কাজ। শিক্ষা প্রদানের সবচেয়ে ত্রুটি হল —শিশুর মানসিক বিকাশের যে ছন্দ তার সঙ্গে তাল রাখতে ব্যর্থ হওয়া।

www.pathagar.com

শিক্ষাকে তিনি ৩টি স্তরে ভাগ করেছিলেন। একটি হল রোমান্সের স্তর, একটি হল শুদ্ধতর রূপে বিষয়গুলো জানা এবং তৃতীয় স্তরটি হল অভিজ্ঞতার আলোকে একটি সাধারণীকৃত (generalized) উপলব্ধিতে পৌঁছা। রোমান্স এর স্তরে যা কাজ করে তা হল উদ্দীপনা—অনুসন্ধিৎসা এবং জানার উত্তেজনা। বিষয়ের সঙ্গে অনুপ্রাণিত মিথোস্ক্রিয়ার সময় এটি। সামগ্রিক চিত্র, গল্প ও ইতিহাস আনন্দের সঙ্গে উপস্থাপিত হতে হবে এই স্তরে। শুদ্ধতররূপে জানার যে দ্বিতীয় স্তর তা হল তথ্যের বিন্যাস, বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য উদঘাটন, ব্যাকরণ, বাক্য বিন্যাস ও শুদ্ধরূপে ভাষার ব্যবহার শেখার। বিশ্লেষণ, যুক্তি প্রয়োগ, বিষয়ের সঙ্গে পরিচয়হীনতা, বিমূর্তভাবে শুধু কতগুলো নিয়ম শেখানো, শিক্ষালাভের স্বাভাবিক ইচ্ছাকে ব্যাহত করে।

সাধারণীকৃত ধারণা লাভের স্তরে পৌঁছাতে হলে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিচ্ছিন্ন নীতিগুলো নতুন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার শক্তি শিক্ষার্থীকে অর্জন করতে হবে। বিষয়টি সম্পর্কে সাধারণীকৃত উপলব্ধি অর্জিত হবার পরেই মাত্র শিক্ষার্থী তার অবচেতনতার এই স্তরে পৌঁছে যায়। শিক্ষা লাভের এই বিভিন্ন স্তরগুলো অবশ্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয় পরস্পর থেকে। প্রতিটি স্তরের মধ্যেই অন্য স্তরের উপাদান কিছুটা মিশে থাকে।

শিশুর বিকাশের ধাপগুলো বুঝে নেয়া শিক্ষকের প্রধান দায়িত্ব। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে এই প্রত্যয় অবশ্যই সৃষ্টি করবে যে, সে শুধু সাহায্যকারী, যদিও এই সাহায্য অপরিহার্য। তার কাজ শিশুর মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগিয়ে দেয়া,তাকে নতুন দিগন্তে নিয়ে যাওয়া। শিক্ষক শুধু বাগানের মালির মতন জল সেচ করবেন না—তিনি প্রতিনিধি সভ্যতার, ঐতিহ্যের, মূল্যবোধের।

হোয়াইটহেডের শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে এত কথার অবতারণা এই জন্য যে, আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার যে ত্রুটিগুলো প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে তার অনেকগুলোর সমাধানই এখানে রয়েছে। কোনো তত্ত্ব বা দর্শন যখন স্থান ও কালের ব্যবধান নিয়েও অত্যন্ত বাস্তব ও প্রাসঙ্গিক বলে প্রতিভাত হয়, তখন এই প্রতীতি জাগা স্বাভাবিক যে, সেই তত্ত্ব বা দর্শন নিছক সাময়িক ও স্থানিক নয়। যেমন, কোনো সুদূরে অবস্থিত আলোর উৎস যদি আমার নিকটের বস্তুমালাকে দৃশ্যমান করে তোলে, তাহলে সেই প্রদীপ যথার্থই উজ্জ্বল। অবশ্য রুশো বা হোয়াইটহেড এর দর্শন বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে এসে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুত কোনো শিক্ষাদর্শনকেই এককভাবে আমরা গ্রহণ করতে রাজী নই।

বিভিন্ন দার্শনিকদের বক্তব্যকে পৃথক পৃথকভাবে বিবেচনা না করে, বিচিত্রসব শিক্ষাভাবনাকে মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যেমন, ভাববাদ (Idealism), বাস্তববাদ (Realism), অভিজ্ঞতাবাদ (Pragmatism), অস্তিত্ববাদ (Existentialism) ইত্যাদি। আমাদের শিক্ষাদর্শনকেই যে এই শ্রেণী বিভাগের আলোকে পর্যালোচনা করতে হবে এমন কথা নেই। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করব যে, এই শিক্ষাদর্শনগুলো প্রত্যেকটিই পরমভাবে সঠিক বা যথার্থ না হোক, অন্তর্গতভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও স্বচ্ছ। ফলে, যেখানে এই তত্ত্ব সঠিক নয়। সেখানে অন্তত এর ত্রুটি প্রমাণযোগ্য। অর্থাৎ শিক্ষাদর্শনের বৈশিষ্ট্য হল যে, তা পরীক্ষা উত্তীর্ণ না হোক অন্তত

www.pathagar.com

পরীক্ষিত হবার জন্য তা উপস্থিত হয়। আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ধারণায় যেসব উপাদান আমরা নানা জায়গা থেকে ধার করে সংযোজন করেছি, সেখানে কোনো যৌক্তিক কাঠামো নেই। যৌক্তিক বিশ্লেষণে উত্তীর্ণ হওয়াতো দূরের কথা, কোন কষ্টিপাথরেই এই শিক্ষা কাঠামো যাচাইযোগ্য নয়।

শিক্ষাদর্শনে ভাববাদ প্লেটোর সময় থেকে চলে আসছে। এই দর্শনের মূল কথা: মানুষের আসল পরিচয় হল তার আত্মার পরিচয়—মনটাই আসল। এই তত্ত্ব অনুসারে মানুষের মন দেহের বা বস্তুর উর্ধ্বে বিশ্বজনীন এক মন আছে, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অন্য মনের সঙ্গে তা যদি মিলতে না পারে, বুঝতে হবে কোথায়ও ত্রুটি ঘটেছে। বিশ্বস্রষ্টা যেহেতু এই বিশ্বজনীন মনের অধিকারী, আমাদের মন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েই মাত্র মূল্যপ্রাপ্ত। শিক্ষার ভেতর দিয়ে মনের ক্রমোচ্চ অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া আছে। মানুষের নিজস্ব একটি স্বত্ত্বা আছে—পরিবেশ ও বস্তুজগৎ নিরপেক্ষ। সেটা তার ব্যক্তিত্ব, তার অন্তর্নির্হিত মূল্য, তার স্বাধীনতা। শিক্ষার বড় উদ্দেশ্য হল এই ব্যক্তিত্ব, এই স্বাধীনতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

শিক্ষা চারটি দক্ষতা দেবে শিক্ষার্থীদের—ভাষা শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, মান নির্ধারণ বা সামাজিক শিক্ষা এবং সবশেষে রুচি বা সৌন্দর্য-বুদ্ধির শিক্ষা। ভাববাদ দর্শনে বিজ্ঞান শিক্ষা গৌণ ব্যাপার। এই শিক্ষার প্রয়োজন শুধু দৈহিকভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা। সামাজিক শিক্ষার লক্ষ্য সবার সঙ্গে যোগাযোগ ও সব কিছুর মান বিচারের ক্ষমতা অর্জন। কিন্তু সব শিক্ষার্থীরই মূল উদ্দেশ্য হল—ভাববাদ দর্শন অনুসারে বিশ্বের সব বস্তু ও ঘটনার স্বর্গীয় উৎস জানা। ভাববাদী শিক্ষায় শিক্ষার কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে ছাত্র, শিক্ষণীয় বিষয় নয়। শিক্ষার একটি পথ হলো অনুকরণ। যেমন, আদর্শ শিক্ষককে অনুকরণ করে শিক্ষালাভ। অন্য একটি পদ্ধতি হল, বিশুদ্ধ ও সুন্দরের দৃষ্টান্ত সামনে রেখে চলা। যেমন, কোন শিল্প কর্ম। এই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত আরেকটি পথ হল সংলাপ অর্থাত ডায়ালেকিক্টক্যাল বা দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি—যা সক্রেটিস প্রবর্তন করেছিলেন। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিচার করার শক্তি অর্জন করে, ভালমন্দ যাচাই করে নির্ভুল পথকে নির্বাচন করতে পারে।

আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে বক্তৃতার ভেতর দিয়ে একটি বিষয় স্পষ্টভাবে, যৌক্তিকভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থিত করা। ভাববাদ দর্শনে বস্তু জগতের বাইরে আত্মার অস্তিত্বকে শুধু বিশ্বাস করা হয় না, তাকে মুখ্য বলে বিবেচনা করা হয়। মোট কথা ভাববাদী দর্শনের সারসংক্ষেপ রয়েছে বাইবেলের উক্তিতে "For what does it profit a man if he shall gian the whole world and loose his soul?"

শিক্ষাক্ষেত্রে ভাববাদের এই আদর্শ শেষ পর্যন্ত সমর্থিত হয়নি বিশ্বজগৎ সম্পর্কে নতুন ধারণা লাভ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উদ্ভবের কারণেই। যেমন, ভাববাদের বিপরীতে আবির্ভাব ঘটেছে বাস্তববাদের। বাস্তববাদ দর্শন অনুসারে বস্তু ও দৃশ্যমান জগৎ পরমভাবে অবস্থান করে এবং আমাদের দেখা বা ভাবের উপর তা নির্ভর করে না। এই বিশ্ব মানুষের ভাবনার দ্বারা সৃষ্ট নয়, যেমনটি ভাববাদীরা ভাবেন। বস্তুগত বিশ্বের একটি নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে, যদিও আমাদের দৃষ্টিতে চারপাশের ঘটনামালা বিশৃঙ্খল মনে হয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শুধু এর মূল কারণ বা চিরন্তন সত্যকে উদঘাটন করে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করেন বটে, কিন্তু তারা মরে গেলেও অর্থাৎ তাদের অনুপস্থিতিতেও নিয়মগুলো থেকে যায়। জ্ঞান তাই নৈর্ব্যক্তিক—অর্থাৎ আমাদের চেতনা ও অস্তিত্ব নিরপেক্ষ। শুধু আমরা তা আবিষ্কার করছি। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল প্রকৃতির নিয়মগুলো জানা এবং উদঘাটন করা, ক্রমসঞ্চিত সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে পৌঁছে দেয়া। এই শিক্ষা শিক্ষক- কেন্দ্রিক।

বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী শিক্ষাদর্শন হল অভিজ্ঞতাবাদ বা Pragmatism, যার উদ্ভব, বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভূতপূর্ব ফসলরূপে। মানুষের বস্তুগত প্রয়োজনবোধ উন্নয়নের প্রতি বর্ধিত আগ্রহ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার একটি প্রধান কারণ এই দর্শনের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির। সমকালীন মনোভঙ্গি জীবনদর্শন ও সাধারণ আকাঙ্খা এখানে সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত।

জন ডিউই এই দর্শনের একজন প্রধান ও সার্থক প্রবক্তা। তার অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে Educatiion & Democracy (1916) এবং Experience & Education (1938) গ্রন্থ দুটিতে তিনি বিশেষভাবে এই শিক্ষাদর্শনকে তুলে ধরেছেন। এই দর্শন কখনও যন্ত্রবাদ (Instrumentalistm) এবং কখনও পরীক্ষাবাদ (Experimentalism) নামে পরিচিত। হোয়াইটহেডের মত ডিউইও ডারউইনের বিবর্তনবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। জীববিজ্ঞানের এই বিবর্তনবাদে যেমন সরল জীব কোষ থেকে জটিল জীবনের অভিব্যক্তি ঘটে, অনেকটা তার অনুসরণে মানুষও তার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার বিকাশ ঘটিয়ে সীমাহীন অগ্রগতি নিশ্চিত করতে পারে। এখানে অবশ্য এই সাদৃশ্য টানার ক্ষেত্রে একটি সংশোধন আনতে চাই এবং তা হল— প্রাণিজগতে বিকাশ যেখানে অন্ধগলিতে আটকে যায়, এমনকি মানুষের দৈহিক বিকাশও, জীনের মধ্যে পূর্বাঙ্কিত নীলনক্সার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, সেখানে মানুষের বুদ্ধির বিকাশের ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সীমানা অনির্ধারিত ও প্রান্তহীন। রুশো, পোস্তালৎসি ও ফ্রোয়েবেল যে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষার কথা বলেছেন সেই দর্শনের অগ্রগতি ঘটান ডিউই। শিক্ষার বিষয় গুরুত্বপূর্ণ—এই পুরানো দর্শনের বিপরীতে অভিজ্ঞতাবাদের এই দর্শন উপস্থাপিত।

আমেরিকার সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, অভিজ্ঞতাবাদের এই শিক্ষাদর্শনের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল ডিউইর সময়ে। নতুন সব উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের দ্রুত বিকাশ ব্যক্তি মানুষের প্রতিভা ও সাফল্যকে যেমন গুরুত্ব দিচ্ছিল এই যুগ, তেমনি অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছিল মানুষ, শিল্পায়নের ভিতর দিয়ে। ডিউইর দর্শন তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে সামাজিক বন্ধন ও সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে। ডিউইর মতে গণতন্ত্র শুধু রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়, গণতন্ত্র হল পারস্পরিক মতামত বিনিময় ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের মাধ্যমে একত্রে বাস করার সবচাইতে বাস্তব ব্যবস্থা। রাজনৈতিক অর্থে গণতন্ত্র হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একটি প্রক্রিয়া, যেখানে সবাই সমঅধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে, দেশ পরিচালনার কাজে। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হচ্ছে বুদ্ধির বিকাশ ও উন্নয়ন। কারণ, অংশগ্রহণের সাফল্য ও মান নির্ভর করে, অংশগ্রহণকারী সদস্যদের শিক্ষা ও বুদ্ধির স্তর কতটা তুলনীয় ও সমতার উপর প্রতিষ্ঠিত তার উপরে।

www.pathagar.com

ভাববাদ ও বস্তুবাদে অধিবিদ্যা (Metaphysics) যেমন গুরুত্বপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞতা-বাদের দর্শনে একে তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না। আমরা যা দেখি বা প্রত্যক্ষ করি তার বাইরে এবং তাকে ছাড়িয়ে গভীরতর কোনো সত্য সন্ধানের ধারণা সমর্থন করে না এই দর্শন। মানুষ আসলে অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ ও অভিজ্ঞতা নির্ভর প্রাণী। সে পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া না ঘটিয়ে বাঁচতে পারে না। অবশ্য একেও আমরা অধিবিদ্যা বলতে পারি, যদিও পুরোনো অর্থে নয়।

অভিজ্ঞতাবাদীরা মানুষকে কল্পনা করেন একটি সজীব অস্তিত্বরূপে, যার ইচ্ছা আছে, আগ্রহ আছে, প্রয়োজনবোধ আছে, এবং যে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্বাচন করে এবং তা অর্জনের জন্য তার বুদ্ধি প্রয়োগ করে। মানুষ সামাজিক প্রাণীও। সবার সাথে সম্প্রীতি ও ভাল সম্পর্ক রেখে সে চলতে চায়। জ্ঞান হচ্ছে মূলত অভিজ্ঞতা - যা প্রক্রিয়াকৃত এবং পরিশোধিত শিক্ষার ভিতর দিয়ে। মানুষ যেহেতু জৈব ও অজৈব বস্তু ও নানান ঘটনার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটাচ্ছে, সে অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হচ্ছে।

পরিবেশ মানুষের জন্য কিছু সমস্যা তৈরি করে। এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়েই সে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে একটি নিষ্ক্রিয় ও একটি সক্রিয় উপাদান আছে। ভৌত পরিবেশ মানুষের উপর যে প্রভাব রাখে তা নিষ্ক্রিয়। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ারূপে মানুষ যখন সেই পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সচেষ্ট হয়ে অবস্থা বদলে ফেলে, সেটা হয় সক্রিয় অভিজ্ঞতা। পরিবেশ থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা বুদ্ধির দ্বারা পরিমার্জিত হয়ে সৃষ্টি করে জ্ঞানের। বুদ্ধি এমন কিছু মূর্ত জিনিষ নয়, যা মাথার মধ্যে এমনি অবস্থান করে। বুদ্ধি আমাদের চিন্তার গুণগতমানকে বুঝায়, যা আমাদের বেঁচে থাকার সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে সমাধানে নিয়োজিত। আমরা যে পরিমাণে সমস্যা সমাধানে সফল, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে — আমরা ততটাই বুদ্ধিমান।

সৃজনশীল ভাবনা বলতে বুঝায় সমস্যা সমাধানের পদ্ধতিতে পথ চলা। এর প্রথম ধাপ হচ্ছে সমস্যাকে চিহ্নিত করা। দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে হাইপথেসিস বা অনুকল্প দাঁড় করানো। পরবর্তী ধাপ হচ্ছে সম্ভাব্য সমাধানগুলোর ভিতর থেকে সবচাইতে গ্রহণযোগ্য সমাধানের পথ বাছাই করতে তথ্য সংগ্রহ করা। শেষ ধাপ হচ্ছে পরীক্ষা নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে সমস্যার সমাধান ঘটানো। সমস্যার সমাধান হলে আমাদের চিন্তাও থেমে যায়। সব মিলিয়ে জ্ঞানের একটি একক সৃষ্টি হয়। আনকের অভিজ্ঞতা এইভাবে পরিশুদ্ধ হয়ে অবচেতনভাবে আমাদের মস্তিষ্কে জমা হয় জ্ঞানের এককরূপে। এই জ্ঞান একই ধরনের অন্য সমস্যার সমাধানে আমরা পরবর্তীতে ব্যবহার করতে পারি। অভিজ্ঞতাবাদ দর্শনে এটাই হল সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি।

অভিজ্ঞতাবাদের দর্শনে সত্য কোন পরীক্ষালব্ধ গুণ নয়, যা বস্তুর মধ্যে পূর্ব থেকেই অবস্থান করে। বস্তুত কোন ধারণা যদি কাজ করে তাহলে তা সত্য বলে বিবেচিত। সত্য একটি সামাজিক ধারণাও বটে। চার্লস পিয়ার্স তার প্রায়োগিক দর্শনে একই ধরনের মত পোষণ করেন। সত্য চিরস্থায়ী বা পরম নয়, তা সাময়িক ও রূপান্তরসাধ্য। যেমনটি আমরা দেখতে পাই বিজ্ঞানের তত্ত্বের ক্ষেত্রে। মূল্যবোধও অপরিবর্তিত ও পরম নয়। আমাদের ইচ্ছা, পছন্দ, আকাঙ্ক্ষা, অন্য সবার ইচ্ছা পছন্দ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমন্বিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে গিয়েই সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞতাবাদের বক্তব্য হচ্ছে, শিশুকে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি করা হয় বটে, অন্তত সেই প্রচেষ্টা চলে, কিন্তু শিশুর শিক্ষা আনন্দ ও সমকালীন সমস্যা সমাধানের পথ প্রদর্শনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি থাকে না — যা সঠিক নয়। পাঠ্যসূচি সম্পর্কে ডিউইর সমালোচনা হল — শিশুকে মৃত তত্ত্ব শেখানো হয়, যা অনেক ক্ষেত্রেই তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন। সে এগুলো শুধু মুখস্থ করে, কিন্তু উপলব্ধি করে না আনন্দের আবহে।

ডিউইর সমালোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি, শিক্ষার্থীর রুচি, পছন্দপ্রবণতা নিরপেক্ষ অভিন্ন এক শিক্ষা সবার উপরে চাপিয়ে দেয়া আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার এক বড় ত্রুটি। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের উপর বাণী বর্ষণ করেন, এমন ব্যবস্থা না রেখে, সংলাপের মত পারস্পরিক যোগাযোগের ভেতর দিয়ে অভিজ্ঞতার সঞ্চারণ ঘটাই আকাঙ্ক্ষিত। শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভের মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে নিয়ে তার দক্ষতা, পছন্দ ও জ্ঞানের স্তরকে বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষাদানের কাজ পরিচালিত হওয়া উচিত।

শুধু তথ্য ও সত্য শোষণ করে নেয়ার কাজ এত ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাপার যে, তা মানুষকে দক্ষ করলেও স্বার্থপর করে গড়ে তোলে। সামাজিকভাবে শিক্ষা লাভ তাই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজেরই একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। কিন্তু তা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে এমন বলা যাবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামাজিক মূল্যবোধ ও চিন্তাকে শুধু সঞ্চারিত করে না, তাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শিক্ষাদানের সামাজিক যে দায়িত্ব সমাজ বিবর্তনের, সেখানে তিনটি শর্ত পূরণ হবার— মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক ও যৌক্তিক। প্রজেক্ট পদ্ধতি দলগতভাবে সমস্যা সমাধানের যে অভিজ্ঞতা দেয়, তা সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক। শিক্ষক আধিপত্য নিয়ে জ্ঞানের আধার রূপে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থিত হবে না, শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক — এটি ছিল রুশোর কথা। অন্যদিকে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হতো। অভিজ্ঞতাবাদ শিক্ষাদর্শনে মাঝামাঝি পথকেই গুরুত্ব দেয়া হয়।

শিক্ষাদর্শনের সমস্ত মতবাদ এখানে আমরা উপস্থাপন করতে চাই না, এবং তার অবকাশও নেই। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় যে শিক্ষাদর্শনগুলো বিচ্ছিন্ন ও অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে যুক্ত হয়েছে— কখনও প্রত্যক্ষ অনুকরণে এবং কখনো পরোক্ষ প্রভাবে, তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এতক্ষণ আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি। আমাদের শিক্ষা কাঠামোর সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা ও এর ত্রুটি বিশ্লেষণ সংক্ষেপে সম্ভব নয়। এর একটি কারণ, আমাদের শিক্ষা কাঠামো অসংলগ্নভাবে বারবার পরিবর্তিত হয়েছে, যা আগে উল্লেখ করেছি। পরিবর্তন অনাকাঙ্ক্ষিত নয়। কিন্তু ভারসাম্য অত্যাবশ্যক — স্থিতিশীলতার নয়, গতিশীলতার ভারসাম্য।

আমাদের শিক্ষাকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্ধঅনুকরণ, অপরিকল্পিত সংযোজন এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব ও স্বাধীনতার প্রতি অবজ্ঞা, সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে নিরানন্দময় এক শাস্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি সমস্ত শিক্ষা দর্শনেই একটি গভীর উপলব্ধি ও সত্যানুসন্ধানের সৎ প্রচেষ্টা ছিল। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন,

www.pathagar.com

শিক্ষাদর্শনকে যেমন বদলে দিয়েছে, শিক্ষাদর্শনও তেমনি, জ্ঞানের মহৎ এবং অর্থনৈতিক সামাজিক অগ্রগতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষা কাঠামোকে এই জটিল সম্পর্কের ভেতর দিয়ে পার হতে হয় বলেই একমাত্র যথার্থ শিক্ষাদর্শন শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে শিক্ষার অন্তর্নিহিত স্বাধীনতাকে খর্ব না করে। শিক্ষা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনের স্বাধীনতা এবং শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে তার শিক্ষার সম্পর্ক উপলব্ধি করা এবং দ্রুত বিকাশমান জ্ঞানের বিচিত্র জগৎকে অনুধাবন করা, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ — শিক্ষাপরিকল্পনার কাজে।

শিক্ষা কাঠামো সম্পর্কে কয়েকটি বড় প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। শিক্ষা কি শিক্ষার্থীর জীবনের জন্য? তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ, প্রতিভার বিকাশ ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়োজিত? যদি তাই হয়, তাহলে অভিজ্ঞতাবাদ সবচেয়ে কাছাকাছি একটি গ্রহণযোগ্য শিক্ষাদর্শন আমাদের জন্য। তবে আমাদের নিজস্ব ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ছাপ অবশ্যই এতে পড়বে। এবং এটা অভিজ্ঞতাবাদের আরোপিত শর্তও বটে।

শিক্ষালাভের মূল ভিত্তি অভিজ্ঞতা, এবং শিক্ষার মূল লক্ষ্য বুদ্ধির আলোকে সেই অভিজ্ঞতাকে পরিশুদ্ধ করা এবং এর ফলে সৃষ্ট যে জ্ঞান, তা জীবনের সমস্যা সমাধানে কাজে লাগানো। অবশ্য জীবন বলতে শুধু ব্যক্তি জীবন বুঝায় না—সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয়জীবন ও আন্তর্জাতিক যে জীবন সমগ্র মানবজাতির, তা এর অন্তর্গত। একথা আরো গভীরতার অর্থে সত্য হয়ে উঠেছে তথ্যবিপ্লব ও যোগাযোগ বিপ্লবের ফলে।

শিক্ষা সম্পর্কে চমৎকার বাণী ও উপদেশ আমরা সংগ্রহ করতে পারি। নানা সময়ের ও নানা দেশের শিক্ষাদর্শন থেকে বিভিন্ন ধারণার সংযোজন ঘটাতে পারি আমাদের শিক্ষাক্রমে, যেমনটি ঘটে আসছে এতদিন। কিন্তু তা হবে যান্ত্রিকতা। আমাদের যা প্রয়োজন তা হল, এমন একটি শিক্ষাদর্শন, যা সব শিক্ষাদর্শন থেকেই প্রয়োজনবোধে গ্রহণ করবে কিন্তু সংশ্লেষিত হবে সৃজনশীল অভিজ্ঞতা ও মুক্তবুদ্ধির আলোকে, যেমন গাছের শোষণ করে নেয়া সমস্ত পদার্থ সংশ্লেষিত হয় এর পাতায় — সূর্যের আলোকে। গাছ কোনো অপরিবর্তী চিরন্তন বস্তু নয়, কিন্তু পর মুহূর্তেই তা সুন্দর ও সজীব এর অংশগুলোর পারস্পরিকতায় ও সামঞ্জস্যে। আমাদের শিক্ষাকাঠামো হতে হবে সজীব, সামঞ্জস্যপূর্ণ, প্রাসঙ্গিক এবং সমকালীন এবং সেটা সম্ভব হতে পারে যথার্থ শিক্ষাদর্শনের সৃজনশীল বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের আলোকে।

একগাদা উপাত্ত ও তথ্যের সমাবেশ পাঠ্যসূচি নয়। ডাস্টবিনে পরিত্যক্ত মূল্যবান জিনিষও থাকে, তা সবই অপ্রয়োজনীয়, অপ্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যহীনভাবে স্তূপীকৃত। শিক্ষা কাঠামোর সজীবতা, প্রাসঙ্গিকতা ও সমকালীনতা নিশ্চিত করার শর্ত হল, শিক্ষাকে আনন্দের করা— সৃজনশীল, বুদ্ধিনির্ভর, জীবনমুখী ও আধুনিকভাবে সমৃদ্ধ করা। এক কথায়, শিক্ষা হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত।

বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষা বলতে শুধু বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার কথা বলছিনা, যোগাযোগসাধ্য জ্ঞানের কথা বলছি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জিত হয় পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে। এখানে শুধু সত্যকে জানা এবং জানানোই যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে সত্যে উপনীত হওয়ার পথটাও জানতে হবে। বিজ্ঞান তাই প্রকাশ সাধ্য জ্ঞান বা Public

www.pathagar.com

Knowledge। সত্য উদঘাটনের যে অনুসন্ধিৎসা ও আগ্রহ, সৃজনশীল বুদ্ধির প্রয়োগে যে সমস্যার সমাধান— সবটাই আমাদের উপাদান যোগায় শিক্ষালাভের কাজে। সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে যে সামঞ্জস্য, বিশ্বপ্রকৃতি ও সামাজিক ঘটনার মধ্যে যে সাযুজ্য এবং মিলের সন্ধান, সেটাই বিজ্ঞানের নান্দনিকতা।

বিজ্ঞানের একটি নৈতিকতা আছে। তা হল সত্যের প্রতি ভালবাসা, প্রশ্ন উত্থাপন ও বিশ্লেষণের স্বাধীনতা, ক্রমাগত সমস্যা সমাধানের ভিতর দিয়ে ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনের বিকাশ ঘটানো। প্রাণী জগতেরও একটি নৈতিকতা আছে এবং তা হল, প্রত্যেক প্রজাতির টিকে থাকা ও বিস্তারকে সুচরম করা। মানুষের জন্য এই টিকে থাকা অবশ্যই শারীরিক ও মানসিক, বস্তুগত ও উপলব্ধিগত। মানব সভ্যতার এই বিকাশমান ধারাকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনেই শিক্ষার আয়োজন। আমাদের শিক্ষা কাঠামো গড়ে উঠার আয়োজনে শিক্ষাদর্শনের অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় এর অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্য ও উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে। একটি জাতির টিকে থাকার ও বিকশিত হবার সমগ্র সচেষ্ট প্রয়াস প্রতিফলিত হবার কথা শিক্ষার সার্বিক আয়োজনে। আমাদের মূল্যবোধ, প্রত্যাশা, উন্নয়ন প্রচেষ্টা, জীবনদর্শন ও জাতীয় আদর্শ— শিক্ষাব্যবস্থার ভিতর দিয়েই নির্মিত হবার কথা সচেতন পরিকল্পনায়।

জাতীয় সংস্কৃতি, যা অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের ভেতর দিয়ে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করে একটি চেতনার প্রভাব বলয় সৃষ্টি করে, তার সার্থক প্রকাশ ঘটা উচিত আমাদের শিক্ষানীতিতে। শিক্ষার ভেতর দিয়েই আমরা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি সবচেয়ে স্বাধীন পরিবেশে এবং সৃজনশীলতায়, এবং ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সবচেয়ে কম বাধাগ্রস্ত করে। ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সব ব্যবস্থা, যেমন রাজনৈতিক দল গঠন, ধর্মীয় অনুশাসন, সামরিক ও প্রশাসনিক অনুশাসন, নীতিবাক্যের প্রভাবজাল সৃষ্টি—সবই যান্ত্রিক অথবা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সৃজনশীলতা গ্রাসী। আমরা শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর দিয়ে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির এই সুযোগটি যে হারিয়েছি, তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল, আমরা একটি অভিন্ন গতিশীল ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারিনি।

সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা রূপে প্রধান যে বিভাজন সৃষ্টি হয়েছিল বৃটিশ যুগে, তার অবসান ঘটেনি একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভিতর দিয়ে স্বাধীনতা লাভের পরও। আমাদের আত্মত্যাগের পরিমাণ যে আমাদের চেতনালাভের অগ্রগতির সঙ্গে আনুপাতিকভাবে ঘটেনি তারই অভিব্যক্তি এটি। বস্তুত একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি সৃষ্টি হয় একটি ঐক্যবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা ও অভিন্ন শিক্ষাধারার মধ্যে। শিক্ষা অন্তর্গতভাবে মানুষকে রূপান্তরিত করে তার চেতনায়, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসে। ছোট ছোট অন্যসব বিভাজনের কথা বাদ দিয়েও সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার এই দুই ধারা জাতিকে গভীরভাবে বিভক্ত করেছে ভেতর থেকে। আমরা একটি অভিন্ন সাংস্কৃতিক আবহ থেকে কোন আলোচনা ও মতামত প্রকাশ করতে পারছিনা। সৃজনশীল কাজে মত পার্থক্য ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা অবশ্যই থাকবে। কিন্তু একটি অভিন্ন প্রতিজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার জগৎ, বিশ্লেষণ ও যুক্তিপ্রয়োগের ভেতর দিয়ে সমন্বিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, এর গঠনকারী সমস্ত উপাদানের বৈচিত্র্য নিয়েও। যেমন, বাগানে ফুল ফোটে নানা বর্ণের ও নানা

www.pathagar.com

গন্ধের, বিভিন্ন সব বৃক্ষে। এখানে যা ঐক্যের ভিত্তি তা হল মাটি, পানি, বাতাস ও আলো ভরা আকাশ।

আমরা দেখেছি শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ধারায় মানুষের নানা বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা বিকশিত হতে পারে এবং এখানে সমস্ত জ্ঞানই প্রকাশযোগ্য। প্রকাশযোগ্যতার ও প্রমাণসাধ্যতার যে পূর্বশর্ত বিজ্ঞান চর্চার ধারার, তা কখনই আমাদের মধ্যকার বিরোধকে স্থায়ী ও হিংস্র করতে পারে না। একই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব প্রজাতির অন্তর্গত হবার কারণেই আমাদের অভিজ্ঞতাগুলো পরস্পরের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব — যতক্ষণ তা আমাদের ব্যক্তিগত সংস্কার ও অপ্রমাণসাধ্য বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত নয়।

অবশ্য কোনো জ্ঞান ও উপলব্ধি প্রকাশসাধ্য ও যোগাযোগ সাধ্য হওয়ার আগে, ব্যক্তিগত বিশ্বাস, অনুমান ও স্বজ্ঞা রূপে আমাদের মনস্তত্ত্বকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ব্যক্তিগত এই বিশ্বাস, আবেগ ও কল্পজগৎ মোটেই গুরুত্বহীন নয়। সেই কারণে অসীমের মুখোমুখি হয়ে বিস্ময় মিশ্রিত যে উপলব্ধি ব্যক্তি মানসের— তাকে যদি ধর্মীয় উপলব্ধি বলি বা ব্যক্তিমানুষের মনস্তত্ত্ব, তা সবার মধ্যেই উপস্থিত। ধর্মীয় বিশ্বাসের আবেগ ব্যক্তিগত প্রেমের মতই অযোগযোগসাধ্য এক অভিজ্ঞতা। এর মূল্যকে স্বীকার করে নিয়েও একে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তর্গত করা ঠিক নয়।

জ্ঞানের জগৎকে তাই প্রকাশসাধ্য ও অপ্রকাশসাধ্য দুই স্তরে যদি ভাগ করি, তাহলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় শুধু প্রকাশসাধ্য জ্ঞানই সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব। যা ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক অর্থাৎ বিশেষ সম্প্রদায়ের নিজস্ব ব্যাপার, তা সাধারণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা প্রদানের প্রচেষ্টা— অনিবার্যভাবে সংঘাত সৃষ্টি করবে ও জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করবে।

শিক্ষাকাঠামো একটি জটিল ব্যবস্থা। বাংলাদেশে যে শিক্ষাকাঠামো ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়ে গড়ে উঠেছে, এবং যা নির্মীয়মাণ অবস্থায় আছে, তার অনেকগুলো দুর্বলতার মধ্যে যা সবচেয়ে লক্ষণীয় তা হল, শিক্ষাদর্শনের অনুপস্থিতি। শিক্ষাদর্শনের আনুষ্ঠানিক বা কাঠামোগত উপস্থিতির অভাবের কথা বলছিনা। শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ নির্ধারণে, শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে, পাঠ্যসূচির বিন্যাসে, শিক্ষা পদ্ধতির নির্ধারণে, শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও সামগ্রিক একটি শিক্ষার আয়োজন সৃষ্টিতে যে পরিমাণ চিন্তা ভাবনা, প্রশ্নের অবতারণা, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ ও যৌক্তিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন তা কখনোই আমাদের দেশে ঘটেনি। আমাদের শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞরা বিচ্ছিন্নভাবে লিখেছেন, নানা সেমিনার ও সভায় বক্তব্যও দিয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনে, কিন্তু তার প্রভাব পড়েনি শিক্ষাকাঠামোর নির্মাণে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা যে ভেঙে পড়েনি এবং আমাদের শিক্ষা কাঠামো যে এখানে অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, তার কারণ, আমরা অন্যান্য দেশকে প্রচুর পরিমাণে অনুকরণ করেছি। এবং আমাদের শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞরা পাঠ্যসূচি নির্মাণে ও বই লেকার সময় কিছুটা প্রতিফলন ঘটিয়েছে তাঁদের ভাবনার, আপন উদ্যোগে। ফলে, আমাদের শিক্ষা কাঠামোতে সংযোজন ঘটেছে নানা দেশ থেকে নেয়া

www.pathagar.com

শিক্ষা প্রচলনের খণ্ডিত অংশের, কিন্তু সমন্বয় ঘটেনি দার্শনিক বিশ্লেষণ ও সৃজনশীল সজীবতায়।

শিক্ষাব্যবস্থা কোন রপ্তানীযোগ্য সামগ্রী নয় একথা বলেছেন ডক্টর জে. বি কনান্ট। তিনি আমেরিকার শিক্ষাক্রমের উন্নয়নের জন্য নানা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে উল্লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। আমরা অবশ্যই অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে পারি এবং সব শিক্ষাদর্শন থেকেই মূল্যবান কিছু ধারণা গ্রহণ করার থাকতে পারে আমাদের জন্য। কিন্তু এই গ্রহণের ব্যাপারটি যান্ত্রিক হবে না, যেমন করে শুকনো বালি পানি শোষণ করে নেয়। বরং প্রাণী যেমন করে নানা খাবার গ্রহণ করলেও এদের পরিপাক ঘটায় আপন দেহের পুষ্টি সাধন করতে, তেমনি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যা কিছু আমরা বাইরে থেকে গ্রহণ করছি তা একটি সজীব শিক্ষাদর্শনের আলোকে আত্মস্থ হতে হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাদর্শন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব, প্রতিটি শিক্ষাদর্শনই সেই সময়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক তত্ত্ব বা বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, কখনো প্রত্যক্ষভাবে কখনো পরোক্ষভাবে। শিক্ষাদর্শনের কালিক রূপান্তর তাই একটি বাস্তবতা এবং এই পরিবর্তনশীলতা জ্ঞানের বিকাশমান ধারণারই ফসল। এই পরিবর্তনের মধ্যেই শিক্ষার কয়েকটি মূল লক্ষ্য সর্বজনীন। যেমন, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধির বিকাশ শিক্ষার ভিতর দিয়ে আমাদের অর্জিত জ্ঞান ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি নতুন প্রজন্মের কাছে পৌছে দেয়া এবং তারা যাতে এর অগ্রগতি ঘটাতে পারে সেভাবে তাঁদের তৈরি করা। শিক্ষা লাভ যেন শিক্ষার্থীর জীবন ও জীবিকার জন্য প্রাসঙ্গিক ও সহায়ক হয়, সে ভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে সাজানো।

শিক্ষার সম্পর্ক জ্ঞানের সঙ্গে। শিক্ষার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের আদান-প্রদান ঘটে, জ্ঞানকে যাচাই করা হয় এবং নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা হয়। এই জ্ঞান হতে পারে শিল্প, ধর্ম, নৈতিকতা, সাহিত্য, সমাজ, বিজ্ঞান বা প্রযুক্তিগত। জ্ঞানের কোন্ ক্ষেত্র বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা পরমভাবে যাচাই করা সম্ভব নয়, এবং তার চেয়েও বেশি কঠিন এ ব্যাপারে একমত হওয়া। এক সময় মনে করা হত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষা মানবেতর জ্ঞান। সাহিত্য, মানবিক জ্ঞান এবং পরলৌকিক বা ধর্মীয় জ্ঞান হচ্ছে অতিমানবিক জ্ঞান। আবার দার্শনিক কমটি বলেছেন, সভ্যতা তিনটি স্তরের ভিতর দিয়ে এসেছে। প্রথমটি ছিল ধর্মের যুগ, তারপর ছিল দর্শনের যুগ এবং শেষে এসেছে বিজ্ঞানের যুগ বা ধনাত্মক জ্ঞানের যুগ। এই সব বিতর্কে না গিয়েও অনেক বিষয়ে আমরা একমত হতে পারি। কোন্ শিক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন বেশি প্রয়োজন এবং কোন্ শিক্ষার জন্য তা নয়। জ্ঞানের কোন্ ক্ষেত্র দ্রুত বিস্তার লাভ করছে এবং যোগাযোগ নির্ভর হয়ে উঠছে এবং কোন্ ক্ষেত্রে এমনটি ঘটছে না ইত্যাদি।

একটা সময় ছিল যখন জীবনের উদ্ভব, মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য ও মহাবিশ্বের শেষ পরিণতি নিয়ে দার্শনিক ও ধর্মবিশারদগণ তাদের অনুমান ও বিশ্বাসের কথা বলতেন। কারণ, এসব বিষয় ছিল বিজ্ঞানের অনধিগম্য। কিন্তু বিজ্ঞান এখন জীবনের ভিত্তি, মহাবিশ্বের উদ্ভব ও পরিণতি, মহাবিশ্বের সীমানা—সবকিছু নিয়ে কথা বলছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দিয়েছে বিস্ময়কর উপলব্ধি — বিশ্বজগৎ সম্পর্কে, এবং অভূতপূর্ব ক্ষমতা

www.pathagar.com

পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার। বিজ্ঞান চর্চা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং বিজ্ঞানের সৃষ্টিশীলতা এত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, দশ বছরে এই জ্ঞান দ্বিগুণ হচ্ছে। অথচ আগে সহস্র বছর ধরে জ্ঞান থাকতো প্রায় অপরিবর্তিত। কম্পিউটার ও তথ্য বিপ্লবের ফলে তথ্যকে মাথার বাইরে সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত ও দ্রুত পুনরুদ্ধার এখন সম্ভব। ফলে, মানুষের মস্তিষ্ক এখন জ্ঞান ধারণ করে রাখার কাজ থেকে মুক্ত হয়ে, জ্ঞান সৃষ্টির কাজে ও উদ্ভাবনে নিয়োজিত হতে পারছে। মানুষের মস্তিষ্ক কেমন করে কাজ করে তার রহস্য উদ্ভাবন এখন সম্ভব হচ্ছে কম্পিউটারের কল্যাণে। মস্তিষ্কের মডেল রূপে কম্পিউটারের উপর গবেষণা এই নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে।

গণিত আসলে মানবিক বৈশিষ্ট্যের চরম পরাকাষ্ঠা। কারণ, মানুষের বুদ্ধি ও যৌক্তিক ক্ষমতার চরম প্রকাশ ঘটেছে গণিতে। আসলে বিজ্ঞান চর্চার ভিতর দিয়ে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে অর্জিত জ্ঞান ও উদ্ভাবিদ প্রযুক্তির সাহায্যে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, শেষ বিশ্লেষণে, মানুষের ধর্মীয় ভাবনা ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টি করছে। এর ফলে বিজ্ঞান নতুন এক সংযোজন ঘটিয়েছে জ্ঞানের জগতে। এই পরিমাণগত ও গুণগত যে পরিবর্তন, তাকে গভীরতর অর্থে বিপ্লব বলতে হয়। কারণ, শুধু অর্জিত জ্ঞানেরই বিপ্লাবাত্মক রূপান্তর ঘটেনি, জ্ঞান চর্চা ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির পদ্ধতিতেও বিপ্লব ঘটেছে। এই পরিবর্তনের ছাপ আমাদের শিক্ষা কাঠামোতে পড়েনি। জ্ঞানের যে নতুন মানচিত্র নির্মিত হচ্ছে, বিপুল পরিমাণ নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারকে আত্মস্থ করে। সেখানে গভীরতম সমন্বয় সৃষ্টি হচ্ছে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে। এই অন্তমিলের মূল ভিত্তি বিজ্ঞান, যা সম্ভব হয়েছে তিনটি পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে।

প্রথমত বিভিন্ন জ্ঞানের শাখার বিস্তার ও গভীরতা বৃদ্ধি প্রাবরণ ঘটিয়েছে, আপাত বিচ্ছিন্ন জ্ঞানের সব এলাকার মধ্যে। দ্বিতীয়ত বিজ্ঞানের উদ্ভাবিত নতুন পরীক্ষা নির্ভর তাত্ত্বিক ও গাণিতিক পদ্ধতি ক্রমাগত সর্বজনীনতা ও ব্যপকতা লাভ করেছে। তৃতীয়ত বিজ্ঞান নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দর্শন, ব্যাখ্যা ও প্রশ্ন উপস্থিত করেছে বিশ্বজগৎ, আবিষ্কৃত তত্ত্ব ও উপলব্ধ সত্য সম্পর্কে। যেমন, জীবনের ভিত্তিপ্রস্তররূপে ডিএনএ-এর পারমাণবিক বিন্যাসের উদ্ভাবন শুধু জৈব ও অজৈব বস্তুর মধ্যেকার পার্থক্যকেই কমিয়ে আনেনি, বায়োটেকনোলজি ও জেনিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রূপে নতুন প্রযুক্তির জন্ম দিয়েছে, যার প্রভাব অত্যন্ত সুদূর প্রসারী।

কৃত্রিম বুদ্ধি বা Artificial Intelligence আমাদের যৌক্তিক ভাবনা ও সৃজনশীল বুদ্ধির গাণিতিক ভিত্তি আবিষ্কার করছে। আলোর কণাবাদ ও বস্তুর তরঙ্গবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নতুন দার্শনিক ভিত্তি স্থাপন করছে। অর্থাৎ আলো কণা অথবা তরঙ্গ এ প্রশ্ন এখন আর যৌক্তিক প্রশ্ন নয়। আলোর দু'টো বৈশিষ্ট্যই পরস্পরের পরিপূরক। এবং তা সত্য বস্তুকণার ক্ষেত্রেও।

অজ্ঞতা বিয়ে, আধিপত্য নিয়ে এবং পশ্চাদপদ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গায়ের জোরে বা নিছক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে দেশের শিক্ষাকাঠামো নির্মাণ সম্ভব নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি ও শিক্ষার্থীর প্রতিভার বিকাশ, তার আনন্দ ও স্বাধীনতা এবং জীবনের জন্য শিক্ষাকে কাজে লাগাবার গুরুত্ব এখন আন্তর্জাতিকভাবে উপলব্ধ।

www.pathagar.com

আমাদের শিক্ষাকাঠামো নির্মাণে সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও উপলব্ধির যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে, শিক্ষাব্যবস্থাকেও সাজাতে হবে সৃজনশীলতা, আধুনিক জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও গভীর দায়িত্ববোধে। সৃজনশীল ও বুদ্ধিগত সেই আয়োজনকেই আমাদের শিক্ষাদর্শন বলতে চাই।

শিক্ষাকাঠামো প্রসঙ্গে দ্রুত কোন প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করতে চাচ্ছিনা। একাজ জটিল, সময় সাপেক্ষ এবং তা বিদ্বজ্জনের যৌথ মতবিনিময়ের মাধ্যমেই হওয়া উচিত। কিন্তু এই প্রবন্ধের আলোচনার আলোকে ও তাৎক্ষণিক সমস্যারূপে দু-একটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারি সবার বিবেচনার জন্য।

আমাদের শিক্ষাদর্শনে এই লক্ষ্যকে আমরা সামনে রাখবো যে, জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি এবং যথার্থ অর্থে আমাদের স্বাধীনতা ও উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষাকে গুরুত্ব দিতে একটি অভিন্ন শিক্ষাধারা আমরা সৃষ্টি করব, স্বাধীনতার পরপরই যা করা উচিত ছিল। জ্ঞানের যে ক্ষেত্রগুলো Public knowledge বা যোগাযোগসাধ্য জ্ঞান নয়, যে জ্ঞান যে কেউ ইচ্ছা করলেই স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারে না, যে জ্ঞান বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিশ্বাস ও উপলব্ধি নির্ভর, তা চর্চার স্বাধীনতা থাকবে এবং তা গুরুত্বপূর্ণও বটে, কিন্তু সাধারণের পাঠ্যসূচিতে এর অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন নেই। সব শিক্ষাই বিদ্যালয়ে পাঠ্য বইতে বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হবে এই ধারণা ভুল। কৃষিক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোতে মাত্র শতকরা দুই থেকে পাঁচ জন লোক প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষজ্ঞদের বিষয়, এখন যা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা যেমন, উদ্ভিদ ও প্রাণী বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, গণিত ও অন্যান্য বিষয় দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত। ফলে, স্কুলস্তরে কৃষিশিক্ষা পৃথক বিষয় হিসেবে বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নয়।

শিক্ষাকাঠামো সৃষ্টির মূল ভিত্তি হচ্ছে আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রেরণাপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং সামগ্রিক ভৌত অবকাঠামো, যার মধ্যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গন, পাঠ্যবই, পাঠাগার ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ থাকবে এবং তা অন্য সমস্ত সামগ্রী ও ভোগ্যপণ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হবে। যেমন, শিক্ষা উপকরণ বোর্ডটি লাভজনক নয় এই অজুহাতে যে তুলে দেয়া হয়েছে, তা অবিলম্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

উন্নয়নের জন্য শিক্ষা

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তা হল— উন্নত প্রতিটি জাতি এটা উপলব্ধি করেছে যে, দেশের জনসমষ্টিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতার সর্বাধিক সহায়ক রূপে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে, প্রতিটি মানুষকে প্রস্তুত করতে হবে তার সুপ্ত সম্ভাবনার পরম পরাকাষ্ঠা ঘটিয়ে, এবং তা যথার্থ শিক্ষা প্রদানের ভিতর দিয়ে। একজন শিক্ষা বঞ্চিত ব্যক্তি সমাজের জন্য গুরুভার মাত্র। কারণ, সমাজ থেকে সে যা নেয় তার চেয়ে অবদান রাখে কম। ব্যক্তি মানুষ যখন প্রায়শ ঋণাত্মক অবদান রাখতে থাকে কোন সমাজে, তখন সে সমাজকেই সামগ্রিকভাবে ঋণী হয়ে পড়তে হয় অন্য কোন জাতির কাছে। কোন সমাজ বা জাতিকে বিকশিত ও অগ্রসর হতে হলে, এমনকি টিকে থাকতে হলে, তাকে শিক্ষিত হতে হবে যথার্থভাবে।

একজন উচ্চ শিক্ষিত মানুষকে ঘিরে অনেক সংখ্যক দক্ষ ও ত্যাগী মানুষ সমবেত হতে পারে এমন কোন যৌথ কাজের আয়োজনে, যা ঐ শিক্ষিত ব্যক্তি উদ্ভাবন করতে পারে, তাঁর প্রজ্ঞা ও উদ্ভাবনমূলক পরিকল্পনায়। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যে পরিবর্তনীয়তা ও গতিশীলতা প্রয়োজন সমগ্র ব্যবস্থাপনায়, সেখানে দায়িত্ববোধ ও বিচার শক্তি অত্যন্ত প্রয়োজন, এবং তা একজন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিই শুধু দিতে পারে।

শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের এই সম্পর্ক ও পারস্পরিকতা একটি নতুন ধারা, যা সূচিত হয়েছে বড়জোর একশ বছর আগে। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা প্রাপ্ত, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ, বলতে বুঝাতো অনুৎপাদনশীল ব্যক্তি। মনে করা হত অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তিরাই শুধু তাঁদের কায়িক শ্রম দিয়ে সম্পদ সৃষ্টি করে এবং তাদের শ্রমের মূল্যে সৌখিন সামগ্রীর মতন উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিদের পোষা হয় মাত্র। আর এজন্যেই দীর্ঘদিন উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা একটি সীমা অতিক্রম করতে পারে নাই। বিংশ শতাব্দীর সূচনায়ও এমন দেখা গেছে যে, বিশাল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিকে তার উচ্চ শিক্ষার সার্টিফিকেট গোপন করতে হয়েছে, শেষে তাঁর উচ্চ শিক্ষা উৎপাদনশীল কাজে তাঁর নিয়োগ পাবার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে এই আশঙ্কায়। তখনো মনে করা হত শিক্ষা লাভ করা মানেই শাবল, হাতুড়ি বা কোন হাতিয়ার ব্যবহার থেকে দূরে থাকা। এবং কায়িক শ্রম থেকে দূরে থাকার অর্থই যেহেতু

www.pathagar.com

উৎপাদনশীলতা থেকে দূরে থাকা, তাই শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনশীলতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক ছিল প্রত্যানুপাতিক। বস্তুত স্কুল শব্দটি যে গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে তার অর্থ হল অবকাশ। আর "স্কুল" এর এই অর্থটাই যেন সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিফলিত হয়েছে ।

ইটালিতে যে রেনেসাঁস ঘটেছিল, হঠাৎ করে শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার উদ্ভব ও বিস্তারের ভিতর দিয়ে, তা প্রধানত কৃষক ও শ্রমিকদের দুর্ভোগ ও শোষণ বৃদ্ধি করে। কারণ, এসব অনুৎপাদনশীল অভিজাত শ্রেণীকে অধিক সংখ্যায় পুষতে বাড়তি শ্রম দিতে হত শ্রমিকদের।

আদর্শবাদীরা এই রীতি বন্ধ করার লক্ষ্যে কায়িক শ্রম ও শিক্ষাকে সমন্বিত করার চেষ্টা করেছেন কৃত্রিমভাবে, যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ইমারসনের নিউ ইংল্যান্ডে, যেখানে একজন কৃষক জমিচাষ ও মূল গ্রীক থেকে হোমার পাঠ একই সঙ্গে চালিয়ে যেত। কিন্তু ইমারসনের মৃত্যুর আগেই এসব আদর্শবাদীরা হোমার ও নিউ ইংল্যান্ড ত্যাগ করে।

টমাস জেফারসন উচ্চশিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকে তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবার চেয়েও বড় কীর্তি বলে মনে করতেন। কিন্তু তিনিও তাঁর ব্যাপক শিক্ষা পরিকল্পনায় উচ্চশিক্ষার সুযোগকে মুষ্টিমেয় মেধাবী শিক্ষার্থীর মধ্যে সীমিত রাখার কথা ভেবেছেন, কারণ, শুধু সামান্য সংখ্যক মানুষকেই হাতের কাজ ও কায়িক শ্রম থেকে নিষ্কৃতি দেয়া সম্ভব ছিল তখন।

এখন থেকে একশ বছর আগেও সামাজিক উন্নয়নের উপাদানরূপে শিক্ষা গুরুত্ব পায়নি। খাদ্য, ভূমি, কৃষি ও বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন ছিল প্রধান বিচার্য বিষয়। উৎপাদনশীল কাজের বিপরীতে সম্মানজক অবকাশ যাপনের জন্যেই যেন উচ্চ শিক্ষার আয়োজন ছিল। শিক্ষার্থীদের প্রতি একটি প্রচলিত উপদেশ ছিল সৎ ও শ্রম নির্ভর কর্মজীবীদের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা না জানানোর। বস্তুত উপদেশ তখনই প্রয়োজন হয় যখন সহজাত নিয়মে কোন কিছু না ঘটে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সেই দৃষ্টিভঙ্গি এখনো আমাদের অর্থনৈতিক ভাবনাকে প্রভাবিত করে রেখেছে, যা প্রতিফলিত আমাদের ভাষা ব্যবস্থায়।

যেমন, উৎপাদনশীল শ্রম বলতে কায়িক বা পেশীনির্ভর শ্রমকেই বুঝানো হয়ে থাকে। অন্যদিকে অনুৎপাদনশীল বা আনুষঙ্গিক খরচ বলে আখ্যায়িত করা হয় বুদ্ধিনির্ভর সব কাজ ও সেজন্য বিনিয়োগকৃত অর্থ, যেমন পরিকল্পনা, গবেষণা, হিসাব রক্ষা, প্রশাসন ইত্যাদি কাজ ও এজন্য কৃত্য ব্যয়। উৎপাদন, শ্রম, কর্মী ইত্যাদি শব্দগুলো পুরানো অর্থ বহন করে বলে। উৎপাদনে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষা ও জ্ঞানের যে নতুন প্রভাব তা সহজে উপলব্ধ নয়।

আমরা লক্ষ্য করব— শিক্ষা ও অর্থনীতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার সূচনা ঘটেছে। পরিবর্তিত উৎপাদন ব্যবস্থায়, বিশেষ করে জ্ঞানের জগৎ এবং উৎপাদনের কৌশল ও হাতিয়ার দীর্ঘসময় ধরে বিকশিত ও পরিবর্তিত হবার ফলে, শিল্পোন্নত দেশগুলোতে শিক্ষা এখন সবচেয়ে বড় মূলধনরূপে আত্মপ্রকাশ করছে।

www.pathagar.com

শিক্ষা আজকের দিনে আর অনুৎপাদনশীল নয়, যেমনটি আগে ছিল। পেশীশক্তির সাহায্যে ও হাতের কাজে উৎপাদনে অংশ নেবার যে পর্যায় তা অতিক্রম করে এসেছে উন্নত দেশগুলো। আধুনিক সমাজ ও অর্থনীতি দাবি করে জ্ঞান, দূরদৃষ্টি, কল্পনাশক্তি, মানসিক শ্রম ও নতুন সব ধারণা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শিক্ষা ক্রমাগতভাবে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়েও শিক্ষার অবদান এখন বেশি।

প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতার উপরে আমাদের হাত নেই, এছাড়া শিল্পের কাঁচামাল প্রকৃতি থেকে আহরণের গুরুত্ব ক্রমাগত কমে যাচ্ছে এবং তা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে কৃত্রিম সব সামগ্রির দ্বারা। এ হল নতুন উদ্ভাবিত নানা প্রযুক্তির ফসল। অন্যদিকে নতুন অর্জিত জ্ঞান ও উদ্ভাবন মূলধনের সীমাবদ্ধতা অনেকাংশে কমিয়ে আনতে পারে। অবশ্য শুধু যথেষ্ট সংখ্যক প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ, চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবদ বা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি ও শ্রমিক একটি জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নের নিশ্চয়তা দেয় না। একটি গতিশীল নীতি ও পরিকল্পনা, প্রেরণা ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন, যা আসতে পারে সত্যিকার অর্থে উচ্চ শিক্ষিত, বিদগ্ধ ও উদ্ভাবনী চিন্তার অধিকারী ব্যক্তিদের নেতৃত্বে। প্রয়োজনীয় উচ্চ লক্ষ্য, গতিশীল নীতি, সাহসী পরিকল্পনা, প্রেরণা ও কর্মদক্ষতা শেষ পর্যন্ত আমাদের ফিরিয়ে আনে শিক্ষার দিকে।

শিক্ষার জগতে সবচেয়ে বড় যে বিপ্লব সাধিত হয়েছে, তা সবচেয়ে বড় প্রভাব রেখেছে শিক্ষার উপরেই। শিক্ষা মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে আমাদের মূল্যবোধ সম্পর্কে, লক্ষ্য সম্পর্কে, শিক্ষার কাঠামো ও পদ্ধতি সম্পর্কে। সম্পদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ ক্ষেত্র এখন শিক্ষা। উচ্চতম শিক্ষা ও জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। অন্যদিকে উচ্চশিক্ষা, এমনকি উচ্চতম শিক্ষা, নির্বাচিত মুষ্টিমেয় অভিজাত ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার যে ধারা, তা বদলে গিয়ে ভবিষ্যতে অনেকের জন্য উন্মুক্ত হবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। অন্য কথায় জ্ঞানের ও উপলব্ধির জগৎ যেখানে দীর্ঘদিন সমতল ভূমির মতই অনুচ্চ ছিল, তা পর্বতশৃঙ্গরূপে ক্রমাগত ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত হচ্ছে এবং সেই সুউচ্চ পর্বত চূড়ায় আরোহীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ভবিষ্যতে তা মিছিলের রূপ নিতে চাচ্ছে।

শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের এই নতুন সম্পর্ক ও পারস্পরিকতার মূলে রয়েছে শিক্ষা ও জ্ঞানের রূপান্তর ও বিকাশ, সেই সঙ্গে উন্নয়ন সম্পর্কে পরিবর্তিত ধারণা। শিক্ষা ও জ্ঞানের ইতিহাস বস্তুত মানুষের বিকাশের ইতিহাস। জ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মানুষের জ্ঞান ক্রমাগত বাড়ছে। জ্ঞান শুধু সঞ্চিত হয় না, জৈব বিপাকক্রিয়ার মতন এর সংবৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটতে থাকে। জ্ঞানের সৃষ্টি ঘটে শুধু বাইরে থেকে উপাদান গ্রহণ করে নয়, জ্ঞান নিজেই এর রসদ সরবরাহ করে পৌনঃপুনিকভাবে।

জ্ঞানের বিকাশের পথ অবশ্য প্রাণীজগতের তুলনায় অনেক বেশি উন্মুক্ত। জ্ঞানের কোন ক্ষেত্র যতই উন্নত ও অগ্রসর হোক, যত গভীরভাবেই আমরা পরিপূর্ণ বলে মনে করি কোন জ্ঞান, এবং যত যত্নের সঙ্গে সম্পন্ন করি এই জ্ঞানের সাধনা, নতুন কিছু সংযোজন করার ও আরো শুদ্ধতর স্তরে সেই জ্ঞানকে নিয়ে যাবার অবকাশ ও সম্ভাবনা

www.pathagar.com

থেকেই যায়। জ্ঞানের অগ্রযাত্রার পথ তাই অন্তহীন। জ্ঞানের সাধনা অসমাপ্ত ও অশেষ। জ্ঞানের অগ্রগতি এত দ্রুত আগে ঘটেনি, যেমনটি এখন ঘটছে।

প্রথমদিকে জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটতো অত্যন্ত ধীরগতিতে, হয়তো সহস্র বছর পার হয়ে যেত জ্ঞানকে দ্বিগুণ করতে। যেমন প্রস্তর যুগের সভ্যতা, সামাজিক গঠন ও মনস্তত্ব ছিল এমন যে, একই জীবন ধারা ও উৎপাদনের হাতিয়ার, যেমন বল্লম, কুঠার তারা ব্যবহার করতো বংশ পরম্পরায়। কিন্তু জ্ঞানের এই নিশ্চয়তা তখনকার জীবন ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি তখন দুর্লভ ছিল তাই শুধু নয়, জ্ঞানের সংরক্ষণ ছিল দুঃসাধ্য। শেষে পরীক্ষিত ও প্রয়োজনীয় জ্ঞানটুকুই সমাজ হারিয়ে ফেলি, এই আশঙ্কায় কোন প্রশ্ন উত্থাপন বা পরীক্ষা নিরীক্ষার ভিতর দিয়ে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির চেষ্টাকে তারা বিপজ্জনক মনে করতো।

নিতান্ত টিকে থাকার অর্থনৈতিক অবস্থায় বন্দী আমাদের প্রাচীন সেই পূর্বপুরষদের নতুন কোন জ্ঞান সৃষ্টি করার মতন শক্তি, সম্পদ ও অবকাশ ছিল না। মানুষ যখন লিখতে শিখলো, তখন মানুষের মস্তিষ্ক মুক্ত হল, পুরানো জ্ঞানকে স্মৃতিতে নির্ভুলভাবে ধরে রাখার কঠোর শ্রম থেকে। এটা ঘটেছিল এখন থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে। কিন্তু এর পরেও দীর্ঘদিন মানুষ পুরানো ঐতিহ্যের ধারক ও রক্ষণশীলতার জড়তা ধরে রেখেছে জ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে। এমনকি ছাপাখানা আবির্ভূত হবার পরও জ্ঞানের জগতে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির সাহসিকতা সৃষ্টি হয়নি দীর্ঘদিন। ধীরে ধীরে জ্ঞানের বিস্তার ও সঞ্চারণ, জ্ঞানের প্রয়োগ ও বিনিময় অসংখ্যের মধ্যে সংঘটিত হবার ভিতর দিয়ে একটি সামাজিক সচেতনতা ও ব্যক্তি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক গঠন যখন নতুন রূপ লাভ করলো এবং জ্ঞানের আত্মিকরণ ঘটলো, তখনই মাত্র জ্ঞান দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকলো। এটা ছিল জ্ঞানের রূপান্তর ও বিকাশ লাভের পর্যায় সৃষ্টির ও ভিতর থেকে তৈরি হয়ে উঠার অভ্যন্তরীণ ও গঠনগত প্রস্তুতি ।

কিন্তু বিস্তার ও নতুন জ্ঞানের বিস্ফোরণ ঘটার জন্য আর একটি বাহ্যিক পরিবেশও সৃষ্টি হচ্ছিল ধাপে ধাপে। জ্ঞান যে নিছক সৌখিনতা নয়, জীবন ও জীবিকার জন্য প্রয়োজন। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি যে নতুন নির্মাণ ও উৎপাদন কৌশল, উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন দক্ষতা দিতে পারে, এই উপলব্ধি এবং নতুন জ্ঞান যে সৃষ্টি করা সম্ভব— এই আত্মবিশ্বাস, নতুন এক সম্পর্ক সৃষ্টি করলো শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদনশীলতার।

অর্থাৎ জ্ঞানের অগ্রগতি যখন উৎপাদনশীলতাকে সাহায্য করলো এবং জ্ঞানের সাধকরা শ্রমজীবী মানুষের জন্য বাড়তি বোঝা না হয়ে সহায়ক হল, তখন শিক্ষা ও উৎপাদনশীলতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের একটি গুণগত পরিবর্তন ঘটলো। অন্তত যেখানে তা ঘটলো, সেখানে শিক্ষা উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করলো এবং উন্নয়ন শিক্ষাকে।

শিক্ষাকে যাঁরা পুরানো ঐতিহ্যে যাচাই করেন, তাদের দৃষ্টিতে শিক্ষাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা অনেকটা যান্ত্রিক ও স্থুল ব্যাপার এবং বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ফসল মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা দেখব, শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নকে সম্পর্কিত করার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতা রূপ লাভ করেছে জ্ঞানের বিকাশ, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ভিতর দিয়ে, যা উৎপাদন ব্যবস্থা, সম্পদ সৃষ্টি, সামাজিক ও রাজনৈতিক গঠন ও মানুষের প্রত্যাশাকে আমূল বদলে দিচ্ছে। নিছক মতবাদ বা

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার বলে এই নতুন জ্ঞানের, সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করা যাবে না। উৎপাদন কৌশল ও সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুন যে সম্ভাবনা ও প্রত্যাশা তা গভীরভাবে আমাদের মূল্যবোধ ও জীবন দর্শনকে প্রভাবিত করার কথা। শিক্ষার লক্ষ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অর্পিত দায়িত্ব, পরিবর্তনশীল এই অবস্থার আলোকে ব্যাপকতর ও গভীরতর হবে এবং সেই সঙ্গে অভিনব ও গতিশীল, এটাই স্বাভাবিক। শিল্পোন্নত দেশগুলোর সঙ্গে এক্ষেত্রে আমাদের বাস্তব পদক্ষেপে পার্থক্য অবশ্যই থাকবে, আমাদের অবস্থান ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের যে কার্যকারণ সম্পর্ক উন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে অভিজ্ঞতা ও নানা পরীক্ষার ভিতর দিয়ে, তার আলোকেই আমাদের পথ নির্ধারণ করতে হবে।

এখানে যা বিশেষভাবে বিবেচনার তা হল, এখনকার শিল্পোন্নত দেশগুলো যখন অর্থনৈতিকভাবে আমাদের দশায় ছিল তখন তারা জানতো না অনেক সম্ভাবনার কথা যা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ভিতর দিয়ে পরে প্রমাণিত হয়েছে। বিশ্বে তখন এই জ্ঞান ও উপলব্ধি ছিল না, বিশ্ব প্রকৃতি ও মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্পর্কে এখন যা আছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিক্ষা পরিকল্পনা তাই এর সম্পদ ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারাই শুধু নির্ধারিত হবার নয়, বিশ্বে যে জ্ঞান ছড়িয়ে আছে এবং যেভাবে সে জ্ঞানের বিকাশ ঘটছে, শিক্ষার ভিতর দিয়ে উন্নয়নের যে পথ আবির্ভূত হয়েছে—এসবই আমাদের শিক্ষাকে উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারে এমন এক প্রত্যাশা ও সম্ভাবনায়, যা আমাদের সম্পদ ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা শুধু নির্ধারিত নয়।

উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষাকে সম্পর্কিত করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি দেশই এর জনসংখ্যা, বস্তুগত সম্পদ, শিক্ষার সার্বিক মান ও বিস্তার, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং সেই সঙ্গে দেশের ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের স্তর দ্বারা প্রভাবিত হবার কথা। উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার পরিকল্পনা করতে হলে একটি সুচরম পথ আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে, যা কোন দেশ থেকে ধার করার কোন সুযোগ নেই।

শিক্ষা ও উন্নয়ন যেসব উপাদানের অপেক্ষক তা অনুমান করা গেলেও, এসব উপাদানের সঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতির কোন গাণিতিক সম্পর্ক নির্ধারণ সম্ভব নয় । প্রতিটি দেশই এর বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন এবং বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন দেশ উন্নয়নের অগ্রযাত্রা শুরু করেছে বলে, প্রত্যেকের অগ্রগতির পথ অনন্য হতে বাধ্য, যে পথ তাদেরকেই ক্রমাগত আবিষ্কার করতে হবে, অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে, কিন্তু অনুকরণ করে নয়।

ক্রমাগত বলছি কারণ, শিক্ষা ও উন্নয়ন সম্পর্কে যে ধারণা তা বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং তা হতেই থাকবে। দ্বিতীয়ত শিক্ষা ও জ্ঞানের জগৎ এবং সেই সঙ্গে উন্নয়নের সম্ভাবনা ও ধারণা পরিবর্তিত হবার ভিতর দিয়ে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক, নির্ভরতা ও পরিপূরকতা ক্রমাগত গভীরতর ও ভিন্নতর রূপ নিচ্ছে।

উন্নয়নের ধারণা একটি সাম্প্রতিক ব্যাপার। সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসকে যদি দশ হাজার বছর আগে থেকেও পর্যালোচনা করি, দেখা যাবে, মানুষ প্রথমদিকে বড়জোর বিরূপ পরিবেশে টিকে থাকতে চেয়েছে জীবন ধারার কোন পরিবর্তন না এনে। এই স্থবিরতা ছিল যেমন জীবনযাত্রার পদ্ধতিতে, তেমনি জনসংখ্যার বিচারেও। ইউরোপের

www.pathagar.com

শিল্প বিপ্লবপূর্ব কালে অর্থাৎ ১৭৫০ এর আগে, প্রতি শতাব্দীতে জনসংখ্যা বেড়েছে মাত্র শতকরা ৭ জন। শিল্প বিপ্লবের পরবর্তীতে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৫-তে।

শিক্ষাকে জীবনের জন্য, উৎপাদনের জন্য ও উন্নয়নের জন্য ভাবতে যাঁরা অপছন্দ করেন, অর্থাৎ শিক্ষার জন্যেই শিক্ষা বা বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনের জন্যেই শুধু শিক্ষা— এই দর্শনের সমর্থক যারা, তাঁরা একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন, পৃথিবীতে এই বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস করতে পারতো না উন্নত জীবন ও উন্নততর জীবনের প্রত্যাশা নিয়ে, যদি না শিক্ষার ভিতর দিয়ে অসংখ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হত জ্ঞান, নির্মাণ কৌশল ও উৎপাদন হাতিয়ার উদ্ভাবিত হত, এবং এর ফলশ্রুতিতে অর্জিত বাড়তি সম্পদ ও অবকাশ সুগম করতো অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর দীর্ঘতর শিক্ষা লাভের পথ। উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক পর্যালোচনায়, উন্নয়ন ও শিক্ষার ব্যাপকতর অর্থ আমরা এখানে গ্রহণ করব। কারণ, উচ্চতর শিক্ষাই উন্নয়নের ধারণা ও প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছে।

উন্নয়ন বলতে প্রবৃদ্ধি ও পরিবর্তনকে বুঝানো হয়ে থাকে। সংকীর্ণ অর্থে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং ব্যাপকতর অর্থে জীবনের মান উন্নয়ন। জীবনের মান উন্নয়ন তখনই সম্ভব হয়, যখন সামাজিক গঠন, মূল্যবোধ ও উদ্দীপনা এমনভাবে রূপান্তরিত হয়, যা জাতীয় অগ্রগতির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

জাতিসংঘ নয়টি উপাদানকে চিহ্নিত করেছে জীবনযাত্রার মান নির্ধারক রূপে। এগুলো হল- স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও কাজের পরিবেশ, গৃহায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, বস্ত্র, বিনোদন এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা। উন্নয়ন যেখানে পরিবর্তনের ধারাকে অন্তর্ভুক্ত করে, সেখানে তা সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। পরিবর্তনের মূল শর্ত হল মুক্তবুদ্ধি ও সৃজনশীলতার উন্মেষ ও বিস্তার। কতটা স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবনা ও চেতনা বিকাশ লাভ করছে, জীবন ধারার বৈচিত্র্য সাধনে ও নতুন উপলব্ধি লাভে কত বিকল্প পথ বেছে নিতে পারে কোন সমাজের মানুষ, সেটাই নির্ধারণ করে সংস্কৃতির বিকাশমানতা।

সমাজের অন্তর্গত জটিল নানা উপাদানের যে সংগ্রহ, সংঘাত ও সমন্বয় এবং পরিবর্তনশীল বাহ্যিক যে প্রভাব— তথ্য, জ্ঞান, উপলব্ধি ও ভৌত পরিবেশের—তা পরিবর্তনের ধারাকেও অনির্বচনীয়, উন্মুক্ত ও অন্তহীন করে রাখে। আর এজন্যেই যান্ত্রিকভাবে উন্নয়নকে পরিমাপ করা সম্ভব নয়, এবং উপাদানগুলোকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত ও যাচাই করা। উন্নয়নের ধারণা যেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সীমানার বাইরে বিস্তৃত, সেখানে নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক চেতনা ও মানসিক প্রেরণার মতন অনির্বচনীয় সব উপাদান ক্রিয়াশীল।

উন্নয়নের এই ব্যাপক ও পরিবর্তী ধারণাকে যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে শিক্ষাই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক উদ্যোগ যা উন্নয়নকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে গভীরভাবে। উন্নয়নের ধারণার মতই শিক্ষাও একটি বহুমাত্রিক, জটিল ও পরিবর্তী ব্যবস্থা, যা কোন জাতির জীবনযাত্রার মানকে শুধু পরিমাপ করে না খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য বা গৃহায়নের মতন এক একটি বিচ্ছিন্ন উপাদান রূপ, বরং উন্নয়নের সমস্ত আয়োজন, প্রচেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

www.pathagar.com

সাধারণভাবে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি ও এ সম্পর্কে আপ্তবাক্য উচ্চারণ যথেষ্ট নয়, শিক্ষার সমস্যা সমাধানে এবং উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নির্ধারণে। বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে সমস্যার অবধারণ প্রয়োজন, কিছুটা ইতিহাসের পটভূমিতে, বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতার আলোকে, দর্শন ও জ্ঞান তত্ত্বের বিচারে এবং কিছুটা প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিকও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতেও যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সেও সর্বজনীন শিক্ষার প্রচলন ঘটেনি এবং সেখানকার জনগণের অর্ধেক ছিল তখনো অশিক্ষিত, যদিও শিল্প বিপ্লবের ফসলরূপে ব্যাপক অর্থনৈতিক অগ্রগতি ততদিনে সাধিত হয়েছিল। অন্যান্য দেশ, যেমন আমেরিকা, জাপান বা জার্মানি, যেখানে একটু বিলম্বে শুরু হয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্যে দ্রুত শিল্পায়ন, সেখানে তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সর্বজনীন শিক্ষা তুলনামূলকভাবে আগে শুরু হয়েছে। অবশ্য রাশিয়ায় সর্বজনীন শিক্ষার অনুপস্থিতিতেই শিল্পায়ন শুরু হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে, এবং পরবর্তীতে শিক্ষার উপরে জোর দেয়া হয় সোভিয়েত বিপ্লবের ফলে। বিজ্ঞান প্রযুক্তির ইতিহাস থেকে যে সাধারণ নিয়মটি উদঘাটিত হয় তা হল, যত বিলম্বে কোন দেশ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়, শিক্ষার দিক থেকে তত বেশি প্রস্তুতি সেখানে প্রত্যাশিত।

সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার ও উন্নত শিক্ষাগত প্রস্তুতি নিয়ে যাঁরা শিল্প বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছে, তারা অনেক বেশি সফল হয়েছে অগ্রগতিকে দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত রাখতে। আমেরিকা, জাপান বা জার্মানি এর দৃষ্টান্ত। অন্যদিকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লব আগে ঘটলেও প্রতিযোগিতায় এরা যে তুলনামূলকভাবে অগ্রগামী থাকেনি তা সম্ভবত এই জন্যে যে, সর্বজনীন শিক্ষা এসব দেশে বিলম্বিত হয়েছে। শিক্ষার অসম বিস্তারকে নির্দেশ করেই ডিজরেল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসেও আক্ষেপ করে বলেছেন "আমাদের একটি দেশ কিন্তু দুইটি জাতি"। শিক্ষাপ্রাপ্ত ও শিক্ষা বঞ্চিত রূপে বিভক্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেই এই ক্ষোভ ও উদ্বেগ তিনি প্রকাশ করেছিলেন। বস্তুত সমগ্র বিশ্বই আজ বিভক্ত শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত উৎকর্ষের ভিত্তিতে।

অর্থনৈতিক উন্নতি সত্ত্বেও, শিক্ষার ভিত্তিতে দ্বিধাবিভক্ত জাতিকে একক রাষ্ট্রের মধ্যে ধারণ করতে গিয়েই, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো একভাবে এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো অন্যভাবে সমাধান খুঁজেছে। পশ্চাদপদ ও দুর্দশাগ্রস্থ জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে পশ্চিম ইউরোপে কল্যাণ রাষ্ট্র বা welfare state এর ধারণা সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুই ধরনের সমাজ ব্যবস্থাতেই সর্বজনীন শিক্ষা এবং উচ্চ শিক্ষার স্তর ভাগ অপরিহার্য বলে উপলব্ধ হয় আধুনিক রাষ্ট্র সৃষ্টির প্রয়োজনে। শিল্পায়নের ভিতর দিয়ে যে সব দেশ উৎপাদন ও উন্নয়ন সাধনে সফল হয়েছে তাদের রাজনৈতিক দর্শন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সামাজিক গঠন ও জীবন দর্শনের পার্থক্য নিয়েও, যে অর্থে ও যে পরিমাণে এসব দেশ উন্নয়নের ধারাকে আত্মস্থ করেছে, দেখা যাবে সেই অনুপাতে আধুনিক শিক্ষাকে তারা গ্রহণ করেছে প্রায় অভিন্নভাবে। এর প্রমাণ মেলে যখন আমরা লক্ষ্য করি যে, বিভিন্ন উন্নত দেশের ল্যাবরেটরী, গবেষণার বিষয় নির্বাচন, ব্যবহৃত গবেষণা জার্নাল, উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত যন্ত্র ও শিল্প কারখানা, এমনকি দেশ রক্ষার নামে মারণাস্ত্র নির্মাণ—একইভাবে

www.pathagar.com

প্রায় ঘটেছে, এদের রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে। অথচ যেসব বিষয় নিয়ে সমস্ত বিতণ্ডা, বিরোধ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি ঘটে থাকে এবং উন্নয়ন তত্ত্বের নানা আলোচনার গুরুত্ব প্রদান করা হয়ে থাকে, তা হল রাজনৈতিক মতবাদ, সামাজিক গঠন, ধর্মীয় জীবন ধারা ইত্যাদি।

যথার্থ বিশ্লেষণে দেখা যাবে, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড উন্নয়নের সক্রিয় কারণ বা প্রেষণা শক্তি নয়। উন্নয়নের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক পরোক্ষ ও প্রান্তিক। উন্নয়নের মূল প্রেষণা শক্তিরূপে চিহ্নিত করতে চাই শিক্ষাকে—এর ব্যাপকতর অর্থে। বিভিন্ন দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে অন্ত ও আন্ত যে পার্থক্য ও বিভেদ তার কারণ, প্রকৃতির নিয়মগুলোকে জানা, বিশ্ব জগৎ সম্পর্কে ধারণা লাভ, ব্যক্তি ও সমাজকে এদের সুপ্ত সম্ভাবনায় আবিষ্কার করার এবং প্রকৃতি ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা অর্জন— আর এসব কিছু সার্থক হতে পারে যথার্থ শিক্ষার আয়োজনে।

শিক্ষার যে বিশেষ দিকগুলো উন্নয়নকে প্রভাবিত করে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ হল কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি। উৎপাদনের জন্য শ্রমের অবদান প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। এই শ্রম ক্রমাগত পেশীনির্ভরতা কাটিয়ে বুদ্ধিনির্ভর হয়ে উঠছে এবং শিক্ষা কর্মদক্ষতার গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। শিক্ষা একই সঙ্গে জ্ঞানের ভাণ্ডারকে প্রসারিত করছে এবং বিস্তার ঘটাচ্ছে উদ্ভাবিত নতুন জ্ঞানের। শিক্ষার নানা পরোক্ষ প্রভাবের মধ্যে রয়েছে জনসাধারণের মধ্যে উদ্যোগ ও উদ্ভাবনী শক্তির উদ্বোধন, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ও ধরন বদলে দেয়া, রুচি পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সচলতা ও যোজন বৃদ্ধি। শিক্ষা শুধু যোগ্য রাষ্ট্র পরিচালক, উদ্যোক্তা, প্রশাসক, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, শিক্ষক, চিকিৎসক ও বিভিন্ন পেশার দক্ষ কর্মী সৃষ্টি করে না, যথাযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করার যে বিচারশক্তি ও বুদ্ধিগত সততা সেটাও অর্জিত হয় শিক্ষার ভিতর দিয়ে।

শিক্ষাকে সাধারণত দুইভাবে দেখা হয় ঃ একটি হল উৎপাদনের জন্য শিক্ষা, অন্যটি জীবনকে উপভোগের জন্য শিক্ষা। উৎপাদনে অংশ নেবার জন্য বা জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও কাজ করার দক্ষতা বাড়াতে যে শিক্ষা তা হল উৎপাদনমুখী শিক্ষা। অন্যদিকে জীবনকে আনন্দময় করতে বা উপভোগ করতে যে শিক্ষা তা হল ভোগের শিক্ষা। যে শিক্ষা উৎপাদন ও উপার্জনের জন্য তার সম্পর্ক আয়ের সঙ্গে এবং যে শিক্ষা উপভোগের জন্য তার সম্পর্ক ব্যয়ের সঙ্গে। এই বিভাজনের ভিত্তিতে প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষাকে উৎপাদনমুখী শিক্ষা এবং মানবিক ও সাধারণ শিক্ষাকে ভোগের শিক্ষা রূপে অনেক অর্থনীতিবিদ ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিন্তু শিক্ষাকে এভাবে ভাগ করা সঙ্গত নয়। কারণ, কোন শিক্ষাই বিশুদ্ধ উৎপাদনের শিক্ষা নয় এবং কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ ভোগের শিক্ষা নয়। প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার মধ্যেও আনন্দ ও সত্যানুসন্ধান আছে যার উৎস উদ্ভাবন ও সমস্যার সমাধান ও মানুষের প্রয়োজন মিটানো।

অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষা ও মানবিক শিক্ষা নানাভাবে উৎপাদনে সাহায্য করে, যেমন ভাষা শিক্ষাদান, যোগাযোগ সৃষ্টি, উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি, সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা—এসবই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

www.pathagar.com

এছাড়া শিক্ষাকে ভোগের বিষয় হিসাবে দেখলে এবং শিক্ষার খরচকে সামাজিক অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের সঙ্গে এক করে দেখলে, শিক্ষার অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না।

লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষা ব্যক্তি মানুষ ও সমাজের মূল্যবোধ ও রুচিকে বদলে দেয় এবং আমাদের নিয়ে যায় উন্নততর এক জীবন ধারায়, যা আয় ব্যয়ের গতানুগতিক হিসাবে ধরা পড়ে না। অর্থনীতিবিদ যখন শিক্ষার ব্যয়কে সামাজিক অন্যান্য ব্যয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, তখন যে ব্যাপারটি অবহেলিত হয় তা হল, শিক্ষা বস্তুত একটি বিনিয়োগ, যার প্রভাব বহুমাত্রিক এবং যার ফল পেতে দুই দশক পর্যন্ত অনেক সময় অপেক্ষা করতে হয়। শিক্ষার জন্য সাধিত ব্যয়কে তাই একই সঙ্গে ব্যয় ও বিনিয়োগরূপে গণ্য করতে হয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদী হলেও, এক্ষেত্রে অকেজো বা অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়ার হার অন্য কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের তুলনায় কম। শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক অন্যকোন বিনিয়োগের বা খরচের খাতকে তুলনা করা যায় না আরো একটি কারণে এবং তা হল, অন্যসব ক্ষেত্রে বিকল্প একাধিক ব্যবস্থা থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। অবশ্য শিক্ষার জন্য বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎপাদন কতটা হল এবং শিক্ষার সামগ্রিক ব্যবস্থায় দক্ষতা কতটা তার একটি হিসাবও সম্ভব।

শিক্ষা খাতে জাতীয় যে ব্যয় তাকে আমরা দেখতে পারি কিছুটা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ এবং কিছুটা সামাজিক উপভোগের জন্য বিনিয়োগরূপে। উন্নত দেশগুলোতে মনে করা হয়, শিক্ষার যে উৎপাদন তার অর্ধেকটা সামাজিক ও ব্যক্তিগত উপভোগ্যতার জন্য এবং বাকী অর্ধেক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য। উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে সামাজিক ভোগের অংশ কমিয়ে শিক্ষাকে উৎপাদানশীলতা বৃদ্ধির জন্যে বেশি নিয়োজিত করার কথা।

শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ ও এর ফললাভের মধ্যে সময়ের ব্যবধান বেশি বলে, শিক্ষার পরিকল্পনায় দূরদৃষ্টি ও আত্মত্যাগের মনোভাব প্রয়োজন। অন্যান্য অর্থনৈতিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুনাফা বা ফললাভ স্বল্পকালের ব্যবধানে মেলে বলে সহজেই তা চোখে ধরা পড়ে, অন্যদিকে বিনিয়োগকারী নিজেই এর ফল উপভোগ করে। সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তন যেখানে দ্রুত ঘটে, সেখানে ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ, বিশেষ করে তা যখন তাৎক্ষণিকভাবে ফল দিচ্ছে না এবং সেই ফললাভ দেখা বা দেখানো যাচ্ছে না, এক ধরনের ভবিষ্যৎ ভাবনা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দায়িত্ববোধ ও ত্যাগের মনোভাব দাবি করে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ যে অবহেলিত তার একটি প্রধান কারণ, শিক্ষার ফললাভ বিলম্বিত, অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত। একটি সাধারণ হিসাব থেকে বলা যায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা এই তিন স্তরের শিক্ষার ফললাভের জন্য প্রতি ধাপেই অন্তত ছয় বছর করে সময় লাগে। অর্থাৎ সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার ফলাফল যাচাই করতে অন্তত আঠার বছর সময় প্রয়োজন। কোন গণতান্ত্রিক সরকার এত দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকবে এটা মনে করা হয়না, ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের যে ফললাভ তা কিছুটা হিসাব কষে, কিছুটা অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে ও কিছুটা প্রজ্ঞা নির্ভর ধারণা

www.pathagar.com

থেকে লাভ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে থাকতে হবে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বর্তমান প্রজন্মের ত্যাগ স্বীকার ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি।

স্বাভাবিক দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষার তুলনায় প্রশিক্ষণের ফললাভ অপেক্ষাকৃত দ্রুত ঘটে। এ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে মূল শিক্ষার ধারা থেকে শিক্ষার্থীদের বেছে নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিষয় বা কর্মকৌশল শিখানো যেতে পারে। অথবা শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এমন কর্মরত ব্যক্তিদের এনে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রযুক্তিগত নতুন কিছু কৌশল শিখানো যেতে পারে। কিন্তু মূল শিক্ষা ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদী যে প্রভাব, গুণগত ও পরিমাণগত, তার বিকল্পরূপে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ শুধু সীমিতভাবেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কোন স্তরে, জ্ঞানের কোন শাখায় ও কত দীর্ঘমেয়াদী হবে তা পরিমাণগত ও গুণগতভাবে নির্ধারণ করতে হবে গতিশীল পরিকল্পনায়, এবং এ কাজটি স্বভাবতই দুরূহ।

শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত পরস্পরের অপেক্ষক রূপে। শিক্ষার প্রসার কতটা বাস্তবভাবে ঘটতে পারে তা নির্ভর করে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সম্ভাবনার উপরে। কারণ, একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ স্বভাবতই তার শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চাকরী পেতে চায়। সামাজিকভাবেও ব্যয়বহুল শিক্ষা যদি শিক্ষাপ্রাপ্তের অবদানের ভিতর দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজে না লাগে, তা হলে শিক্ষাখাতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।

শিক্ষা ব্যবস্থা অবশ্য নিজেই এক বিশাল ক্ষেত্র কর্মসংস্থানের। কারণ, শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত শিক্ষক, গবেষক ও প্রশাসক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোরই ফসল। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা গভীরভাবে সম্পর্কিত বলে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে পৃথকভাবে ভাবা ও পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়।

দেশের সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে শিক্ষা পরিকল্পনাকে সমন্বিত করেই মাত্র আমরা একদিকে বেকার সমস্যা দূর করতে পারি, অন্যদিকে প্রয়োজনীয় শিক্ষিত ও দক্ষ ও যথাযোগ্য কর্মী ও বিশেষজ্ঞ লাভের নিশ্চয়তা পেতে পারি। শিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক স্তরে এবং সেই কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত জনশক্তির সবচেয়ে বড় চাহিদা হচ্ছে, বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা প্রদানের জন্য বিপুল সংখ্যক শিক্ষক।

শিক্ষার পরিকল্পনায় সামাজিক নানাদিক অবশ্যই বিবেচিত হতে হবে উন্নয়নের অনুষঙ্গরূপে। এক্ষেত্রে যে প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তা হল ঃ শিক্ষা কি পরিমাণে স্বয়ংসম্পন্ন, অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব গঠনে ও ব্যক্তি মানুষের প্রতিভা বিকাশে শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু এবং সামাজিক মানুষ হিসাবে মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির বাহকরূপে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলায় শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু তা বিবেচিত হতে হবে। শিক্ষাকে যদি জাতি গঠনের হাতিয়াররূপে আমরা দেখি, তা হলে তা কতটা ব্যবহৃত হবে মানুষের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিতে এবং কতটা তাকে নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার কাজে? শিক্ষার যে বিভিন্ন দিক তা সমাজের স্তর বিন্যাসে কতটা অবদান রাখে এবং কতটা সচলতা আনে সমাজে? অভিজাত সৃষ্টিতে ও উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে শিক্ষার অবদান কতটা?

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা বা অনুকরণ প্রবণতা সৃষ্টিতে শিক্ষার প্রভাব কতটা? উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব কতটা জাতীয় উন্নয়নে ও মূল্যবোধ সৃষ্টিতে? শিক্ষা ব্যবস্থাই বা কিভাবে প্রভাবিত সামাজিক জীবন ধারা ও ব্যক্তি মানুষের অবদান দ্বারা? এসব প্রশ্নের জবাব অনুসন্ধান এবং শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজের মধ্যে যে মিথস্ক্রিয়া তার বিশ্লেষণ হচ্ছে শিক্ষার সমাজ বিজ্ঞান বা Sociology of education। শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক উদঘাটনে শিক্ষার এই সমাজ বৈজ্ঞানিক দিক অবহেলা করা যাবে না। শিক্ষার প্রভাব গভীর ও সর্বব্যাপী। ফলে, সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিগূঢ়ভাবে সম্পর্কিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে। শিক্ষা ব্যক্তি মানুষের প্রজ্ঞা, দৃষ্টিভঙ্গি, চেতনা ও স্বকীয়তা সৃষ্টি করে। আবার বিভিন্ন ব্যক্তির অবদান ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক জীবন ধারাকে সৃষ্টি করে। সামাজিক মূল্যবোধ ও চেতনা তাই ব্যক্তি মানুষের মূল্যবোধ ও উদ্ভাবনের সমন্বিত রূপ। সমন্বিত বলতে এখানে সমষ্টিকৃত ফলকে বুঝায় না। শিক্ষা সক্রিয়ভাবে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে যে দুর্লভ উপলব্ধি, রুচি ও প্রেরণা সৃষ্টি করে তা পারস্পরিকতায় ও জটিল মিথস্ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে একটি প্রভাব বলয় সৃষ্টি করে, যা যান্ত্রিক নয়, সজীবতায় উদ্ভাসিত। ফলে, শিক্ষা কতটা ব্যক্তিগত প্রতিভা বিকাশের জন্য নিয়োজিত হবে এবং কতটা সমাজ পরিবর্তনের জন্য বা সামাজিকতা সৃষ্টির জন্য কাজ করবে? এই প্রশ্ন ব্যাপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়ে এর তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলে।

শিক্ষা সমাজকে কিভাবে ও কতটা পুনর্গঠিত করে এ প্রশ্নের অভিজ্ঞতালব্ধ জবাব হল— উন্নত দেশগুলোতে শিক্ষা সমাজ কাঠামোকে সংরক্ষণ করে যতটা বা এর স্তর বিন্যাসকে প্রতিফলিত করে, সে অনুপাতে একে বদলাতে পারে না। সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টিতে বা সমাজ রূপান্তরে শিক্ষার প্রভাব উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বরং বেশি। এখানে শিক্ষার ভিতর দিয়ে, কমসংখ্যক হলেও, কেউ কেউ সমাজের নিম্নতম স্তর থেকে উর্ধ্বতম স্তরে উঠে যেতে পারে। এই উত্থান যেখানে জ্ঞান, বুদ্ধি ও যোগ্যতার প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে ঘটে, সেখানে নীরব এক বিপ্লব সাধিত হয়। সাফল্যের পথ বেয়ে শিক্ষার্থীর এই অগ্রযাত্রা, তার পথের দু'পাশকে উদ্ভাসিত করে পশ্চাদপদ ও বঞ্চিতকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে এবং অশিক্ষা, কুসংস্কার, পেশীবল ও অযোগ্যের প্রতাপকে পরাভূত করে। শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের এই পথ দুর্গম ও দীর্ঘ হলেও নিশ্চিত ও আলোকিত।

আমাদের দেশে শিক্ষাকে প্রধানত দেখা হয়েছে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের অবলম্বনরূপে, দেশের অর্থনীতির উন্নয়ন বা সামাজিক অগ্রগতির জন্য নয়। কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ভিতর দিয়ে জীবিকার উন্নয়নের জন্য যে শিক্ষা, তা শেষ পর্যন্ত জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতিকেও সাহায্য করে। দরিদ্র দেশগুলোকে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে হলে শিক্ষাকে অবশ্যই উৎপাদনশীলতার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। যাঁরা উৎপাদন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষাকে জড়াতে পছন্দ করেন না এবং একে যান্ত্রিকতা বা বস্তুবাদ বলে গণ্য করেন, তাদের মনে রাখতে হবে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এবং উৎবৃত্ত অর্থই শুধু অবকাশ কিনে দিতে পারে একদল জ্ঞান সাধকের জন্য এবং সেখানেই মাত্র জ্ঞান চর্চা দার্শনিকতা ও বিমূর্ত ভাবনার জন্ম হতে

www.pathagar.com

পারে। দ্বিতীয়ত উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি— নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা, উদ্ভাবন ও আবিষ্কার ছাড়া সম্ভব নয়। ফলে, এই শিক্ষা বস্তুবাদী মনোভাব বা যান্ত্রিকতার পরিবর্তে সৃজনশীলতা ও বুদ্ধি নির্ভর শ্রমকে প্রশ্রয় দেয়।

একথা সত্য যে, সমাজবদ্ধ জীবনের জন্য নাগরিক মূল্যবোধ, মানবিক সংস্কৃতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, আইন শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ শিক্ষার ভিতর দিয়েই সৃষ্টি হয় এবং এই শিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক শিক্ষা নয়। কিন্তু এসব শিক্ষাও সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিপূরক এবং এর জন্যে অর্থ ব্যয় করতে হয় বলে একে উৎপাদনশীল শিক্ষার অংশ রূপেই দেখতে পারি। নাগরিকত্বের জন্য শিক্ষা এবং নির্দিষ্ট পেশার জন্য শিক্ষার মধ্যে কোনটি বেশি গুরুত্ব পাবে, তা নির্ভর করে দেশের উন্নয়ন স্তরের উপরে। যথাযোগ্য নাগরিক তৈরির যে শিক্ষা তার গুরুত্ব অবশ্যই আছে, কিন্তু আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় দক্ষ, পেশাদার ও শিক্ষা প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞের বিকল্প কিছু নেই।

কোন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কি স্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে, পেশাদার কর্মী ও বিশেষজ্ঞরা কি স্তরে বিন্যস্ত এবং এদের প্রস্তুত করার জন্য শিক্ষার স্তর বিন্যাস কিভাবে ঘটছে, তা সমাজের গতিশীলতা ও রূপান্তর নির্ধারণ করে। শিক্ষা কাঠামো ও শিক্ষার স্তর বিন্যাসের যে পিরামিড তা পরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় অনেকটা স্বাধীনভাবে। কিন্তু এই কাঠামো এবং এর দ্বারা তৈরি জনশক্তি কতটা দক্ষতা লাভ করবে এবং সফল হবে, তা নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো তার উপরে। অবশ্য এই আপাত শিক্ষা বহির্ভূত অবকাঠামো শিক্ষা ব্যবস্থারই পরোক্ষ ফসল।

শেষ বিশ্লেষণে তাই দেখা যায়, উন্নয়ন ও সমাজ পরিবর্তনের যেটুকু স্বাধীনতা তা নিহিত শিক্ষার পরিকল্পনায়। শিক্ষার বিষয় নির্বাচনে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক স্বাধীনতা পেতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক, ফলে দক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থা ও আদর্শ শিক্ষা কাঠামো বা পিরামিড সৃষ্টি সম্ভব হয়ে উঠে না। দেশের বাস্তব চাহিদার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পছন্দ ও প্রবণতা সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠে না। এর পিছনে কাজ করে অনেকগুলো কারণ। শিক্ষার্থী যখন ভর্তি হয়, তখন একটি চাহিদা থাকে কোন বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা বিশেষজ্ঞের জন্য। দীর্ঘ শিক্ষাজীবন শেষ করার পর সে যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যায়, ততদিনে চাকুরীর বাজার ও বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষাপ্রাপ্তদের চাহিদার যে কাঠামো তা বদলে যায়। উচ্চশিক্ষা দীর্ঘমেয়াদী হবার কারণে, শিক্ষার্থী ভর্তি হবার সময় যে চাহিদা দেখতে পায় এবং কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সময় যে চাহিদা দেখতে পায়, এ দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান তা সাধারণ শিক্ষার তুলনায় উচ্চশিক্ষার ও নির্বাচিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেশি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতির ফলে শিক্ষার্থী ও চাকুরীপ্রার্থীর উপলব্ধ বিষয়ভিত্তি চাহিদার মধ্যে যে দশা পার্থক্য তা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরও একটি অসামঞ্জস্য শিক্ষার বিষয়গত কাঠামো পরিকল্পনার সৃষ্টি হয় মেধা পাচারের কারণে। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কতটা তুলনামূলক গুরুত্ব ভাবে তার ভিত্তিতে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে গেলেও দেখা যাবে, অনেক বিশেষজ্ঞই শিক্ষা লাভের

www.pathagar.com

পর বাইরে চলে যাচ্ছে নানা প্রলোভনে। বস্তুত পরিকল্পনার সময় শিক্ষাবিদ ও পরিকল্পনাবিদ বড়জোর যেখানে দেখতে পান শুধু নিজের দেশ বা অব্যবহিত পরিবেশ, শিক্ষাপ্রাপ্তরা দেখতে পান সমগ্র বিশ্ব। এসব ছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতা, প্রযুক্তির পরিবর্তনশীলতা, জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিনব ও অভাবিত নানা অগ্রগতি, বিষয় নির্বাচনে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ইত্যাদি শিক্ষা কাঠামোকে উন্নয়ন কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার কাজকে জটিল ও অনিশ্চিত করে ফেলে।

সামাজিক পরিবেশ শিক্ষা কাঠামো ও শিক্ষার সামগ্রিক আয়োজনকে কতটা প্রভাবিত করে এবং শিক্ষা কাঠামো সমাজের উপরে কতটা প্রভাব রাখতে ও উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে, তা নির্ভর করে সমাজ ব্যবস্থা ও শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ও পারস্পরিক যোগাযোগ কতটা স্বাধীনভাবে ঘটতে পারছে তার উপরে। একই রকম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকেও এবং উন্নয়নের একই রকম স্তরে অবস্থান করেও বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে শিক্ষা উন্নয়নে সমান অবদান রাখতে সক্ষম নাও হতে পারে, শুধু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ত্রুটির জন্য। শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের পারস্পরিক সম্পর্ককে তখনই শুধু পরম দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগানো সম্ভব, যখন স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতা নিয়ে কাজ করতে পারেন শিক্ষাবিদ ও গবেষকগণ, যেখানে উদ্ভাবন শক্তি ও প্রতিভা মূল্যপ্রাপ্ত প্রশাসন ব্যবস্থা ও উন্নয়ন পরিকল্পনায়। শিক্ষা ব্যবস্থায় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব কতটা কাজ করবে ও উন্নয়ন লক্ষ্য কতটা কাজ করবে এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানতত্ত্বের ভূমিকা কি হবে—এ সবই নির্ভর করে দেশ ও সমাজের সামগ্রিক অবস্থার উপরে। যে উপাদানগুলো দিয়ে সমাজের সামগ্রিক অবস্থা সংজ্ঞায়িত, যেমন জনগণ, উৎপাদন ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রশাসন কাঠামো, বিচার ব্যবস্থা, সামাজিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও সংস্কার, সংস্কৃতি ও শিক্ষা—তার মধ্যে শিক্ষা হচ্ছে সবচেয়ে সক্রিয় উপাদান, অন্য সবই অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয়। এর কারণ, শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন জ্ঞান ও উপলব্ধি আসতে পারে উন্মুক্তভাবে। স্থান ও কালের সীমাহীন বিস্তার একে প্রভাবিত করতে পারছে এবং শিক্ষা পরিবর্তনশীল রূপে সমাজকে বদলে দিতে সক্ষম। কিন্তু সমাজের অন্য সব কিছুই এদের অবস্থান সংহত করতে চায় রক্ষণশীলতার ভিতর দিয়ে।

একজন প্রশাসক বা বিচারক নিয়ম লঙ্ঘন করলে বা নিয়মের ধারাবাহিকতা লঙ্ঘন করলে সমাজের ঐতিহ্য ও শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গেল বলে উৎকণ্ঠিত হবে সবাই। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন ফলাফল না পেলে, পরিবর্তন না এলেই শঙ্কিত হবার কথা। পরিবর্তন ও গতিশীলতা যেখানে শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে আধুনিক জীবন ধারায়, জড়তা ও স্থিতিশীলতাই সেখানে সামাজিক ঐতিহ্য ও পরিচয়কে রক্ষা করে সমাজের অন্যসব উপাদানের ভিতর দিয়ে। সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার তাই একটি জড়তা আছে। এই জড়তা সংরক্ষণের প্রবণতা থেকে আসে। শিক্ষা ব্যবস্থারও জড়তা আছে, যেখানে পুরানো জ্ঞান ও প্রচলিত কলা-কৌশলকে ধরে রাখার প্রবণতা কাজ করে। কিন্তু নতুন জ্ঞানের সংযোজন ও নতুন উদ্ভাবন সক্রিয় শক্তি রূপে যে পরিবর্তন আনে সেটাই উন্নয়ন।

www.pathagar.com

শিক্ষার দু'টো রূপকে আমরা তাই পৃথক করতে পারি। একটি সমাজের জীবনধারাকে সংরক্ষণের জন্য, অন্যটি সমাজে গতি সৃষ্টি বা পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধনের জন্য। এই উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে কাজে লাগাবার যে পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণ তা বিশ্লেষণ করতে হলে কয়েকটি প্রশ্নের মুখোমুখী আমাদের হতে হবে। শিক্ষাকে যেখানে আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সক্রিয় শক্তিরূপে বিবেচনা করি, সেখানে শিক্ষা খাতে কতটা বিনিয়োগ করা প্রয়োজন? শিক্ষাকে কিভাবে সম্পর্কিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে? শিক্ষার বিভিন্ন ধাপ ও শাখার মধ্যে কি ধরনের মিশ্রণ ও আপেক্ষিক গুরুত্বের বন্টন শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেশি দক্ষতা দেবে? জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে কিভাবে সবচেয়ে কার্যকর করা যায়? শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের দক্ষতা কিভাবে পরিমাপ করা হবে? শিক্ষার জন্য অর্থায়ন কিভাবে করা হবে? এসব প্রশ্নের জবাব অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ বা পরিকল্পনাবিদ এককভাবে দিতে পারবেন না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ করলে শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু সিদ্ধান্ত নির্ধারিত হবে জনমতের ভিত্তিতে অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে। আবার বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তরভেদে সমস্যার সমাধানও বিভিন্ন হবে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সবচেয়ে বড় প্রশ্ন শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ কত হবে? অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রথমেই বিচার করতে হয় শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ফললাভ কি? এই ফললাভ আমরা কিভাবে পরিমাপ করতে পারি?

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের বড় কথা হল, কোন প্রকল্পের অর্থনৈতিক সাফল্য যাচাই করতে হলে বিকল্প কোন প্রকল্পের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে হবে, কোন কাজে ফললাভ বেশি। কিন্তু যে অর্থে এবং যে পরিমাণে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই এবং শিক্ষা যে কোন উন্নয়ন প্রকল্পের অবিচ্ছেদ্য অংশ, শিক্ষাকে অন্যসব অর্থনৈতিক প্রকল্পের বা কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। শিক্ষা প্রদান কতটা ফললাভ দিল তা যাচাই করা খুব অর্থবহ নয়। কিন্তু এর পরেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শিক্ষার প্রভাব পরিমাপ করেছেন অনেক অর্থনীতিবিদ।

কোন কোন দেশের, বিশেষ করে শিল্পক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিশ্লেষণ করে, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন গবেষকগণ। গত পঞ্চাশ বা একশ বছরের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন হিসাব করে দেখা গেছে, মূলধন, শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদের বিনিয়োগ শিল্পোন্নত দেশগুলোর দ্রুত অগ্রগতির ব্যাখ্যা দিতে পারে না। দেখা যায় এই উন্নয়নের সিংহভাগ এসেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং মানব শক্তির উন্নয়নের ভিতর দিয়ে, যেখানে শিক্ষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রফেসর সলোর হিসাব অনুসারে, এসব দেশের প্রবৃদ্ধির শতকরা দশভাগ এসেছে শ্রম ও ভৌত সম্পদের বর্ধিত ব্যবহারে, বাকী নব্বই ভাগ এসেছে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারে।

ডক্টর ম্যাসেল শুধু শিল্প কারখানার উৎপাদনের হিসাব থেকে এবং প্রফেসর আবারুশ্‌ট নরওয়ের উন্নয়ন বিশ্লেষণ করে, একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। যুক্তরাজ্যের শিল্পোৎপাদনকে বিশ্লেষণ করে প্রফেসর বেড়াওয়ে এবং স্মিথ দেখেছেন, মাথাপিছু উৎপাদন ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪ সালে যা ঘটেছে তার এক চতুর্থাংশ এসেছে মূলধন ও

www.pathagar.com

শ্রমের বিনিয়োগ থেকে, বাকী তিন-চতুর্থাংশ স্বভাবতই এসেছে নতুন প্রযুক্তি থেকে। অবশ্য এ সমস্ত ব্যাখ্যাই কব-ডগলাসের তাত্ত্বিক মডেলকে ব্যবহার করে উপস্থাপিত হয়েছে। কব ডগলাসের মডেল সম্পর্কে আপত্তি হল, জাতীয় প্রবৃদ্ধি হিসাবের ক্ষেত্রে এখানে উৎপাদন অপেক্ষক বা Production function কে সবক্ষেত্রে সুষম ধরা হয়। বাস্তবে উৎপাদন অপেক্ষকের এই সুষমতা বজায় রাখা যাবে না এবং মূলধনের ফল লাভের হিসাব এর গড় উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে করার চাইতে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা হিসাবে করা বেশি সঙ্গত মনে হয়। কিন্তু এই সমালোচনা উৎপাদনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক সম্পর্কে পাওয়া মূল সিদ্ধান্তকে বদলে দেয় না।

অর্থনৈতিক বিকাশে প্রযুক্তির অবদানের কথা সনাতনী অর্থনীতিবিদ আদাম স্মিথ অনেক আগেই উপলব্ধি করেছিলেন। যেমন, আদাম স্মিথ তাঁর স্থায়ী মূলধনের ধারণা দিতে গিয়ে সমাজের জনগণের অর্জিত দক্ষতা ও প্রয়োজনীয় কর্মক্ষমতাকে এর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মার্শাল জাতীয় বিনিয়োগের ক্ষেত্র হিসাবে শিক্ষার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং বলেছিলেন, মানুষের উপরে যে ব্যয়টা করা হয় সেটাই সবচেয়ে মূল্যবান অংশ মূলধনের।

শিক্ষার অর্থনৈতিক অবদান ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্নভাবে যেসব মতবাদ প্রকাশ করেছেন তা কখনো কখনো বিতর্কের সৃষ্টিও করেছে। একথা সত্য যে, শিক্ষা বিচিত্র সব লক্ষ্যে কাজ করে। শুধু অর্থনৈতিক ফললাভ ও সমাজের সম্পদ ও সেবাকর্মের হিসাব থেকে শিক্ষার গুরুত্ব যাচাই করা সঠিক নয়। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাপকাঠি হিসাবে একমাত্র ব্যক্তিগত বা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতেক বিবেচনায় আসা সঙ্গত নয়।

কিন্তু যাঁরা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হিসাবে জীবনবোধ, নাগরিকত্ব, স্বাধীনতা, আত্মমর্যাদাবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে শুধু গুরুত্ব দিতে চান এবং শিক্ষার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক টানাকে অমানবিক ও বস্তুবাদী মনোভাব হিসাবে গণ্য করেন, তাঁরা যতই উচ্চকণ্ঠ হোন, তাঁদের সমস্ত শুভ ইচ্ছা অবাস্তব স্বপ্ন রয়ে যাবে। আধুনিক মানুষ ও আধুনিক সমাজ সৃষ্টির প্রত্যাশা সেখানে ব্যহত হতে বাধ্য। আসলে মানবিক গুণগুলোর বিকাশ সাধনের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বস্তুগত উন্নয়নের যে কোন বিরোধ নেই, তা বিশেষভাবে উপলব্দ হতে পারে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযক্তিকে যদি আমরা অবধারণ করি।

প্রকৃতির নিয়মগুলোকে গভীরতর ও শুদ্ধতররূপে জানার জন্যে বিজ্ঞানের যে সব আবিষ্কারহ —সূক্ষ্ম ও জটিল, বিশ্বজগৎকে অবধারণ করতে গাণিতিক ভাবনা ও সৃজনশীলতার যে পরাকাষ্ঠা, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ ও জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নানা সামগ্রীর উৎপাদনে প্রযুক্তির যেসব বিস্ময়কর উদ্ভাবন—তা মানুষকে অনেক বেশি অনন্যতা দিয়েছে। প্রাণী জগতের প্রজাতির তুলনায় মানুষ যে ভিন্ন ও অনন্য, সভ্যতার পথ বেয়ে সে যে এত দূর অগ্রসর হয়েছে যে, তাকে আর চেনা যায় না প্রাণী জগতের অংশ রূপে— তা মানুষকে গভীরতর অর্থে মানবিক করেছে।

পৃথিবীর অভিকর্ষকে অস্বীকার করে নয়, তাকে জয় করেই মাত্র মানুষ মহাকাশে পাড়ি জমিয়েছে অন্য গ্রহে। ঠিক তেমনি জীবনের বস্তুগত প্রয়োজন মিটিয়ে ও

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক দৈন্য অতিক্রম করেই মাত্র সৃজনশীলতা, বিশুদ্ধ ভাবনা ও মানবিক মর্যাদাবোধকে আয়ত্ব করতে পারে। শিক্ষায় বিনিয়োগ উৎপাদনশীল হতে হবে এই দৃষ্টিভঙ্গি যদি কেউ বর্জন করতে চায়, তা হলে একই সঙ্গে অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রত্যাশাও বর্জন করতে হবে। কারণ, সব সমাজেই দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য জ্ঞানী, দক্ষ ও অনুপ্রাণীত মানুষ চাই, যা শিক্ষার ভিতর দিয়ে অর্জিত হতে পারে। সমগ্র সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের লক্ষ্য ও ব্যক্তি মানুষের মানবিক গুণগুলোর স্ফুরণের লক্ষ্য পরস্পর বিরোধী নয়। বরং মানুষের নিজস্ব রুচি, প্রতিভা ও মানবীয় আদর্শের লালন ও উন্মেষ যেখানে শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য বলে বিবেচিত, সেখানেও অর্থনৈতিক উন্নয়নই সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করে। শিক্ষার অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও অবদান বিশ্লেষণ ও অবধারণ করতে হলে, জ্ঞানের নানা পরিমণ্ডল ও শিক্ষা দর্শনের বিভিন্ন দিক এদের পারস্পরিক পরিপূরকতায় ও একটি সামগ্রিক উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার আলোকেই ঘটতে হবে।

সাধারণ শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার মধ্যে কোন স্পষ্ট দেয়াল নেই, যা প্রায়শ ধারণা করা হয়ে থাকে। প্রথমটির লক্ষ্য মনন ও বুদ্ধির চর্চা দিয়ে আমাদের রুচি আকাঙ্ক্ষা ও মানসিক শৃঙ্খলা সৃষ্টি, যাতে সমাজ ও বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠে। এবং দ্বিতীয়টির লক্ষ্য বস্তুগত জগৎ ও ভৌত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা ও বদলে দেয়া, যাতে আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গে তা সঙ্গতি লাভ করে।

শিক্ষাখাতের ব্যয় বরাদ্দকে সাধারণভাবে সমাজ কল্যাণমূলক অন্যান্য কাজের জন্য বরাদ্দকৃত ব্যয়ের সঙ্গে এক করে দেখা হয়। অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় কোন দুর্যেগে বা দুঃসময়ে যখন সেবামূলক খাতে ব্যয় সঙ্কোচন ঘটে, শিক্ষাও সেখানে এই কৃচ্ছ্রসাধনের শিকার হয়। কিন্তু আধুনিক যে উন্নয়ন আয়োজন, যাকে সংক্ষেপে শিল্পায়ন বলা হয়ে থাকে, সেখানে শিক্ষা একাধারে উন্নয়নের সূচক, চালিকাশক্তি, এর স্তর নির্ধারক এবং নিজস্ব চাহিদা সৃষ্টিকারী।

শিল্পায়ন শুধু গবেষক, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, উদ্ভাবক ও কৃৎশৌলীর চাহিদা সৃষ্টি করে না। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সমগ্র যন্ত্রকে সচল রাখতে প্রয়োজন, অর্থনীতিবিদ, প্রশাসক, পরিকল্পনা বিদ, হিসাব রক্ষক, তথ্য পরিবেশক, আইনজ্ঞ, বিচারক, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিক, চিকিৎসক, নার্স ও কেরানী থেকে নানা ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও দক্ষ কর্মী। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সামগ্রিক আয়োজনে শিক্ষার এই ব্যাপক ও গভীর গুরুত্ব অবধারণই যথেষ্ট নয়, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা, শিক্ষার স্তর বিন্যাস, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুলনামূলক গুরুত্ব নির্ধারণ, উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে শিক্ষা পরিকল্পনাকে সমন্বিত করা, শিক্ষা খাতে অর্থায়ন, ব্যয় নির্ধারণ, শিক্ষার ফললাভ যাচাই ইত্যাদি বিচিত্র দিক বিশ্লেষণ ও বিবেচনায় আসতে হবে। এ কাজ অপরিসীম দায়িত্বের ও চ্যালেঞ্জের।

অন্যসব আয়োজক ও পরিকল্পনাবিদের হাতে যথেষ্ট সময় থাকে এবং নির্লিপ্তভাবে স্থায়ী অবস্থানে থেকে কাজ করার স্বাধীনতা। কিন্তু শিক্ষার আয়োজন হতে হয় তাৎক্ষণিক। প্রতি মুহূর্তে সমগ্র বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে জ্ঞানের সাধনায়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, তাদের বিপুল সংখ্যক অপেক্ষা করে আছে শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশের জন্য। নানা কর্মক্ষেত্রে দক্ষ বিশেষজ্ঞের ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর চাহিদা রয়েছে, যার অনেকটাই

www.pathagar.com

অনুপলব্ধ ও প্রচ্ছন্ন। বিস্ফোরণ ঘটছে জ্ঞানের—নতুন সব নির্মাণ বস্তু, শক্তির নতুন উৎস, প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উৎপাদন ও সম্ভাবনার, সেই সঙ্গে মানুষের প্রত্যাশার। জ্ঞানের সংগ্রহণ, সংরক্ষণ, সঞ্চারণ ও সৃষ্ট নতুন জ্ঞানের গতিশীলতা ও প্রবহমনতার সঙ্গে তাল রেখে প্রতিটি দেশকেই চলার পথ নির্ধারণ করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অগ্রাধিকার নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, অর্থায়ন ও মূল্যায়নের বাস্তব যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার পরিচালনায়, তা যতই জটিল হোক, অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং জ্ঞানতত্ত্ব ও শিক্ষা দর্শনের আলোকে তা ঘটতে হবে। এখানে অনিশ্চয়তা আছে এবং ভুল ভ্রান্তির সম্ভাবনা। ভুল করার এ সম্ভাবনাকেও স্বীকার করে নিতে হবে বাস্তবতার খাতিরে। শুধু গভীরতর দায়িত্ববোধ ও সমস্ত সিদ্ধান্তের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা, এক্ষেত্রে সুবিচারকরতে পারে শিক্ষার মতন জটিল বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণে।

যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মূলে কাজ করে বিকল্প পথ থেকে সঠিক পথকে নির্বাচন করা। শিক্ষার যেহেতু কোন বিকল্প নেই, প্রত্যেক জাতির জন্যেই একটি শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতে হবে। বস্তুত কোন এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকতেই হবে একটি জাতিকে সংজ্ঞায়িত করতে হলে। সেই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক হতে পারে অথবা অপ্রাতিষ্ঠানিক। শিক্ষাদান প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ হতে পারে। কিন্তু কোন এক ধরনের তথ্যের বিনিময়, জ্ঞানের সম্মিলিত ব্যবহার বা কৌশলের যৌথ প্রয়োগ ছাড়া একটি সমাজ পারস্পরিক বন্ধনে স্থিতি লাভ করতে পারে না।

যখন বিভিন্ন সমাজ বা জাতি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, যোগাযোগ হীনতার কারণে, তখন সীমিত ও প্রায় অপরিবর্তী জ্ঞান দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত হয়েছে এবং আদান-প্রদান ঘটেছে শুধু সেই জাতির মধ্যেই। এখন যোগাযোগ পদ্ধতির অগ্রগতি ও জ্ঞানের দ্রুত বিকাশমানবতার কারণে, কোন জাতি শুধু এর নিজের মধ্যেই জ্ঞানের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারে না, বরং একটি গতিশীল ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিনিময় ঘটছে জ্ঞানের।

পুরানো ও ব্যবহৃত জ্ঞানের তুলনায় নতুন জ্ঞানের প্রভাব কোন ব্যক্তি বা জাতির উপরে অনেক বেশি। ফলে, পদার্থ ও শক্তির আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে যেমন একটি সংরক্ষণ বা নিত্যতার নীতি কাজ করে, অর্থাৎ মোট পদার্থ বা মোট শক্তি অপরিবর্তিত থাকে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেনা। মানুষের সক্রিয় মন নতুন জ্ঞান বা তথ্যের আলোকে জ্ঞানের যে সংবর্ধন ঘটায়, সেটাই জ্ঞানের দ্রুত বিকাশ লাভের উৎস। কতটা দক্ষতার সঙ্গে জ্ঞানের এই আদান-প্রদান ঘটবে এবং তা নতুন জ্ঞানে সৃষ্টিতে সহায়ক হবে, সেটাই নির্ধারণ করে শিক্ষা পদ্ধতির দক্ষতা।

প্রত্যেকটি জাতিরই নিজস্ব একটি শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। ফলে, শিক্ষার গুরুত্ব ও এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শুধু উচ্চকণ্ঠ হবার মধ্যে বিশেষ কোন কৃতিত্ব বা অভিনবত্ব নেই। শিক্ষা ব্যয়বহুল। এর অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা জটিল। শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন, শিক্ষা প্রদানের দক্ষতা নির্ধারণ ও মূল্যায়ন সমস্যাজড়িত। ফলে, শিক্ষা সম্পর্কিত সমস্ত আলোচনাই শেষ পর্যন্ত সমস্যা সমাধানের তৎপরতা, শ্রম ও বুদ্ধি দাবি

www.pathagar.com

করে। অর্থাৎ শিক্ষা কেন? এ প্রশ্নের উত্থাপন ও এর জবাব সন্ধান শুধু নয়, শিক্ষা কতটা, কেমন করে, এবং কোন ধরনের হতে হবে? সেটাই বিবেচিত হবার।

শিক্ষা পরিকল্পনায় একটি বড় সিদ্ধান্ত হল, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ। এমন কোন সভ্য সমাজ নেই যেখানে শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের অন্তত এক শতাংশ ব্যয় করা হয় না এবং কোন কোন দেশের জন্য এটা ছয় শতাংশের মতন। বাংলাদেশের হিসাব অনুসারে এখানে জাতীয় আয়ের দুই শতাংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হয়। সরকারী ব্যয়ের এটা দশ শতাংশের একটু বেশি এবং উন্নয়ন খাতের তিন শতাংশের মতন। এ ধরনের হিসাব অবশ্য খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার পরিমাপরূপে এটি অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য। প্রথমত যে দেশ অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগতভাবে যত পশ্চাদপদ সেখানে শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করার জন্য বেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন। শুধু জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে নয়, মোট অর্থের হিসাবেও। কিন্তু দরিদ্র দেশগুলোর সঙ্গতির অভাবে তা সম্ভব হয়ে উঠে না। অন্যদিকে দক্ষতার সাথে কতটা অর্থ একটি দেশ শিক্ষাখাতে ব্যবহার করতে পারবে তা সে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের স্তর দ্বারা নির্ধারিত।

শিক্ষারও যেন একটি শরীর আছে, নানা প্রত্যঙ্গ নিয়ে একটি জৈব ব্যবস্থারূপে যা গঠিত। যত সুস্থ, সবল ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এর অঙ্গগুলো সমন্বিত ও সক্রিয়, তত বেশি হারে তা নতুন জ্ঞানকে আত্মস্থ ও অঙ্গীভূত করে নিতে পারে। রুগ্ন ও দীর্ঘদিন ঘরে অভুক্ত মানুষ যেমন প্রয়োজনীয় খাবার গ্রহণ করতে ও হজম করতে ব্যর্থ, যদিও তারই বেশি প্রয়োজন পুষ্টি লাভের, অনুন্নত দেশগুলোর তেমনি পশ্চাদপদ থেকে যাচ্ছে পশ্চাদপদতার কারণেই। গভীর যত্ন ও ধৈর্য নিয়ে সীমিত সম্পদের বিনিয়োগের বেলায় অগ্রাধিকার যাচাই করে অনুন্নয়নের দুষ্টচক্র ভেঙ্গে উন্নয়নের স্তরে উত্তরণের বন্ধুর যে পথ, তা অতিক্রম করতে হবে আমাদের। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই বিকল্প কিছু পথ আছে উন্নয়নের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণের। যেমন, উৎপাদনশীল দক্ষ কর্মী সৃষ্টিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পথ ধরে আমাদের এগুতে হবে? অথবা বিশেষ উৎপাদনমূলক কৌশল শেখাবার জন্য কোন পেশায় নিয়োজিত অবস্থার প্রশিক্ষণ বেশি লাভজনক হবে?

তাৎক্ষণিকভাবে ফল লাভের জন্য প্রশিক্ষণ, শিক্ষার চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়। কিন্তু একটু দূরদৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, যাঁরা সরাসরি পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তাঁদের তুলনায় যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করে এসেছে তাঁদের দক্ষতা অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পায়, পেশামূলক প্রশিক্ষণ পাবার সময়। এছাড়া প্রাতিষ্ঠানিক সাধারণ শিক্ষার আলোকে প্রস্তুত হয়ে না আসলে, প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে, সংকীর্ণ পরিসরে শুধু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী, ব্যর্থ হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও যাচাই করার এবং বিকল্প কাঠামোর ভিতর থেকে নির্বাচন করার ব্যাপার রয়েছে। যেমন, শিক্ষার বিষয় বস্তু নির্বাচন, শিক্ষা দানের পদ্ধতি নির্ধারণ। কোন স্তরে কত সংখ্যক ছাত্র থাকবে? প্রযুক্তিগত শিক্ষায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষায় কিভাবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বন্টিত হবে? এসব প্রশ্নের মীমাংসা হতে হবে প্রতিটি দেশের প্রয়োজনবোধ ও সামর্থ্যের কথা মনে রেখে। কিন্তু তাই বলে

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীদের প্রবণতা ও স্বাধীনতা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নকে অগ্রাহ্য করার অবকাশ নেই সংকীর্ণ বাস্তব বুদ্ধির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিল্পের সঙ্গে তুলনা করা হলে, অনেকেই সেটাকে অতি বস্তুবাদিতা বলতে পারেন। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা যাচাইয়ে এ ধরনের তুলনা কাঠামোর অনেকগুলো সুবিধা আছে। শিক্ষা ব্যবস্থার একটি আয়োজন আছে, লক্ষ্য আছে, ভৌত কাঠামো আছে, আর্থিক বিনিয়োগ আছে, শ্রম ও মেধার প্রয়োগ আছে—এবং উৎপাদিত সম্পদ। শিক্ষায় যে জোগান দেয়া হয় ও যে উৎপাদন আমরা পাই, তার ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতা যাচাই করা যেতে পারে। টাকার মানে জোগানের মূল্য ও উৎপাদের মূল্য নির্ধারণ অবশ্য দুঃসাধ্য কাজ, কিন্তু অসম্ভব নয়। শিক্ষার জন্য ভৌত সামগ্রী এবং শ্রম ও মেধা রূপে যে জোগান দেয়া হয়, তার মূল্য নির্ধারণ যতটা কঠিন, তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন অবশ্য শিক্ষার উৎপাদ রূপে যে অদৃশ্য জ্ঞান ও বর্ধিত উৎপাদন দক্ষতা সম্পন্ন স্নাতক সৃষ্টি হয় তার মূল্যায়ন।

শিক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতার পরম মূল্যায়ন সম্ভব না হলেও, তুলনামূলক যাচাই সম্ভব। যেমন, শিক্ষার উপকরণসমূহ, যথা বিল্ডিং, ক্লাসরুম ল্যাবরেটরী ইত্যাদি যাতে অব্যবহৃত পড়ে না থাকে তার ব্যবস্থা করা। শিক্ষা-প্রযুক্তির আধুনিক সব উপকরণ, যথা অডিও ও ভিডিও যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে যোগ্যতম শিক্ষকদের বক্তৃতা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি, বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব। যোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষায় আকৃষ্ট করা না হলে, শেষ পর্যন্ত অপচয় ঘটে। শিক্ষা প্রশাসন, পরীক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা—সবকিছুই শিক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতা নির্ধারণ করে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন স্তরে প্রতিজন সফল শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সৃষ্টিতে কতটা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়, সেটাই শিক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতা নির্ধারণ করে। একটি সহজ পরিমাপ হল বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষায় কৃতকার্যের হার। শিক্ষার গুণগত মান বিসর্জন না দিয়েও এই দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব। অপ্রয়োজনীয় বিষয় পাঠক্রম থেকে বাদ দেয়া, মুখস্থ বিদ্যার চেয়ে উপলব্ধি ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটাবার দিকে বেশি দৃষ্টিপাত দেয়া, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা কমানো, পরীক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রটিমুক্ত করা ইত্যাদি শিক্ষা প্রশাসনিক বিষয়ের উন্নতি ঘটালে, অকৃতকার্যের হার কমতে পারে সহজেই।

বিপুল হারে পাবলিক পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা শিক্ষা ব্যবস্থায় অদক্ষতার একটি বড় কারণ। কৃতকার্যতার জন্য সবগুলো বিষয়ে পাস করার শর্ত আরোপ না করে, যে যতগুলো বিষয়ে পাস করলো তার ভিত্তিতে সার্টিফিকেট দিলে, অকৃতকার্যতার গ্লানি থেকে বহু শিক্ষার্থী রক্ষা পেতে পারে। শুধু উচ্চতর শ্রেণীতে ভর্তির জন্য কোন কোন বিষয়ে কৃতকার্যতা প্রয়োজন এবং কতটা মান, তা নির্ধারিত হতে পারে— কোন প্রতিষ্ঠানে এবং কোন বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে, তার ভিত্তিতে। অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের উপর এবং সেই অর্থে সমগ্র সমাজের উপরে পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার যে ক্ষতিকর মানসিক প্রভাব পড়ে তা দূর করার জন্যেও শিক্ষা ব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

অনুন্নত দেশগুলোতে প্রথম তিন বছরের প্রায় শতকরা পঞ্চাশ জন শিক্ষার্থী যে ঝড়ে পড়ে, তার কারণ আর্থ-সামাজিক। দেশের সার্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সিদ্ধান্ত তাই গ্রহণ করার আছে, বিকল্প সব পথ ও ব্যবস্থনার ভিতর থেকে। শিক্ষা ব্যয়ের উৎস কি হবে? কোন স্তরে ও কোন এলাকায় কত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে? সেটাও সিদ্ধান্তের ব্যাপার। শিক্ষার ব্যয় কি কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে অথবা স্থানীয় সরকার? এই ব্যয়কি বেসরকারি সংস্থা এবং অভিভাবক বহন করবে? এবং সেক্ষেত্রে কোন স্তরের শিক্ষার জন্য, ব্যয়ের কত অংশ বেসরকারি পক্ষ বহন করবে? শিক্ষাখাতে ব্যয় কি বাধ্যতামূলক হবে অথবা স্বেচ্ছাধীন? এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা নির্ধারিত হয় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবকাঠামোর দ্বারা। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন এলাকা ও ব্যক্তি বিশেষ ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ ও স্বাধীনতা পেতে পারে, বিকল্প পথ থেকে নিজস্ব পথে বেছে নিতে। অথবা জাতীয়ভাবে লক্ষ্য নির্ধারণের একটি সামগ্রিক ও দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত হতে পারে, শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা প্রশাসন সম্পর্কে, যেখানে সমষ্টির স্বাধীনতার মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা অনেকটা খর্বিত হতে হবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ নয়। কারণ, শিক্ষার মূল লক্ষ্য, আদর্শ ও দর্শনের মধ্যে আপাত পরস্পর বিরোধী দুটি ধারা রয়েছে।

শিক্ষা এক অর্থে ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও মেধার বিকাশ, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে উপলব্ধি অর্জন, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকে বুঝায়। একজন মানুষের মস্তিষ্কে যা ঘটে, তা আশ্চর্যভাবে সংরক্ষিত তার নিজের মধ্যে। প্রতিটি মানুষই তাই এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন। অন্যদিকে শিক্ষা মানেই একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে বিকাশ লাভ করা। অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান, পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি, পরস্পরকে প্রভাবিত করা ও প্রভাবিত হবার ভিতর দিয়েই শিক্ষা লাভের প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয়।

শিক্ষার অর্থ আধ্যাত্মিক ভাবনা বা ব্যক্তি চেতনায় আত্মমগ্ন হয়ে বসে থাকা নয়। ব্যক্তিগত আবিষ্কার ও উপলব্ধি লাভের সময়, নিঃসঙ্গ গবেষণা ও ভাবনা কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত জ্ঞান ও লব্দ উপলব্ধিকে পৌছে দিতে হয় অন্যের কাছে। শিক্ষা তাই একটি সামাজিক ব্যাপার, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পটভূমিতেই তা মূল্যায়িত ও মূল্যপ্রাপ্ত। শিক্ষার সম্পর্ক যেহেতু জ্ঞানের সঙ্গে, এবং জ্ঞানকে যাচাই করতে হয় পারস্পরিকতায়, নতুন জ্ঞানের আবিষ্কারের জন্যেও পুরানো জ্ঞানের জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়, যেখানে অসংখ্য মানুষের অবদান সঞ্চিত ও সঞ্চায়িত। সুতরাং জ্ঞানের সৃষ্টি, জ্ঞানের যাচাই, যোগাযোগ, সংরক্ষণ ও প্রয়োগ—সবটাই একটি যৌথ আয়োজনের ব্যাপার। শিক্ষা তাই শেষ বিশ্লেষণের একটি সামাজিক ও আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ড, যা ব্যক্তি এবং অব্যবহিত স্থান ও কালের সীমানা অতিক্রম করে যেতে চায়। শিক্ষার আয়োজন ও পরিকল্পনাকে সমন্বিত করতে হয় উন্নয়নের অন্য সব আয়োজন ও পরিকল্পনার সাথে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে প্রযুক্তি ও শিল্পায়নের কাঠামো পরিকল্পনা করা হয়, শিক্ষার পরিকল্পনা তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার প্রয়োজন পড়ে। এখানে বিকল্প অনেকগুলো পথ থেকে বিশেষ পথকে নির্বাচন করতে হয়। যেমন, উন্নয়ন পরিকল্পনার

www.pathagar.com

উপরে নির্ভর করে নির্বাচিত প্রযুক্তি কি শ্রমঘন হবে? অথবা সম্পদ নির্ভর বা জ্ঞান নির্ভর? এ প্রশ্নের মীমাংসা হতে হবে— কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কতটা পরিবর্তন ও উন্নয়নের গতি গ্রহণ করার ক্ষমতা রাখে, তার উপরে।

বেশি সংখ্যক অল্প শিক্ষিত কর্মী দিয়ে যে কাজ সম্পন্ন করা যায়, অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক কিন্তু উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত ও দীর্ঘতর সময় ধরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা সেই পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এজন্য উন্নত যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তির জন্য ও উচ্চ শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ বেশি লাগবে। শ্রমঘন উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সম্পদ নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় আমরা যেতে পারি। উন্নত দেশগুলো সাধারণ শ্রমিকের বিকল্প হিসাবে রবোট ব্যবহার করছে কারখানায়। কম্পিউটারের ব্যবহার গতানুগতিক হিসাব রক্ষকের প্রতিকল্প রূপে কাজ করছে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরীর খরচ কমিয়ে যন্ত্রের জন্য তা ব্যয় করা হয়।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন জ্ঞান, নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার গুণগত পরিবর্তন এনে দেয়। অর্থনীতির ভাষায় উৎপাদন অপেক্ষক বা Production function কে বদলে দেয়া যায় গবেষণালব্ধ নতুন জ্ঞানের দ্বারা। এখানে শিল্প, জ্ঞান নির্ভর বা তথ্য নির্ভর হয়ে উঠছে, শ্রম নির্ভরতা কাটিয়ে। বরং বলা উচিত, কায়িক শ্রম থেকে বুদ্ধিগত শ্রমের দিকে উৎপাদনশীলতা অগ্রসর হচ্ছে। উৎপাদিত সামগ্রী ও তার বাজারও বদলে যাচ্ছে। গবেষণার উৎপাদ যে তথ্য ও উপাত্ত, সেটাই এখন মূল্যবান সামগ্রী এবং এর কারখানা হল গবেষণা প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়। সব ধরনের বিনিয়োগ ও ফললাভকে যদি অর্থের মূল্যে হিসাব করা সম্ভব হয়, তা হলে প্রতি একক বিনিয়োগে কতটা ফললাভ হল তার অনুপাত থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার দক্ষতা পরিমাপ করা যেতে পারে।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচিতে শিক্ষার অবস্থান নির্ধারণে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের আছে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও বিকল্প নানা পথ থেকে বিশেষ একটি পথ নির্বাচনের মধ্যে রয়েছে শিক্ষার মূল লক্ষ্য নির্ধারণ। শিক্ষার জন্য যে উদ্যোগ তা কোন এলাকায়, শিক্ষার কোন স্তরে, অথবা উন্নয়নের কোন পর্যায়ে অগ্রাধিকার পাবে, তা একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপার।

যেমন, সর্বজনীন ও দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা কি উন্নয়ন কর্মধারার অনিবার্য পূর্বশর্ত রূপে গৃহীত হবে? যদি তা এতটা ব্যয়বহুলও হয় যে সার্বিক জীবনযাত্রার মান এজন্য কমে আসে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিলম্বিত হয়? অথবা অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্যই অগ্রাধিকার পাবে এবং সর্বজনীন ও দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষার কর্মসূচি পরে গৃহীত হবে যখন সেই ব্যয় বহন জাতির জন্য সহজতর হবে?

উন্নয়নশীল দেশগুলো শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে সমান গুরুত্ব দেবে? অথবা যে শিক্ষা বিশেষভাবে সংযুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে তার উপরে বেশি গুরুত্ব দেবে? দেশের সব মানুষের জন্য সমান শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে পশ্চাদপদ এলাকায় বেশি বিনিয়োগ করবে? অথবা দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত এলাকার ত্বরান্বিত অগ্রগতিকে উৎসাহিত করবে দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে?

কোন স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে ন্যূনতম অধিকার বলে গণ্য করা হবে? ফলে পেশাগত শিক্ষায় প্রসারের চেয়ে সবার জন্য ন্যূনতম এই শিক্ষা কি অগ্রগণ্য বিবেচিত হবে? শিক্ষা

www.pathagar.com

যেখানে উন্নত জীবনবোধ, ও জীবন যাপনের জন্য অর্থাৎ উৎপাদনশীলতার জন্য নয়, ভোগের জন্য, সেখানে তার ব্যয়ভার কি শিক্ষার্থী বা অভিভাবক বহন করবে? রাষ্ট্র কি শিক্ষার পরিকল্পনা, এর প্রশাসন এবং ন্যূনতম সর্বজনীন শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালনের পর শিক্ষার বাকি ব্যয়ভার জনসাধারণের উপরে ছেড়ে দেবে?

আসলে শিক্ষার কোন অংশ উৎপাদনশীল এবং কোন অংশ শুধু উপভোগের তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। শিক্ষা দর্শন, শিক্ষা নীতি, শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন এজন্যেই ক্রমাগত রূপান্তর ও পরিবর্তনীয়তার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়। উন্নয়ন ও শিক্ষা যে পরিমাণে মুক্তপ্রান্ত ও অসংজ্ঞায়নসাধ্য এবং অযান্ত্রিক ও অনির্ণেয় এদের পারস্পরিক সম্পর্কে, সেই পরিমাণে ক্রমাগতভাবে এদের সীমানা নির্ধারিত হয়, অসংখ্যের মতামত, অনুপ্রেরণা ও রুচির ভিত্তিতে।

জাতীয় শিক্ষা ও উন্নয়ন তাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ যেমন, তেমনি এর ফসল। শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় বিনিয়োগ কতটা হবে ও কিভাবে হবে? এ প্রশ্নের জবাব যেমন সম্ভাব্য বিকল্প সমাধানের ভিতর থেকে অনুসন্ধান করতে হয়, অনেকটা সামাজিকভাবে, তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রশাসনেও অনেকগুলো সামাজিক প্রভাব কাজ করে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পাঠক্রম, শিক্ষাদান ও মেধা যাচাই পদ্ধতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গঠন ও পরিচালনা— তা চলে পুরানো ধারায়, এবং তা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষা পদ্ধতির উপাদানগুলো গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে। শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন ও অগ্রগতির পথে, এই জড়তা অনেকটাই ঘটে সামাজিক কারণে। বিপুল সংখ্যক মানুষ গ্রাম থেকে চলে আঁসছে শহরে। ফলে, তাঁদের গ্রামীণ জীবন ধারার প্রভাব পড়ছে শহরে। শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন যে ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পারিবারিক সম্পর্ক, শৃঙ্খলা ও সময়ানুবর্তিতা ও গতিশীলতা দাবি করে, গ্রামীণ জীবন ধারায় অভ্যস্ত সমাজ তা সহজে গ্রহণ করতে পারে না। এই সমস্যার সমাধানে দ্রুত সামাজিক পুনঃবিন্যাস প্রয়োজন।

এখানেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্যা রয়েছে, আমাদের মতন উন্নয়নশীল দেশগুলোর। পুরানো জীবনধারা ও ঐতিহ্যের কোন উপাদানগুলো সংস্কৃতির অংশরূপে সংরক্ষিত হবে? এবং পরিবর্তন ও আধুনিক জীবন ধারা কতটা আমরা আত্মস্থ করে নেব? সেটা এমন এক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপার, যেখানে সমগ্র সমাজ জড়িত। শিক্ষা এখানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে শুধু নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি এবং উৎপাদন কৌশল, শিক্ষা ও নতুন উদ্ভাবন অংশগ্রহণে নয়, পরিবর্তনের অভিঘাত সহনীয় করে এবং সমাজকে ভেঙ্গে পড়া থেকে রক্ষা করে, অগ্রসর হয়ে। আর এজন্যেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষা যেখানে সম্পর্কিত, সেখানে জ্ঞানের সমস্ত শাখাই পরস্পরের পরিপূরক হয়ে কাজ করেছ। শিক্ষার সামগ্রিক আয়োজনকে সফল করেই মাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতার কাজে সফলভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব।

আমরা দেখেছি উন্নয়নের অন্যান্য লক্ষ্যের মতন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ সহজ নয়, এবং সেই কারণে এর পরিকল্পনাও। অথছ কোন প্রচেষ্টা ও কর্মপরিকল্পনা সফল করতে হলে যে লক্ষ্যে তা গৃহীত, তা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষার পরিকল্পনা

www.pathagar.com

গ্রহণ এজন্যে একটি জটিল, গতিশীল ও চ্যালেঞ্জযুক্ত কর্মধারা, যা সৃজনশীলতায় প্রায় শিল্পকর্মের মতই প্রতিটি দেশের জন্য অনন্য ও উদ্ভাবনী।

পরিকল্পনা শব্দটি এর পুরানো অন্তর্নিহিত অর্থ হারিয়ে ফেলেছে এখন। প্রতিটি দেশই এর রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ফলে, পরিকল্পনা মুক্ত অর্থনীতি বা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপন্থী, এমন ধারণা এখন আর সর্বজনীন নয়। আমরা শিক্ষার প্রসঙ্গে পরিকল্পনা বলতে এখানে বুঝব দেশের দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োজন ও লক্ষ্যকে চিহ্নিত করা এবং তা অর্জনের জন্য জাতীয়ভাবে যথাযথ কর্মসূচি নির্ধারণ করা। শিক্ষা পরিকল্পনায় শুধু সেই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে, যেগুলো সম্পর্কে পূর্বাভাষ পাওয়া সম্ভব, এবং যেখানে বিকল্প পন্থার ভিতর থেকে যথোচিত পথটি বেছে নেয়া যায়।

যাঁরা উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ তাঁরা শিক্ষাকে উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে গিয়ে যে সব কৌশল প্রয়োগ করেছেন, তার আলোকে আমরা শিক্ষা পরিকল্পনাকে বিশ্লেষণ করতে পারি।

একটি পরিচিত পন্থা হচ্ছে শিক্ষার যে চাহিদা বিভিন্ন স্তরে তা নির্ধারণ করা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বয়সের বিন্যাস, সামাজিক ও জাতীয় লক্ষ্য এবং সেইসঙ্গে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের প্রত্যাশার ভিত্তিতে প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোর বিস্তার ও বিকাশ ঘটানো। জাতীয় লক্ষ্যের মধ্যে সর্বজনীন শিক্ষা, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হল, উন্নয়নের অবকাঠামো রূপে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন। শিক্ষার সার্থকতা ও উদ্দেশ্য এখানে নিহিত শিক্ষা লাভের মধ্যেই। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর থেকেই শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হবার পর, সেই লক্ষ্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সংশ্লিষ্টতা যাচাই করা হয়।

এই পন্থায় সাধারণত যা ঘটে তা হল, অভিক্ষেপন প্রক্রিয়ায় যে অর্থ ব্যয়ের হিসাব প্রাক্কলিত হয়, জাতীয় আয়, আর্থিক ক্ষমতা তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। একটি বাস্তব সমাধানের জন্য আপসমূলক সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছতে হয়। এই পদ্ধতিতে অতীত ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করে বেশি। ফলে, যেসব দেশ ইতিমধ্যেই উন্নতি লাভ করেছে তারা তাদের অগ্রগতির ধারাকে স্থিতিশীলতা বা অব্যাহত রাখতে পারে এই পন্থায়। অবশ্য প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি ও নতুন চ্যালেঞ্জ যে কোন রক্ষণশীল ধারার জন্য বিপজ্জনক। বস্তুত এই পদ্ধতি, যাকে সামাজিক পদ্ধতি বা Social method বলা হয়ে থাকে, উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বিশেষ আকর্ষণীয় নয়, এবং যথার্থ অর্থে একে উন্নয়নের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা বলা যায় না। উন্নয়নের লক্ষ্য ও অঙ্গিকার নিয়ে শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে একটি আক্রমণাত্মক প্রেরণা কাজ করে। শিক্ষা সেখানে শুধু ঐতিহ্যের ও সংস্কৃতির ধারক নয়। স্বয়ং সম্পন্ন নয়, বরং সমাজ পরিবর্তনের ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাধিত্র। সেক্ষেত্রে শিক্ষা পরিকল্পনার সাহসিকতা আছে, ঝুঁকি আছে এবং উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি।

আমরা দেখেছি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষা সম্পর্কিত, জ্ঞান ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির ভিতর দিয়ে। শিক্ষার আয়োজন তাই বিভিন্ন স্তরে দক্ষ, জ্ঞানী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্মী গড়ে তোলা। শিক্ষা পরিকল্পনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে কাজ করে, সেখানে মূল

www.pathagar.com

লক্ষ্য হল বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের জন্য যথাযোগ্য শিক্ষা ও দক্ষতা প্রাপ্ত যথেষ্ট সংখ্যক কর্মী সৃষ্টি। শিক্ষা পরিকল্পনার সাফল্য এ ক্ষেত্রে যাচাই করা হয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদা মিটাবার মতন শিক্ষাপ্রাপ্ত জনশক্তি সৃষ্টি হয়েছে কিনা তার ভিত্তিতে।

ভবিষ্যতে কি পরিমাণ ও বিস্তারের শিক্ষাপ্রাপ্ত জনশক্তি প্রয়োজন হবে, তা স্বভাবতই নির্ভর করে উন্নয়ন ও শিল্পায়ন পরিকল্পনার উপর। জনশক্তির ভবিষ্যৎ চাহিদা নির্ধারণের বিকল্প নানা পদ্ধতি হতে পারে এবং সেই চাহিদা মিটাতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কিভাবে সাজাতে হবে তার পরিকল্পনা হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে কোন ক্ষেত্রে কতজন কর্মী ও বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন হবে? তা নির্ধারণ অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। প্রথমত জনশক্তি সম্পর্কে পূর্বাভাষ নির্ভরযোগ্যভাবে করতে হলে পাঁচ সাত বছরের বেশি সম্মুখ দৃষ্টি সম্ভব নয়, অথচ শিক্ষা পরিকল্পনাকে যথাযথভাবে করতে হলে, এর ভবিষ্যৎ কালিক প্রেক্ষাপট পনের থেকে বিশ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য মূল শিক্ষা কাঠামোর বিভিন্ন ধাপকে স্বল্পকালীন ব্যবস্থার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত করা যেতে পারে, যাকে আমরা প্রশিক্ষণ বলতে পারি। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা যত দক্ষ ও পূর্ণাঙ্গভাবে পরিকল্পিত হয়, দীর্ঘ ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিয়ে, ততই তা সুসংহত ও অনমনীয় হয়ে পড়ে।

এখানে একটি সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপার আছে। যদি নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ক্রমাগত বদলানো হয়, তা হলে সুপরিকল্পিত দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা সম্ভব নয়। অন্যদিকে সুদৃঢ় ও সুসমন্বিত ও দীর্ঘমেয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার পরিবর্তনীয়তা ও নমনীয়তার অবকাশ কম। কোথায় শিক্ষা পরিকল্পনার নমীয়তার সীমা টানতে হবে, তা নির্ভর করে কত নিশ্চিতভাবে শিক্ষার লক্ষ্য এবং বিশেষজ্ঞ ও কর্মীর ভবিষ্যৎ চাহিদা আমরা নির্ধারণ করতে পারি তার উপরে।

শিল্পায়ন ও উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা কাজ করবে, তাঁদের কি ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন, তা নির্ভর করে প্রযুক্তির রূপান্তর ও অগ্রগতি কিভাবে ঘটবে তার উপরে । ক্রমাগত নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার প্রযুক্তির দিগন্তকে বদলে দিচ্ছে। যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিপ্লবাত্মক অগ্রগতি কোন দেশকেই আন্তর্জাতিক প্রভাব ও প্রতিযোগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে দিচ্ছে না। ফলে, ভবিষ্যতে কোন ক্ষেত্রে কতজন কি ধরনের শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রয়োজন, তা সবটাই দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বারা শুধু নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট কি রূপ পরিগ্রহ করছে তার উপরেও নির্ভর করে।

জনশক্তি পদ্ধতিতে শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একটি সীমাবদ্ধতা হল, শিক্ষা যে উপভোগের ব্যাপারও, শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির হাতিয়ার নয়, সে কথাটি অনুক্ত থেকে যায়। সমাজের জন্য ন্যূনতম একটি শিক্ষা যে অপরিহার্য, উৎপাদনশীল মানুষ হিসাবে নয়, শুধু মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার জন্য, সে হিসাবটি এখানে বাদ পড়ে যায়। এটা হয়তো আশাবাদী হয়ে ভাবা যেতে পারে যে, পেশাগত শিক্ষার উপসর্গ রূপে শিক্ষার অন্যান্য উপভোগ্য দিক অর্জিত হবে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। অর্থনৈতিক শিক্ষা রূপে যে পেশাগত শিক্ষা, সেটা সমাজের শিক্ষার চাহিদার সবটাই পূরণ করে না।

www.pathagar.com

মেয়েদের ও মহিলাদের শিক্ষা, যা সবসময় উৎপাদনশীলতার কাজে নাও লাগতে পারে, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনে যে শিক্ষা, তাকেও হিসাবে আনতে হবে। এছাড়া উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষাকে উজ্জীবিত রাখার জন্য এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, চাহিদার চেয়ে কিছুটা বেশি হারে শিক্ষার প্রসারণ ঘটে, যদি না তা অত্যধিক বেকার সমস্যা সৃষ্টি করে। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে অপচয় ঘটে, পেশা বদল ঘটে এবং শিক্ষার্থীরা মধ্যপথে বিষয় পরিবর্তন করে—এসবই হিসাব করতে হবে, ভবিষ্যৎ কর্মী সংখ্যার অভিক্ষেপনে। আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও প্রযুক্তির পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে ক্রমাগত গতিশীল সামঞ্জস্য রক্ষা করে শিক্ষা পরিকল্পনা করতে হয়। উন্নয়নের বিভিন্ন খাতে প্রয়োজনীয় জনশক্তির যে মিশ্রণ, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র সংখ্যার বিন্যাস ঘটানো শিক্ষা পরিকল্পনার একটি বড় লক্ষ্য। শিক্ষা খাতে যে বিনিয়োগ এবং সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিনিয়োগ, তা পারস্পরিক পরিপূরকতায় পরিকল্পিত হতে হবে।

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির ভিতর দিয়ে শিক্ষা যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেখানে শিক্ষা পরিকল্পনায় জনশক্তি-পদ্ধতি বা Man Power, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, যদি এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থেকে তা করা যায়।

ফ্রান্স, ইটালি, ভারত প্রভৃতি দেশ এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছে তাদের শিক্ষা পরিকল্পনায়। বিশেষ করে ইটালিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা প্রায় পাঁচভাগ ধরে নিয়ে এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নতুন প্রযুক্তির প্রভাবকে হিসাবে এনে, বাধ্যতামূলক, প্রাথমিক শিক্ষাকে পনের বছরে উন্নীত করে। এবং পনের থেকে উনিশ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষার বিপুল প্রসার ঘটায়।

শিক্ষা পরিকল্পনাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সংযুক্ত করায় আর একটি পদ্ধতি হল, শিক্ষা ও শিল্প উৎপাদনের অনুপাতকে সূচক হিসাবে ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বিভিন্ন স্তরে জনশক্তির কি প্রয়োজন হবে তার পূর্বাহিসাব না করে, জাতীয় যে উৎপাদন ও সেবামূলক কাজ এবং তার সঙ্গে দেশের মোট শিক্ষিত জনশক্তি ও বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষা সম্পন্ন করছে, এদের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়। অনেকগুলো রৈখিক সমীকরণ দাঁড় করানো হয়— বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা প্রাপ্ত এবং শিক্ষার্থীর সঙ্গে মোট জাতীয় উৎপাদনের।

এই সমীকরণগুলো থেকে হিসাব করা হয় শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো কেমন করে বদলাতে হবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য। প্রফেসর টিনবার্গ এই পদ্ধতিটি দাঁড় করিয়েছেন। এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা হল, শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত এবং বিভিন্ন শাখা ও স্তরে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির যে মিশ্রণ তার সঙ্গে বিভিন্ন উৎপাদিত সামগ্রীর যে মিশ্রণ, তা সম্পর্কিত করতে হবে। এই সম্পর্কের যে মূল ভিত্তি তার উপরে নির্ভর করে ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের পরিকল্পনা এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত শিক্ষা পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

জনশক্তি পদ্ধতি এবং শিক্ষা ও উৎপাদন অনুপাত পদ্ধতি, উভয়েরই একটি বড় সীমাবদ্ধতা হল— উৎপাদিত সামগ্রীর পরিমাণের সঙ্গে নিয়োজিত জনশক্তির একটি

www.pathagar.com

নির্দিষ্ট আনুপাতিক সম্পর্ক খোঁজা হয়। কিন্তু আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে, উন্নত শিক্ষা ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার উৎপাদনে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা জানতে পারে। উৎপাদন না কমিয়ে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের ব্যবহার, অল্প শিক্ষিত ও অল্প সংখ্যক কর্মী ছাড়া বেশি উৎপাদনে যেতে পারে। এক্ষেত্রে উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে নিয়োজিত অল্প সংখ্যক ও অতন্ত সৃজনশীল ব্যক্তি, বস্তুত অন্য অসংখ্যের জন্য যেন বুদ্ধি প্রয়োগ ও মেধার কাজটা করে দিচ্ছে। যেমন, কম্পিউটার প্রোগ্রাম অল্প সংখ্যক লিখছে, কিন্তু তা ব্যবহার করছে অনেকে, প্রায় চিন্তা না করে। এক্ষেত্রে শিক্ষার বিস্তার আনুভূমিক না হয়ে, হয়ে উঠছে উল্লম্ব—উদ্ভাবন ও বিশেষজ্ঞ নির্ভর।

শিক্ষা যত বহুমুখী হয়ে উঠছে এবং উৎপাদিত সামগ্রী যত বৈচিত্র্য লাভ করছে, ততই জটিল হয়ে উঠছে শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদিত সম্পদের অনুপাতকে সংজ্ঞায়িত করা, অর্থাৎ রৈখিক সমীকরণ দাঁড়ি করানো।

শিক্ষা ও উৎপাদ অনুপাতের এই পদ্ধতি বাস্তবে প্রয়োগ করা প্রায় দুঃসাধ্য। বিশেষ করে আমাদের মতন উন্নয়নকামী দেশগুলোতে বিপুল পরিমাণ প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ এবং সংখ্যায়নিক গাণিতিক হিসাব দাঁড়ি করাবার সুযোগ নেই। কিন্তু প্রফেসর টিনবার্গের প্রস্তাবিত এই পদ্ধতি একটি চমৎকার গাণিতিক ধারণা দেয়, শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদিত সম্পদের একটি পরিমাণগত সম্পর্ক সৃষ্টির।

শিক্ষা পরিকল্পনার আর একটি পন্থা হল, শিক্ষার জন্য সামাজিক যে মোট চাহিদা, তার ভিত্তিতে শিক্ষাকে পরিকল্পনা করা। এখানে প্রয়োজনীয় বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত জনশক্তি অথবা উৎপাদিত সামগ্রীর সঙ্গে শিক্ষাকে সম্পর্কিত করা হয় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এদের উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার যে আয়োজন করেছে, সেই প্রমাণ পথকে অনুসরণ করে প্রতিটি দেশ তার শিক্ষার পরিকল্পনা করতে পারে, তার উন্নয়নে স্তর ও উত্তরণের স্তর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে। শিক্ষার অবস্থা নির্ধারণের জন্য যে সূচকগুলো ব্যবহৃত হতে পারে সেগুলো হল, জাতীয় আয়ের কত অংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়? উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগের কত ভাগ শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত? স্কুলছাত্র ও স্কুল বয়সী শিশুদের অনুপাত কি? জনসংখ্যার কত শতাংশ শিক্ষার কোন স্তরে শিক্ষা লাভে নিয়োজিত? এই সব সূচককে অর্থনৈতিক অবস্থা ও উন্নয়নের সূচকের সঙ্গে মিলিয়ে, শিক্ষার প্রতি কতটা গুরুত্ব কোন সমাজ দিচ্ছে? তা যাচাই করা যেতে পারে।

এই সমষ্টি পদ্ধতির সুবিধা হল, হিসাবের জটিলতা কম। এখানে মনে করা হচ্ছে সূক্ষ্ম ও জটিল নানা যেসব বিষয় উন্নয়নকে নিয়ন্ত্রণ করে ও শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত তা পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা না হলেও, এদের সামগ্রিক ফলাফল প্রতিফলিত বিভিন্ন দেশের শিক্ষার স্তর ও উন্নয়ন স্তর নির্ধারক সূচকে। শিক্ষার সঙ্গে উন্নয়নের যে পারস্পরিক সম্পর্ক, তা পরীক্ষামূলকভাবে যেন আমরা লাভ করি, বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিমাপ করে। এক্ষেত্রে যা বিপজ্জনক তা হল, উন্নয়ন স্তর ও শিক্ষার অবস্থা যাচাইয়ে যে সব সূচক নির্বাচন করা হয়, তা সঠিক ও সার্বিক কিনা।

কোন দেশের প্রয়োজনীয় শিক্ষাখাতে ব্যয় নির্ভর করে, সেখানকার জনসংখ্যার বয়সের বন্টনের উপরে। বাংলাদেশের মতন উন্নয়নকামী দেশে যেখানে জনসংখ্যার

www.pathagar.com

অর্ধেকের বয়স পনের বছরের নিচে, সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় অনেক বেশি হবার কথা। এছাড়া শিক্ষাখাতে জাতীয় আয়ের কত অংশ ব্যয় হল সেটাই যথেষ্ট সূচক নয়—শিক্ষকের বেতন, শিক্ষার অবকাঠামো সৃষ্টি, শিক্ষার উপকরণ সংগ্রহ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ইত্যাদি খাতে ব্যয়ের যে বন্টন, সেটাও বিচার্য বিষয়।

মানব সম্পদ মূল্যায়ন হচ্ছে শিক্ষা পরিকল্পনার আর একটি পদ্ধতি। এই মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি প্রধান উৎস হল প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। অন্যান্য উৎসের মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, পেশাগত অভিজ্ঞতা অর্জন ইত্যাদি। জনসম্পদ উন্নয়নের কৌশলগত অবস্থান হল—জনসম্পদের সমস্ত উৎসকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বিত করা। দেশের উপস্থিত যে জনসম্পদ, তার ভিত্তিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করা যে, বেকার জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ও নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত জনশক্তিকে নিয়ে, উচ্চতর স্তরে সমগ্র সমাজকে উন্নত করা সম্ভব হয়। জাতীয় যে উন্নয়ন লক্ষ্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক, তার আলোকে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তুলনামূলক গুরুত্বের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেয়াই এই ব্যাপক পদ্ধতির লক্ষ্য।

উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে শিক্ষা পরিকল্পনাকে সমন্বিত করার বিভিন্ন যে সব পদ্ধতির কথা আলোচিত হয়েছে তা সফল করতে হলে, অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা পরিকল্পনা যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী হতে হয়, জনসংখ্যার পনের বা বিশ বছরের একটি ভবিষ্যৎ অভিক্ষেপ প্রয়োজন। এদের মধ্যে প্রত্যেক বছরে কত সংখ্যক ছেলেমেয়ে কোন স্তরের শিক্ষা লাভের বয়সী হবে সে হিসাবটাও করতে হবে। সাধারণত আদমশুমার-এ বয়সভিত্তিক জনসংখ্যার এই বিশ্লেষণ থাকে না, কিন্তু সেটা মোটামুটি হিসাব করে বের করা সম্ভব।

বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত জনশক্তির হিসাবও প্রয়োজন। এই তথ্যের ভিত্তিতে ন্যূনতম শিক্ষা কোন স্তর পর্যন্ত সমাজ বহন করতে সক্ষম, তা নির্ধারণ করা যেতে পারে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কত বছর পর্যন্ত দেয়া সম্ভব হবে এবং কত বছরের মধ্যে তা নিশ্চিত করা যাবে তা হিসাব করতে হবে। বয়স্ক লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে সর্বজনীন শিক্ষা যদি সামাজিক লক্ষ্য হয়, সেটাও হিসাবে আনতে হবে এবং সেজন্য ভিন্ন ধরনের শিক্ষা আন্দোলন প্রয়োজন হবে।

শিক্ষা পরিকল্পনা সফল করতে হলে শিক্ষার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্ক নিশ্চিত করতে হবে। একদিকে শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে, অন্যদিকে শিক্ষায় বিপুল ব্যয় বহন করার সাধ্য অর্জন ও যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্যে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির ভিত্তিতে, প্রতিটি শাখা ও উপশাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা হিসাব করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ধারার অভিক্ষেপ, শিক্ষা পরিকল্পনার ভিত্তিরূপে কাজ করবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিশ্লেষণ ও আদমশুমারি থেকে শিক্ষার প্রয়োজনীয় কাঠামোর অভিক্ষেপ তৈরি করা যেতে পারে, এবং একই সঙ্গে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোন শিক্ষায় কতজন কর্মী প্রয়োজন হচ্ছে তার প্রকৃত নমুনা থেকে পাওয়া সংখ্যার ঠিক হিসাব করা যেতে পারে। এই 'দুই' হিসাবের ভিত্তিতে শিক্ষার পরিকল্পনা তৈরি হবে। পেশাগত যে বিন্যাস কর্মীদের, তা কাল্পনিক হিসাবের ভিত্তিতে শুধু না করে, বাস্তব

www.pathagar.com

পরিসংখ্যানের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করলে, বেশি নির্ভরযোগ্য হবে। সময়ের সঙ্গে প্রযুক্তির যে অগ্রগতি হচ্ছে, সে হিসাবটাও সমন্বিত হতে হবে কর্মীর সংখ্যা ও তাদের শিক্ষার মান নির্ধারণে।

আই এল ও এর শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে পেশাগত দক্ষতাকে ১৩৪৫টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, এবং শিক্ষাগত দক্ষতার ভিত্তিতে উন্নত দেশের কর্মীদের ভাগ করা যায় ৩০০টি শ্রেণীতে। বিশেষ কয়েকটি পেশা ছাড়া এবং একটি ব্যাপক ভিত্তিক বিভাজন ছাড়া, পেশাগত দক্ষতা ও শিক্ষাগত দক্ষতার মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায় না। পনের কি বিশ বছরের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ৩০০টি শ্রেণীবিভাগ প্রয়োজন হয় না। এক্ষেত্রে শিক্ষার সুযোগ, ছাত্রসংখ্যা ও শিক্ষা ব্যয়ের যে হিসাব, তা বড় বড় বিভাজনের ভিত্তিতে হতে পারে। শিক্ষা পরিকল্পনা যতই অগ্রসর হতে থাকে, ততই স্পষ্টতর হতে পারে শিক্ষার বিষয় নির্বাচন ও নির্দিষ্ট শিক্ষার বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির কাজ। শিক্ষা হচ্ছে ব্যাপক ভিত্তিক, যাকে কেন্দ্র করে নির্বাচিত বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি হতে পারে। শিক্ষা পরিকল্পনা তাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না করে, ব্যাপক ভিত্তিতে করা উচিত। শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল করার লক্ষ্যেই নমনীয় করা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীদের রুচি ও মানসিকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করলে শিক্ষা যান্ত্রিক হয়ে উঠে, যা সৃজনশীলতার পরিপন্থী। শিক্ষার্থী শিক্ষার মধ্যপথে বিষয় পরিবর্তন করতে পারে। ভৌগলিক কারণে বা সাময়িকভাবে চাকুরী ক্ষেত্রে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হবার ফলে, পরিলকল্পনার সঙ্গে বাস্তব অবস্থার গড়মিল ঘটতে পারে। শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু ব্যক্তি দেশ ত্যাগ করতে পারেন। বস্তুত উন্নয়নশীল দেশে মেধা পাচার একটি ভয়াবহ ঘটনা, দক্ষ জনশক্তি হারাবার ক্ষেত্রে। এসব কিছু বিবেচনায় আনলে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আপাত হিসাবের তুলনায় অবশ্যই বেশি হতে হবে, অবশ্য অত্যধিক বেকার সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেটা বিবেচনায় রেখে।

শিল্পায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সংখ্যক বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর নিজস্ব রুচি অথবা সামাজিক প্রবণতা অথবা বিষয়ের জটিলতার বা অনাকর্ষণীয়তার কারণে, জরুরী অনেক বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র নাও মিলতে পারে। এক্ষেত্রে বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টি হতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে বিষয়গুলোতে বিশেষজ্ঞ অপরিহার্য, সেই সব বিষয়ের জন্য বিশেষ বৃত্তি অথবা ব্যাংক ঋণ প্রদান করলে, একদিকে শিক্ষার্থীকে তাঁদের জড়তা কাটাতে সাহায্য করা হবে, অন্য দিকে ক্রমাগত মেধা পাচারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ হারাবার যে সমস্যা অনুন্নত দেশগুলোর, সেটাও অনেকটা প্রতিহত করা সম্ভব হবে, বৃত্তি বা ঋণ গ্রহিতা শিক্ষার্থীদের চুক্তিবদ্ধ করে।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পরিমাণগত যে পরিবর্তন প্রয়োজন প্রত্যাশিত চাহিদা মিটাতে তা প্রতিফলিত হতে হবে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বিষয়ে কৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যায়। উৎপাদন মিশ্রণের সঙ্গে শিক্ষা মিশ্রণের সমন্বয় ঘটিয়ে

www.pathagar.com

পেশাগত প্রয়োজন সম্পর্কে যে পূর্বাভাস সৃষ্টি, তার পেছনে কাজ করে অভিজ্ঞতা, দূরদৃষ্টি, হিসাব দক্ষতা, সামাজিক অঙ্গিকার ও সমন্বিত উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহের উৎপাদের হিসাবে শিক্ষা ব্যবস্থার যে বিকাশমান কাঠামো পরিকল্পনা করা হয়, সেটাই নির্ধারণ করবে কত ছাত্র কোন স্তরে ও কোন বিষয়ে ভর্তি হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত যে অপচয়, শিক্ষার্থীদের অকৃতকার্যতা, মধ্যপথে বিষয় পরিবর্তন ও শিক্ষা শেষে দেশ ত্যাগের কারণে, তা পূরণের জন্যে ভর্তিকৃত ছাত্রের সংখ্যা সব সময়েই সাধারণ হিসাবের তুলনায় বেশি হতে হয়। শিক্ষা পিরামিডের যে অভিক্ষেপ সৃষ্টি করা হয় তার একটি কালিক মাত্রা আছে।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিকল্পিত রূপ প্রদানে কতটা সময় লাগবে অর্থাৎ শিক্ষক প্রস্তুত করতে, শিক্ষার ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টিতে, প্রয়োজনীয় পাঠক্রম ও পাঠ্যবই রচনায়—তা হিসাব করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে শিক্ষার দিগন্ত যে বদলে যাবে নতুন উদ্ভাবন ও নতুন প্রত্যাশার আলোকে, যা পরিকল্পনা প্রস্তুত করার সময় ভাবা যায় নি, সে হিসাবও করতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থার যে পিরামিড পরিকল্পনা করা হয়, তার মোটা দাগের হিসাবটি আমরা পাই বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞের সংখ্যা, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ও আকার এবং বিভিন্ন স্তরে ভর্তিকৃত ছাত্র ও কৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যার হিসাবে। কিন্তু শিক্ষা এমন একটি সুষ্ঠু ও সৃজশীল প্রক্রিয়া যে, একই পরিসংখ্যান দ্বারা বর্ণিত দুইটি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকতে পারে। শিক্ষার এই সংবেদী, উদ্ভাবনী ও সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য সৃজনশীল ও অনুপ্রাণীত ব্যক্তিত্ব প্রয়োজন, যে শুধু পরিবেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, পরিবেশের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে নিজেই পরিবেশ সৃষ্টি করে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বিশেষ ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার—অন্তত তাঁদের ধারণ করার মতন নমনীয়তা প্রয়োজন।

শিক্ষার সঙ্গে অর্থনীতি সম্পর্কিত দুইভাবে। শিক্ষা ব্যয়বহুল এবং শিক্ষার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিকভাবে দক্ষ করতে হলে শিক্ষার খরচ কমাতে হবে শিক্ষার মানকে বিসর্জন না দিয়ে, এবং শিক্ষাকে উৎপাদনের কাজে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হলে, শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। শিক্ষাখাতে ব্যয় নির্ভর করে শিক্ষার বিষয়ের উপরে।

সামাজিক ও মানবিক বিষয়গুলো পড়তে যেখানে মূলত শিক্ষক, ক্লাসরুম, লাইব্রেরী প্রয়োজন পড়ে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিক্ষায় সেখানে অতিরিক্ত উপকরণরূপে ল্যাবরেটরী, পরীক্ষার যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সামগ্রী ইত্যাদি প্রয়োজন হয়। সুতরাং শিক্ষার জন্য মাথাপিছু কত ব্যয় হল? এ প্রশ্নের জবাব নির্ভর করে শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষার স্তরের উপরে। কোন বিষয় নিয়ে কতজন পড়বে, কোন স্তর পর্যন্ত পড়বে, তা উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা অনেকটা নির্ধারিত হলেও, একটি সামাজিক সিদ্ধান্ত এখানে কাজ করে।

সাধারণভাবে মানবিক ও সামাজিক শিক্ষাকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত না করে, ব্যক্তি ও সমাজকে জানা, সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা, সংস্কৃতির বিকাশ এবং রাজনৈতিক ও মানবিক অধিকার রক্ষার উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে বিজ্ঞান

www.pathagar.com

ও প্রযুক্তির শিক্ষাকে উৎপাদনশীলতা ও শিল্পায়নের হাতিয়ার রূপে ভাবা হয়। কিন্তু এই ধারণা যে সঠিক নয় তা আমরা আগে কিছুটা আলোচনা করেছি। কিন্তু যা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার তা হল, প্রযুক্তি শুধু অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধন করে না, তা জীবন ধারা ও সামাজিক মূল্যবোধকেও বদলে দেয়। সেই পরিবর্তিত সমাজকে বুঝতে ও স্থিতিশীল করতে সমাজ বিজ্ঞান ও মানবিক শিক্ষা প্রয়োজন। যেমন, বিপুল সংখ্যাক শ্রমিক ও বিভিন্ন স্তরের কর্মী যখন সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে, বা একত্রে কাজ করে, তখন সামাজিক ও মানসিক নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, যার সমাধান প্রযুক্তির জ্ঞানের মধ্যে পাওয়া যাবে না। শারীরিক অসুস্থতার মতই মানসিক বিকার ও মানসিক চাপ উৎপাদনশীলতাকে ব্যাহত করে। উন্নত দেশগুলোতে শিল্পকারখানার কর্মীদের মানসিক চিকিৎসার জন্য মনোবিজ্ঞানীর গুরুত্ব বাড়ছে। কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার ও তথ্য বিপ্লব সৃষ্টি করছে Techno stress বা প্রযুক্তিগত মানসিক চাপ রূপে নতুন এক ব্যাধি। শিল্পায়ন যে নতুন সমাজ সৃষ্টি করছে তা বুঝতে ও সেখানে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে সমাজ বিজ্ঞানের অবদান অপরিহার্য।

অর্থনীতি, ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান ও কারবার বিদ্যা— সবই প্রযুক্তির ব্যবহার ও শিল্পায়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কম্পিউটারকে বিভিন্ন কাজে ও সর্বজনীনভাবে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটারের ভাষাকে সাধারণ ভাষার কাছাকাছি আনার চেষ্টা চলছে। এজন্য ভাষাকে আরো গভীরভাবে ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে জানার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে— এর শব্দ চয়ন, ব্যাকরণ, বাক্যগঠন ও তথ্য ধারণের প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে।

অন্যদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে নিছক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহায়ক শিক্ষা রূপে ভাবা ঠিক নয়। সংস্কৃতির রূপায়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাব সুদৃঢ় ও গভীর। সংস্কৃতি যেহেতু ভাগ করে নেয়া অভিজ্ঞতা, যা একটি যোগাযোগ মাধ্যম রূপ কাজ করে— বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রযুক্তির উদ্ভাবন সেই মাধ্যমকে বিস্তৃত ও সুদূর প্রসারী করেছে। বিশ্বজগতের রহস্যোদঘাটনের জন্য যে অনুমান, স্বজ্ঞা, তত্ত্ব সৃষ্টি, বিশ্লেষণের দৃষ্টি, প্রতিসাম্যের ধারণা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি প্রয়োজন, গণিতের যে জগৎ সৃষ্টি— যৌক্তিক ও উপলব্ধিগত—তা মানুষের বুদ্ধির ও সৃজনশীলতার চরম পরাকাষ্ঠা ঘটিয়েছে। প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও এর উৎপাদনের বিনিময়, বিশ্ব জুড়ে এক যোগাযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টি করেছে যার ভিত্তি বস্তুগত হলেও এর প্রভাব শেষ পর্যন্ত মানসিক। প্রযুক্তির উদ্ভাবন যুদ্ধাস্ত্র তৈরি ও বৈষম্য সৃষ্টি ও আধিপত্য বিস্তারের কাজে ব্যবহৃত হবে, অথবা মানুষের ইচ্ছা নিবৃত্তি, রোগমুক্তি, পারস্পরিক যোগাযোগ সৃষ্টি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধির কাজে, তা একটি মানবিক সিদ্ধান্ত—যা সবাই মিলেই শুধু গ্রহণ করতে পারে।

সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞানের ও বুদ্ধি চর্চার সবগুলো বিষয়ই যে গুরুত্ব পেতে হবে, এটা গুণগতভাবে উপলব্ধি করা সহজ হলেও, শিক্ষা পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিষয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত জটিল। প্রযুক্তির অগ্রগতির ধাপ ও সামাজিক মূল্যবোধ একত্রে শিক্ষার মিশ্র বা Educational mix ও শিল্পের উৎপাদ মিশ্রের মধ্যেকার ভারসাম্য নির্ধারণ করে। যেমন, সর্বজনীন অভিন্ন সাধারণ শিক্ষা সমগ্র দেশের জন্য প্রয়োজন অথবা বিভিন্ন জনপদের প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

অবস্থাকে হিসাবে এনে উৎপাদনমুখী হাতের কাজ বেশি শিখাতে হবে— এ সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নির্ভর। এই সিদ্ধান্তের উপরে শিক্ষাব্যয় ও উৎপাদনশীলতার উপরে শিক্ষার প্রভাব নির্ভর করবে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যবহার কতটা ব্যাপক হবে এবং শিক্ষা প্রদানের বিকল্প নানা পদ্ধতির মধ্যে কোনটি নির্বাচন করা হল, তা শিক্ষা ব্যয়কে অনেকটা প্রভাবিত করে। শিক্ষা প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে শিক্ষামূলক ফিল্ম, ভাষা ল্যাবরেটরী, রেডিও, টেপরেকর্ডার, উন্মুক্ত ও বদ্ধ টেলিভিশন সার্কিট, কম্পিউটার প্রোগ্রাম কৃত শিক্ষা নির্দেশের ব্যবহার, যেখানে শিক্ষার্থী ধাপে ধাপে নিজেই নিজের ভুল সংশোধন করে শিক্ষা লাভ করতে পারে।

বিকল্প সব শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে কোনটি আমাদের জন্য যথাযথ, তা নির্ধারণ করা শিক্ষা পরিকল্পনার একটি কাজ। একথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষা উপকরণে ব্যবহার, এর সংযোজন ও উদ্ভাবন, শিক্ষা লাভের ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিক্ষা ও গবেষণার কাজে যেসব যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তার সঙ্গে শিল্প কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের মূলে কাজ করেছে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও উন্নয়ন, এবং তা প্রথমদিকে ঘটেছে উৎপাদন ও অর্থনৈতিক সাফল্যের কথা ভেবে নয়, উদ্ভাবনী চিন্তা ও অনসন্ধিৎসায়।

এটা এখন স্পষ্ট যে, উন্নয়ন মূলত মানবিক প্রচেষ্টা ও প্রেরণার ফসল। প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থ, শ্রম ও বুদ্ধিকে উন্নয়নের জন্য পরিচালিত করতে হলে শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত ব্যক্তিত্ব চাই। অর্থনৈতিক বলগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে উন্নয়ন ঘটিয়ে দেবে এমন ভাবা যায় না।

একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ এখানে এসে যায়। শিক্ষা পরিকল্পনাকে উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বিত করতে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে জনশক্তি সৃষ্টির মেশিন ভাবার অবকাশ নেই।

শিক্ষা পরিকল্পনাকে যদি বস্তুগত উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ মাত্র রূপ ভাবা হয়, শিক্ষার সৃজনশীল দিকটা অনুক্ত থেকে যায়। সৌভাগ্যক্রমে শিক্ষার পরিকল্পনাকে কখনই এমন সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখা হয় না। শিক্ষা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ব্যক্তি মানুষের প্রতিভা ও সৃজনশীলতার চরম উৎকর্ষ ঘটানো। উন্নয়নের লক্ষ্যগুলো নির্ধারিত হবার পর, প্রধান কাজটি হল, শিক্ষার্থীদের বিশেষ শিক্ষামূলক কাজে উজ্জীবিত করা যা একান্তই মানবিক। এখানে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের প্রবণতাকে বুঝতে হবে ও তাঁদেরকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হবে, তথ্যের আলোকে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রেরণার উৎস রূপে কাজ করতে পারে যেখানে ভবিষ্যতে একটি আকাঙ্ক্ষিত পেশায় প্রবেশের নিশ্চয়তা শিক্ষার্থী দেখতে পায়।

সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, শিক্ষা পরিকল্পনাকে উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সমন্বিত করা। এজন্য দেখতে হবে, শিক্ষার খরচ যেন এত বৃদ্ধি না পায়, যাতে উন্নয়নের অন্যান্য দিক বাধাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে উন্নয়নের জন্য যে জনশক্তি ও বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন তার যোগান যেন শিক্ষা ব্যবস্থা দিতে পারে। এই সমন্বয় করতে হলে শিক্ষা বাজেটকে কমাতে হতে পারে অথবা অন্যান্য খাতে খরচ কমাতে হতে পারে। শিক্ষা

www.pathagar.com

খাতে খরচ কমানোর অর্থ হল, শিক্ষা ও বিশেষজ্ঞ নির্ভর উন্নত প্রযুক্তির পরিবর্তে নিম্নমানের প্রযুক্তি গ্রহণ। শিক্ষার সঙ্গে বিভিন্ন স্তর মিলিয়ে যে মিশ্রণ ও নির্বাচিত বিভিন্ন প্রযুক্তির মিশ্রণ— এ দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় একটি জটিল কাজ। ধাপে ধাপে এদের মধ্যেকার অসামঞ্জস্য দূর করাই বাস্তব পথ। অনুন্নত দেশগুলোতে পর্যাপ্ত উপাত্তের অভাব এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টা ও শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশে অস্থিতিশীলতার কারণে, সূক্ষ্ম সমন্বয় এদের মধ্যে সম্ভব হয়ে উঠে না। এক্ষেত্রে সমষ্টি পদ্ধতি অর্থাৎ মোটামাপের হিসাবে শিক্ষাখাতে মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদনের সঙ্গে মিলিয়ে এদের মধ্যেকার সম্পর্ক নির্ধারণ করতে হতে পারে।

বিভিন্ন উন্নয়ন স্তরের সঙ্গে শিক্ষার কাঠামো ও ব্যয়ের যে সম্পর্ক তা বিভিন্ন দেশের অবস্থা তুলনা করে জানা যেতে পারে। অভিজ্ঞতা নির্ভর ও পরিসংখ্যানগত এই তথ্যকে অবশ্যই সংশোধিত হতে হবে, প্রত্যেকটি দেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যাচাই করে। প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার বয়সভিত্তিক বন্টন, ঐতিহ্য ও মানুষের কর্মস্পৃহা এক এক দেশে এক এক রকম হতে পারে, এদের আপাত অর্থনৈতিক অবস্থা এক রকম মনে হলেও। এ জন্যেই আন্তঃদেশীয় তুলনা যেমন অত্যন্ত সহায়ক হতে পারে, তেমনি বিভ্রান্তিমূলকও হতে পারে। প্রয়োজনীয় জনশক্তি নির্ধারণ ও শিক্ষা কাঠামো পরিকল্পনায় বিভিন্ন যে সব পদ্ধতির কথা আলোচিত হয়েছে, তাদের যথার্থ্য ও প্রয়োগযোগ্যতা যাচাই করার একটি পথ হল, এদের সাহায্যে উপনীত সিদ্ধান্তগুলো কতটা সঙ্গতিপূর্ণ পরস্পরের সঙ্গে, সেটা লক্ষ্য করা।

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তির সংখ্যার বিন্যাস জনসংখ্যার ভিত্তিতে কি হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা যেহেতু উন্নয়নের স্তর দ্বারা নির্ধারিত, কোন দেশের প্রবৃদ্ধির হার থেকে শিক্ষা কাঠামো কি হারে পরিবর্তিত হতে হবে, তার অভিক্ষেপ নিরূপণ করা যেতে পারে। এটি শুধু ন্যূনতম প্রস্তুতি সম্পর্কেই ধারণা দেয়।

প্রফেসর হারবিনসন ও মায়ারস্ তাদের শিক্ষা জনশক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ক গ্রন্থে উন্নয়নের স্তর অনুসারে বিভিন্ন দেশকে চার ভাগে ভাগ করেছেন, যথা— অনুন্নত, আংশিক উন্নত, অর্ধ উন্নত ও উন্নত দেশ। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শিক্ষিত জনশক্তির চাপ নির্ধারণ করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কত ছাত্র ভর্তি হবে? কত শিক্ষক প্রয়োজন হবে? এবং কতজন বিজ্ঞানী, ডাক্তার ও প্রযুক্তিবিদ এবং উচ্চ শিক্ষায় যারা যাবে তাদের কতজন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে এবং কতজন মানবিক শিক্ষা, আইন শিক্ষা, শিল্পকলা বা অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা নেবে? এসবের একটি দিক দর্শন তাঁরা দিয়েছেন।

উন্নয়নের স্তর অনুসারে শিক্ষা কাঠামোর যে চিত্র তাঁরা তুলে ধরেছেন তাতে দেখা যায়, অনুন্নত দেশের অর্থনীতি যেহেতু কোন রকমে টিকে থাকার স্তরে অবস্থান করে, সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের স্বপ্ন দীর্ঘদিন সেখানে পূরিত হতে পারে না। যদিও আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উপরে চাপ সৃষ্টি হয়, প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও উন্নয়ন কর্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের বিশেষজ্ঞ পেতে। বিপুল সংখ্যক স্কুল নির্মাণ এবং সর্বজনীন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অনুপস্থিতিতে, বয়স্ক শিক্ষা ও কৃষি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ গুরুত্ব পেয়ে থাকে। আংশিক উন্নত দেশগুলোতে সর্বজনীন

www.pathagar.com

প্রাথমিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হয় রাজনৈতিক অঙ্গিকাররূপে এবং যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত জনশক্তির যে ক্রান্তিক সমস্যা, তা অতিক্রম করার সংগ্রামে নিয়োজিত থাকে।

উন্নতির মাঝ পথে যে সব দেশ, সেখানে শিক্ষার প্রসার ঘটে দ্রুত এবং সেটা কাজ করে একই সঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের কারণ ও শিক্ষা বিস্তারের ফলরূপে। যেমন, উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন উপলব্ধ হয় ও তাঁদের নিয়োগ করার যোগ্যতা অর্জিত হয়। এটা উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের কারণ রূপে কাজ করে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার প্রসার যথেষ্ট সংখ্যাক শিক্ষক সৃষ্টি করে যখন শিক্ষার প্রসারকে সম্ভব করে তোলে এবং শিক্ষার চাহিদা বৃদ্ধি করে, সেটা হল উচ্চ শিক্ষার ফল থেকে উচ্চ শিক্ষার প্রসার।

শিক্ষার মান উন্নয়ন ও শিক্ষার প্রসারের জন্য যত ভাল পরিকল্পনাই হোক না কেন, তা সার্থক করতে হলে অন্তত প্রয়োজনীয় ন্যূনতম অর্থ চাই। এই অর্থ আসতে পারে সরকার থেকে অথবা জনসাধারণের কাছ থেকে। অবশ্য সরকারের অর্থও জনসাধারণের অর্থ। কিন্তু এক্ষেত্রে যাদের কাছ থেকে সরকার খাজনা আদায় করে এবং যাদের জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হয় তারা এক ব্যক্তি নয়। ফলে, কেন্দ্রীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ দীর্ঘমেয়াদী ও বিস্তৃত পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হতে পারে নৈর্ব্যক্তিকভাবে।

জনসাধারণ যখন নিজেদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করে, সেখানে দৃষ্টি থাকে ব্যক্তিগত রুচি ও লাভক্ষতির দিকে। অবশ্য বেসরকারি শিক্ষা ব্যয়ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও সমষ্টিগত পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে দীর্ঘমেয়াদী ও নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠতে পারে। অনেক জনকল্যাণমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠতে পারে। অর্থ যেভাবেই সংগৃহীত হোক, শিক্ষার অবকাঠামো, শিক্ষার উপকরণ ও শিক্ষকের বেতনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আসতে হবে। একটি সহজ হিসাব এইভাবে করা যেতে পারে—প্রত্যেক বয়স গ্রুপের জন্য যে শিক্ষা খরচ তা হল— সেই বয়স গ্রুপের জনসংখ্যা, এই বয়সের মোট জনসংখ্যার কত অংশ শিক্ষা লাভের জন্য ভর্তি হচ্ছে তার অনুপাত, শিক্ষক ছাত্র অনুপাত ও শিক্ষকের বেতন এই চারটি সংখ্যার গুণফল। এই সংখ্যাকে অবশ্য গুণ করতে হবে মোট খরচের সঙ্গে শিক্ষকের বেতনের অনুপাত দিয়ে। এবার বিভিন্ন বয়স গ্রুপের যে খরচ তার সমষ্টিকরণ করলে মোট শিক্ষা খরচ বের হয়ে আসবে।

শিক্ষাখাতে যে খরচ এটি একটি গাণিতিক হিসাব। তার একটি অংশ হল আবৃত্ত খরচ, অন্যটি এককালীন খরচ। দক্ষ পরিকল্পনা, অপচয় কমানো, শিক্ষা অবকাঠামোর সুচরম ব্যবহার এবং আধুনিক শিক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহার করে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের অবদান অনেকের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে, শিক্ষা ব্যয় কমাবার একটি পথ। প্রাসঙ্গিক পাঠ্যসূচি ও উন্নত শিক্ষা পদ্ধতি নির্বাচন এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা শিক্ষার্থীর মেধার স্ফূরণ ঘটিয়ে তাকে সৃজনশীল করে গড়ে তুলতে পারে।

শিক্ষার খরচ নির্ধারণের সময় শিক্ষার্থী যে আয় থেকে বঞ্চিত হল শিক্ষা লাভের সময়, সেটাও হিসাবে আনতে হবে। অবশ্য আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, শিক্ষার সবগুলো দিক টাকার মূল্যে নির্ধারণ করা যাবে না। যেখানে শিক্ষিত বেকার রয়েছে,

www.pathagar.com

যাদের কাজে লাগানো যাচ্ছে না, তাদেরকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করলে যে খরচ হল সেটা প্রকৃত ব্যয় নয়। একই কথা প্রযোজ্য সেই সব শিক্ষার আয়োজনের ক্ষেত্রে, যেখানে অব্যবহৃত সম্পদ ও জনশক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। বস্তুত এই আয়োজন যদি একটি উদ্দীপনা ও আনন্দের আবহে সংঘটিত হয়, তা হলে জাতি যে হতাশা ও জড়তা কাটিয়ে উঠে, তার মূল্য অনেক। জ্ঞান যেখানে উপভোগ্য ও আনন্দের হয়ে উঠে—এর আহরণ সঞ্চারণ ও উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায়, সেখানে তা নিজেই নিজের লক্ষ্য। বাহ্যিক ফললাভের হিসাব সেখানে প্রয়োজন হয় না। শিল্পায়ন ও উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার পারস্পরিক সম্পর্ক আমরা নির্ধারণ করতে চেয়েছি। শিক্ষা অবশ্যই বস্তুগত উৎপাদনকে সাহায্য করে, কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বড় অদৃশ্য উৎপাদন হল জ্ঞান— অভিনব ও অশেষ।

www.pathagar.com

শিক্ষার জৈব ভিত্তি

মানুষ সম্পর্কে সবচাইতে যা আকর্ষণীয় ব্যাপার তা হল তার নিজেকে বদলাবার ক্ষমতা অর্থাৎ শিক্ষালাভের ক্ষমতা। শিক্ষা মানুষকে রূপান্তরিত করে অন্তর্গতভাবে–অভিজ্ঞানে, মূল্যবোধে, বুদ্ধির বিকাশে, রুচি সৃষ্টিতে, বিশ্বজগতের ধারণা লাভে। এই অন্তর্গত রূপান্তর অবশ্য ঘটে বাহ্যিক জগতের প্রভাবে– এর ঘটনামালার অভিঘাতে, অভিজ্ঞতায়, তথ্যে।

শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষ অবশ্যই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, যার কল্যাণে বাইরের ঘটনামালা ও পরিবর্তী পরিবেশে তার প্রতিক্রিয়া, শিক্ষাবঞ্চিত একজন মানুষের তুলনায় ভিন্ন হয়ে পড়ে। প্রতিক্রিয়া বা আচরণের এই ভিন্নতা থেকে শিক্ষার প্রভাবের পরিমাপটাও আমরা পরিমাপ করতে পারি। অবশ্য আচরণের এই পার্থক্য মঙ্গলকর হল অথবা অমঙ্গলকর সেটা নির্ধারণ করবে শিক্ষার গুণগত মান, এবং সেটা সামাজিক মূল্যবোধনির্ভর। কিন্তু ভাল হোক, মন্দ হোক, একজন শিক্ষিত মানুষের প্রতিক্রিয়ার ভিন্নতা তার শিক্ষালাভের পরিমাণগত পরিমাপ।

যে কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় বস্তুর সঙ্গে পরিবর্তনের নিমিত্তের মিথস্ক্রিয়া ঘটে। কতটা দ্রুততার সঙ্গে ও দক্ষতায় এই পরিবর্তন সাধিত হবে তা স্বভাবতই নির্ধারিত পরিবর্তনীয় বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও সেই সঙ্গে পরিবর্তন সাধনকারী নিমিত্তের যথার্থতায়।

স্মরণীয় যে, ভূমিষ্ট হবার পরমুহূর্ত থেকে–বস্তুত তারও আগে, মাতৃগর্ভেই বাহ্যিক ঘটনামালা ও পরিবেশ মানব শিশুর উপর প্রভাব রাখতে শুরু করে এবং প্রতিটি শিশুকে ভিন্নতা দেয়। প্রভাব বিস্তারী বা মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টিকারী অসংখ্য ছোটবড় ঘটনার যে প্রবাহ, তার যেটুকু আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সেটুকু আমাদের শিক্ষা দেবার ক্ষমতার অন্তর্গত। কিন্তু ব্যক্তি মানুষ, অথবা ব্যাপক অর্থে মানব প্রজাতিও, কতটা শিক্ষালাভের যোগ্য তা স্বভাবতঃই নির্ভর করছে তার স্নায়ুতন্ত্রের গঠন, তার মস্তিস্ক, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা-সব কিছু মিলে তার যে জৈব ভিত্তি, তার উপরে। দীর্ঘ দিন ধরে তত্ত্ব, দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটি নিয়ে তুমুল বিতর্কের ঝড় প্রত্যক্ষ করেছি আমরা তা হল–শিক্ষার্থীর জন্মগত প্রকৃতি অথবা তাকে লালন করবার প্রক্রিয়া–কোনটি বেশি প্রভাব রাখে তার বিকাশে? আমরা পরে লক্ষ্য করব–জীববিদ্যার অগ্রগতি এবং মানুষের

www.pathagar.com

মস্তিষ্কের ক্রিয়া সম্পর্কে উদঘাটিত নতুন জ্ঞান, সেই সঙ্গে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের অধিকতর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি, এই বিতর্কের গুরুত্বকে স্তিমিত করেছে বহুলাংশে।

জন্মগত প্রকৃতি ও লালন প্রক্রিয়া, অর্থাৎ জৈব ভিত্তি ও পরিবেশ, এ দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য-দেয়াল তা স্পষ্ট করে এখন আর সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। ব্যক্তি মানুষ তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় লিপ্ত। কিন্তু ব্যাপারটি দুধের মধ্যে পিঠা ভিজাবার মতন সরল ঘটনা নয়, যান্ত্রিকও নয়। আমরা লক্ষ্য করব– একটি জটিল, পরিবর্তী ও বহুমাত্রিক আদান-প্রদান ঘটছে ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে। ব্যক্তি এখানে তার জীনের সমাবেশের দ্বারা রাসায়নিকভাবে, অথবা পরমাণুর সুনির্দিষ্ট বিন্যাসে পূর্ব নির্ধারিত বা সংজ্ঞায়িত নয়, যেখানে তার ভবিষ্যতের বিকাশ অপরিবর্তনীয় নকশায় জন্ম থেকেই আঁকা হয়ে আছে।

প্রতি মুহূর্তে যে সমগ্রতা নিয়ে একটি ব্যক্তি মানুষ বাহ্যিক ইঙ্গিত বা অভিঘাতের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটাতে প্রস্তুত, তার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই জন্মগত নয়, বরং এই বিশিষ্টতা গতিশীলভাবে ক্রমাগত তার অভিজ্ঞতা বা পরিবেশ দ্বারা আবিষ্ট। তার মধ্যে, আজকের পরিবেশ যে বৈশিষ্ট্য সংযোজন করল ব্যক্তিত্বোতাকে পরিবেশের প্রভাব বলতে পারি আজকের হিসাবে। কিন্তু আগামীকাল এই প্রভাবের ফসল ব্যক্তিত্বের অংশ হয়ে পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটাবে। আবার একজন ব্যক্তির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো সমন্বিত হয়ে আছে, তার সবগুলো উপাদান একই সঙ্গে সক্রিয় নাও হতে পারে। বিশেষ অবস্থায়, পরিবেশের ভিন্নতার কারণে, এক একটি বৈশিষ্ট্য সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, আবার অন্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে। পরিবেশ তা হলে, তার নানা উপাদান নিয়ে উত্তেজক হিসাবে কাজ করছে প্রতিক্রিয়াসাধ্য নানা বৈশিষ্ট্যের উপরে।

ব্যক্তি মানুষকে আমরা ভাবতে পারি নানা বৈশিষ্ট্যের তৈরী এক একটি জটিল ব্যবস্থা – যার কিছু কিছু উপাদান কখনো সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে, কখনো বা নিষ্ক্রিয়। পরিবেশ ব্যক্তির উপরে কেমন সব উপাদান নিয়ে অভিঘাত আনবে, তার উপরে নির্ভর করে, এক সম্ভাবনার নিয়মে, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের অভিব্যক্তি ঘটছে। এখানে পরিবেশ বলতে বুঝাতে চাই– কোন এক মুহূর্তে নিজেকে বাদ দিয়ে বাকী যে জগৎ, যা প্রভাব রাখতে সক্ষম, তার সবটাই।

শিক্ষা তাহলে ব্যক্তির সঙ্গে তার পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ায় সংঘটিত একটি জটিল প্রতিভাস। শিক্ষালাভের ব্যাপারটিকে স্ফটিকের ডানা বাঁধার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। দ্রবণের মধ্যে যখন একটি কেলাসিত চিনির দানা বৃদ্ধি পায় তখন একটি জটিল প্রক্রিয়া চলতে থাকে। পানির মধ্যে দ্রবীভূত অবস্থায় চিনির অণুগুলো ছুটাছুটি করছে উত্তাপের কারণে। কখনো কোন অণু হয়তো বিন্যস্ত অন্য কোন অণুর, খুব কাছে এসে যাচ্ছে কেলাসের মধ্যে ফলে, সুনির্দিষ্ট বিন্যাসের অংশরূপে তা যুক্ত হয়ে পড়ছে, কেলাসের সঙ্গে, এবং কেলাসের অবয়ব বৃদ্ধি করছে। আবার এমনও হতে পারে যে, কেলাস থেকে কোন অণু বিযুক্ত হয়ে মিশে গেল দ্রবণের মধ্যে। তখন সেটা পরিবেশ অর্থাৎ দ্রবণের অংশ হয়ে বাড়ছে। সুতরাং যাকে আমরা কেলাস বলছি এবং যাকে বলছি দ্রবণ, এদের মধ্যেকার পার্থক্যটা চিরন্তন নয়। কোন মুহূর্তের হিসাবে অবশ্য বলা যাবে কোন্ চিনির অণুটি কেলাসের অংশ এবং কোন্‌টি দ্রবণের, কিন্তু হিসাবটি স্থায়ী নয়।

www.pathagar.com

একইভাবে আমরা বলতে পারি ব্যক্তি ও সমাজ বা শিক্ষার্থী ও শিক্ষার পরিবেশ একটি গতিশীল প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী দুটো অংশ।

অবশ্যই এই উপমা টানার মধ্যে অত্যধিক সরলীকরণ আছে। বরং মাটিতে ও জলবায়ুর পরিবেশে একটি উদ্ভবের সংবৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে জৈব ও জটিল প্রক্রিয়া চলে – যে রাসায়নিক আদান-প্রদান– শিক্ষালাভের ব্যাপারটি তেমনি অথবা তার চেয়েও সূক্ষ্ম ও জটিল। তবু এই উপমা টানার যে মূল লক্ষ্য তা হল – আমরা যাকে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য বলছি তা একট তাৎক্ষণিক বিচার ; পরিবেশই মূলত তাকে সৃষ্টি করেছে দীর্ঘতর কালের প্রভাবে। আবার যাকে আমরা পরিবেশ বলছি তা অসংখ্য ব্যক্তি মানুষের অবদানের চঞ্চল সংমিশ্রণের যৌথ প্রভাব ও মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠা।

তথ্যের যে জগৎ, ঘটনামালার যে অস্থির প্রবাহ, তার মধ্যে আমরা নিমজ্জিত হয়ে আছি। কোন বিশেষ তথ্যের নিকট উজ্জ্বলতা, কোন ঘটনার আকস্মিক অভিঘাত যখন কোন ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টিতে, চেতনায়, মূল্য-বোধে ও বিশ্ব ধারণায় সম্পৃক্ত হয়ে যায়– তাকে আন্দোলিত ও উদ্ভাসিত করে, তখন তা অন্তর্গত পরিবর্তন আনে তার ব্যক্তিত্বে, আনে স্থায়ী প্রভাব। যে ঘটনা ছিল বাইরের, যে তথ্য ছড়িয়ে ছিল পরিবেশে, তা আত্মস্থ হয়ে অংশ হয়ে উঠে ব্যক্তি মানুষের চরিত্র্যর বৈশিষ্ট্যের। একেই বলছি শিক্ষা। পরম করে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশকে পৃথক করে দেখার অনিবার্যতা নেই যদিও, কিন্তু ঘটনার বিশ্লেষণের জন্য এই দুইধারণার পৃথকীকরণ সহায়ক হতে পারে, প্রতি মুহূর্তের বিচারে।

মানুষের জৈব ভিত্তি তার শিক্ষা–শিক্ষালাভের ক্ষমতাকে শুধু নিয়ন্ত্রণ করে নি, জৈব প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষের প্রচলিত যে ধারণা সেটাও গভীর প্রভাব রেখেছে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক গঠনে। এই ধারণা যদিও প্রায় ক্ষেত্রেই অতিসরলীকৃত ও ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল, তবু সভ্যতার ইতিহাস এক অর্থে মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষের পরিবর্তনশীল ধারণারই ইতিহাস– যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করেছে সমাজ পরিকল্পনায়, একে নিয়ন্ত্রণ ও বদলাবার আকাঙ্ক্ষায়।

মানুষের জৈব প্রকৃতি–তার দেহ, মন, বুদ্ধি ও আবেগ কিভাবে কাজ করে তা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মানুষ জেনেছে অনেক পরে, এবং সেটাও অসম্পূর্ণভাবে। কিন্তু কাল্পনিক, অনুমানভিত্তিক বা স্বজ্ঞামূলক একটি ধারণা প্রতিটি সমাজই লাভ করতে প্রয়াস পেয়েছে– বিশেষ করে সমাজের অধিপতি দার্শনিক ও পণ্ডিত বলে মান্য ব্যক্তিরা।

খ্রীষ্টপূর্ব গ্রীক সভ্যতায়, আমরা লক্ষ্য করব, একটি গতিশীল, অপরিবর্তনীয় সমাজ ও সামাজিক বিন্যাসের প্রতি আস্থা ছিল মানুষের। এর পেছনে কাজ করেছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে জন্মগত পার্থক্যের অবশ্যম্ভাবীতার ধারণা। যেমন, প্লেটো প্রচার করতেন যে, সৃষ্টিকর্তা সমাজের অধিপতিদের মূল্যবান ধাতু সোনা দিয়ে নির্মাণ করেছেন, মধ্যস্তরের মানুষেরা তেমনি নির্মিত রূপা দিয়ে এবং নিচের স্তরের মানুষ লোহা দিয়ে। অ্যারিস্টটল তাঁর 'পলিটিক্স' গ্রন্থে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, মানুষ জন্মগতভাবেই, কিছুসংখ্যক স্বাধীন, কিছুসংখ্যক পরাধীন–ফলে শেষোক্ত মানুষদের জন্য দাসত্ব ও অধীনতা সহজাত। অ্যারিস্টটলের মতন পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের জগতে

www.pathagar.com

প্রভাবশালী ব্যক্তির এই ভ্রান্ত ধারণা শুধু বস্তুগতভাবে নয়, মনস্তাত্ত্বিকভাবেও বন্দীদশা ও আত্মগ্লানির মধ্যে আটকে রেখেছে মানুষকে দীর্ঘদিন ধরে। অত্যন্ত ধীর গতিতে সভ্যতার এক একটি ধাপ অতিক্রমণের অনুষঙ্গরূপে এই ধারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এসেছে এবং প্রতিটি সামাজিক বিপ্লবের আড়ালে কাজ করেছে মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে পরবর্তিত ও নতুন ধারণার উদ্ভব।

যেমন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এলো কুসংস্কার থেকে মুক্ত ও জ্ঞানালোক প্রাপ্তির যুগ। ধর্মীয় আধিপত্য ও অনুশাসন সমগ্র ইউরোপকে পঙ্গু করে রেখেছিল প্রায় দুই সহস্র বছর ধরে অন্ধ বিশ্বাস ও প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণের মন্ত্র পড়িয়ে। দীর্ঘদিন ধরেই অজ্ঞানতার জমাট বাঁধা বরফ গলাবার আয়োজন চলছিল। জ্ঞানের সাধনায় সৃষ্টি হচ্ছিল উত্তাপ, কিন্তু হঠাৎ যেন দশা পরিবর্ত ঘটে গেল। আলোর উদ্ভাস নিয়ে এলো একদল বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ—আদাম স্মীথ, জন লক, ইমানুয়েল কান্ট, ভোলতেয়ার, হিউম, মনটেসক্যু প্রমুখ। গতানুগতিক ধারণার পরিবর্তে নতুন ধারণা নিয়ে এলেন এঁরা বিশ্বজগৎ সম্পর্কে, মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁরা প্রবেশ করলেন। ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে নতুন আলোকে যাচাই করা হল। জ্ঞান সাধনা ও প্রশ্ন উত্থাপনের এই নব জাগরণ মানুষের সঙ্গে মানুষের জন্মগত পার্থক্যের ধারণাকে স্তিমিত করল, যদিও নির্মূল করল না। কারণ, সমাজের উচ্চ আসনে অবস্থান করছিল যারা, তারা আপন স্বার্থেই কুলজি ও বংশ পরিচয়ের প্রশ্নকে বড় করে দেখার প্রয়াস পেল।

কিন্তু এই সংঘাতের ভিতর দিয়েও ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমতার দাবি উপস্থাপিত হল। সৌন্দর্যচেতনার, আত্মবিশ্বাসের ও জ্ঞানের নতুন আলো, দীর্ঘ দিনের বেড়ে উঠা অন্ধকারের দেয়াল, ভয়ের দেয়াল, আত্মগ্লানি ও আত্মপরিচয়হীনতার দেয়াল অতিক্রম করে উদ্ভাসিত করল মানুষকে। ব্যাপারটি সহজ ছিল না ; কারণ ক্ষমতার আধিপত্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থ যৌক্তিক ভাবনা, স্বাধীন চিন্তা ও নিরপেক্ষ জ্ঞান সাধনার পথে বাধা সৃষ্টি করবেই। যেমন, কাউন্ট ডী গ্যাবিনিউ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এসেও প্রচুর কাঠ-খড় পুড়িয়েছেন এবং আর্য-শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য অনেক শক্তি ও সময় ব্যয় করেছেন। দক্ষিণ আমেরিকার ক্রীতদাস মালিকেরা তাঁর গ্রন্থকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে প্রয়াসও পেয়েছে ক্রীতদাস প্রথা বিলুপ্তির বিরুদ্ধে।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে আর এক বিপ্লব সংঘটিত হল। শিল্প বিপ্লবের ফসলরূপে ইউরোপের মানুষের নতুন সামাজিক বিন্যাস ঘটল। বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্য উদঘাটন করে বিশ্বজগতে মানুষের অবস্থান এবং তার জৈব ভিত্তি আবিষ্কার করল। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব মানুষকে স্বাধীনতা দিল অনেকটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে নিজেকে দেখার। এখানেও অবশ্য নতুন ধারণার গ্রহণ-প্রবণতা সামাজিক পরিবেশ নিরপেক্ষ ছিল না। শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ, ঝুঁকি ও প্রতিযোগিতার যে পরিবেশ কাজ করছিল এই সময়ে, তার পটভূমিতে, ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের মধ্যে "প্রতিযোগিতা", "যোগ্যতরের টিকে থাকা" এসব ধারণা অনেকের জন্যই আপন স্বার্থের অনুকূল মনে হয়েছিল। অবশ্য গভীর বিশ্লেষণে দেখা যাবে, অনেক অপপ্রয়োগ ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা সমাজপতিরা ব্যবহার করেছেন এক্ষেত্রে, বোধগম্য কারণেই। এই

www.pathagar.com

সময়ে মনোবিজ্ঞান এর অধিবিদ্যালমূলক ভিত্তি থেকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের পরীক্ষাভিত্তিক বৈশিষ্ট্য লাভ করতে প্রয়াসী হল। গ্যালটন তো মনোবিজ্ঞানে ডারউইনের তত্ত্বের অপপ্রয়োগে এমন এক শ্রেষ্ট জাতির কথা কল্পনা করলেন, যারা তাদের উন্নত ভাবনা দিয়ে সামাজিক অগ্রগতি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে, এবং তাঁর এই ধারণাকে যাচাই করার জন্য কুলজি বা বংশ পরিচয় ঘাঁটলেন বিখ্যাত ব্যক্তিদের। এ সমস্তই শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষা-পরিকল্পনার উপরে গভীর প্রভাব রাখল।

প্রাণিবিজ্ঞানের অগ্রগতি, সমাজ-বিজ্ঞানের বিকাশ ও শিক্ষাতত্ত্বের গভীরতর বিশ্লেষণ পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে অনেকভাবে। ফলে, জন্মগত বৈশিষ্ট্য অথবা বাহ্যিক পরিবেশ, প্রকৃতি অথবা প্রতিপালন এর কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার সাফল্যের পেছনে, সে প্রশ্নকে নতুন আলোকে যাচাই করা এখন অনেক বেশি সম্ভব। একটি অসুবিধাই এখানে প্রচণ্ডভাবে দেখা যাবে তা হল, প্রতিটি ব্যবহৃত পুরানো শব্দের মধ্যে প্রাচীন ধারণা ও ভ্রান্ত অর্থের যে সংযোগ, যে গন্ধ লুকানো আছে, তা থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন। শিক্ষার প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা সহজাত গুণ বলতে কি বুঝায়? আধুনিক প্রাণিবিদ্যার আলোকে কিভাবে এর বিকাশ ঘটে জীন ও পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ায়? সেই আলোচনায় ভুল বুঝাবুঝির ঝুঁকি তাই থেকে যায়।

রেনেসাঁসের কালে প্রাণিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি হলেও একটি অপরিবর্তনীয়তার ধারণা এখানে বিদ্যমান ছিল। যার উৎস সেই গ্রীক দর্শনের চিরন্তনতায় সম্ভবত নিহিত। প্রাণিবিদ্যার অভিব্যক্তি, বিশেষ করে শারীরবৃত্তির অভিনব অগ্রগতি, এই উপলব্ধি সম্ভব করেছে যে, বস্তুর অতিশৃঙ্খলিত একরূপ প্রাণীর বৈশিষ্ট্য ও আচরণকে সংরক্ষণ এবং একই সঙ্গে এর বিকাশকে সম্ভব করেছে। এজন্য প্রাণিবিদ্যাকে গতিশীল করতে হয়েছে, আগের স্থির অবস্থা থেকে। প্রাণীবিদ্যার স্থির অবস্থা বলতে বুঝাচ্ছি রেনেসাঁস যুগের সেই ধারণা, যেখানে ডিম্বাণু বা ভ্রূণের পূর্ণতাপ্রাপ্তির অর্থ এর মধ্যে ক্ষুদ্র আকারে যে প্রাণীটি ধারণ করা আছে সেটাই শুধু বড় হয়ে উঠা, সুনির্দিষ্ট পূর্বনির্ধারিত পথে।

গতিশীল প্রাণিবিদ্যার ধারণায় প্রাণী একটি নিষ্ক্রিয় কায়া নয়, একটি সক্রিয় ব্যবস্থা, যা পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায়, পারস্পরিক প্রভাবে বিকাশ লাভ করে, সম্ভাব্য অসংখ্য পথের ভিতর থেকে পথ বেছে বেছে, পূর্বনির্ধারিত অনিবার্য একক পথে নয়, যেমনটি আগে ভাবা হতো। প্রতিটি ভ্রূণই অবশ্য জীনের সুনির্দিষ্ট মিশ্রণের কারণে অনন্য। কারণ, মা-বাবার জীনসমূহ থেকে অতি বিপুল সংখ্যক সম্ভাব্য নির্বাচন বা পৃথক পৃথক সমবায়ের নির্দিষ্ট একটি সমবায় লাভ করে প্রতিটি সন্তান। ফলে, জমজ ছাড়া প্রতিটি সন্তানই জীন সমবায়ের বিচারে অনন্য। জীন অবশ্য পরমাণুর এক একটি রাসায়নিক বিন্যাস ছাড়া কিছু নয়, যার প্রতিটি বিশেষ ধরনের প্রোটিন উৎপাদন করতে সক্ষম। প্রতিটি ব্যক্তি জীনের যে অনন্য সেট লাভ করে জন্মের সময়, তাকে বলা হয় জেনোটাইপ (genotype), আমরা একে জীন সমাবেশ বলতে পারি। এক একটি জীন-সমাবেশ বা জীনের সেট নিয়ে জন্মগ্রহণকারী যে প্রাণীবিশেষ, তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও আচরণকে একত্রে বলা হয় ফেনোটাইপ (phenotype), আমরা একে ব্যক্তিত্ব বলতে পারি। ব্যক্তিত্বের এই বিকাশকে ভালভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কারণ, জীন-

www.pathagar.com

সমাবেশের সঙ্গে আনুষঙ্গিক ব্যক্তিত্বের যে সম্পর্ক, সেখানে অনিয়শ্চতা কাজ করে, অর্থাৎ একই জীন সমাবেশ নিয়েও পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ার কারণে ভিন্ন ব্যক্তিত্ব বিকাশলাভ করতে পারে।

এটি সম্ভব এই জন্য যে, যদিও প্রতিটি জীন বিশেষ ধরনের প্রোটিন নির্মাণ করতে সক্ষম, বাস্তবে সবগুলো জীন একত্রে সক্রিয় হয় না। জিনগুলো ক্রমাগতভাবে কখনো সক্রিয় হচ্ছে কখনো নিষ্ক্রিয় থাকছে। কোন কোন জীন খুব অল্প সময়ের জন্য সক্রিয় থেকে দীর্ঘ সময় ধরে হয়তো নিষ্ক্রিয় থাকল। কোন জীন হয়তো জীবনভর কাজ করল। পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, কেবল জীনকে সক্রিয় করতে অথবা নিষ্ক্রিয় রাখতে।

এখানে পরিবেশ বলতে শুধু বাহ্যিক ঘটনামালা বুঝায় না, বরং কোন জীন দ্বারা তৈরী যে রাসায়নিক বস্তু যা অন্য জীনকে সক্রিয় করছে অথবা নিষ্ক্রিয়, সেটাকেও আমরা পরিবেশের মধ্যে ধরব। পরিবেশের এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার অর্থ অবশ্য ল্যামার্কের মতবাদকে সমর্থন করা নয়। কারণ, এখন পর্যন্ত অর্জিত বৈশিষ্ট্য, বংশানুক্রমিকভাবে সঞ্চারণের দৃষ্টান্ত মেলে নি। পরিবেশ জীনের বস্তুতে কোন পরিবর্তন আনে না। পরিবেশ বিকাশের উপরে প্রভাব বিস্তার করে জীনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় হওয়ার হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবেশ তাই কোন সহজ ধারণা নয়, কোন একক ব্যাপার নয়, যা নির্বিঘ্নে প্রয়োগ করা যেতে পারে সুনির্দিষ্ট ফলের প্রত্যাশায়। প্রাণীর উপরে বাহ্যিক প্রভাব এবং অভ্যন্তরীণ প্রভাবের মধ্যে পার্থক্য করাও সম্ভব নয়। বিশেষ করে জন্ম-পূর্ব অবস্থায় পরিবেশের প্রভাব অনেক সময়েই জেনেটিক প্রভাবরূপে গ্রাহ্য হবার সম্ভাবনা পায়। কোন বিশেষ জীনের কোন একটি মুহূর্তের প্রভাবের পরিবর্তে অনেকগুলা জীনের যৌথ প্রভাবের ব্যাপার যখন বিচার করা যায়, এবং সেটা বিস্তৃত স্থান-কালের মধ্যে, তখন পরিবেশ জটিল, পরিবর্তী ও গতিশীলভাবে কাজ করে ব্যক্তিত্বের উপরে।

জৈব ব্যবস্থা যে স্থিতিশীলতা নিয়ে বিশৃঙ্খল পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে ও উপযোগিতা লাভে সক্ষম, তার কারণও নিহিত এই জটিল অন্তর্গতভাবে গতিশীল অবিরাম মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে।

ব্যক্তি বিশেষের যে বৈশিষ্ট্যগুলো সামাজিকভাবে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তার অধিকাংশই অনেকগুলো জীনের সমবায়ে মিথস্ক্রিয়া ও প্রভাবের ফসল। এই প্রক্রিয়া মস্তিষ্কের বিকাশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কারণ, মানব দেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল এই অংশ অনেক সংখ্যক জীনের সেট দ্বারা প্রভাবিত। মস্তিষ্কের বিকাশের যে পরিবেশ এর ফলে সৃষ্টি হয়, তা অবিশ্বাস্যরকম জটিল এক ধাত্র–মিথস্ক্রিয়ার ও প্রভাবিত করার। এই বিশ্লেষণ অনুসারে, যাকে আমরা জেনোটাইপ বা ব্যক্তির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলছি, তা নিজেই অবদান রাখছে পরিবেশে, গতিশীল জটিল মিথস্ক্রিয়ায়। এর বিকাশ ঘটছে অনির্ধারিত পথে। চরম ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, একই জেনোটাইপ থেকে দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন ফেনোটাইপ বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটল, অথবা দুই ভিন্ন জেনোটাইপ থেকে বিকাশ ঘটল অভিন্ন ফেনোটাইপ বা ব্যক্তিত্বের।

www.pathagar.com

অবশ্য প্রতিটি জীনের বৈশিষ্ট্য ও প্রতিক্রিয়া পৃথক পৃথকভাবে জানার চেষ্টা চলছে না, এবং তা যে মোটেই সফল হয়নি. তা নয়। কিন্তু সেটা শুধু রোগ সংক্রান্ত বা অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু মস্তিষ্কের বিকাশ বা শিক্ষালাভের মতন জটিল ও ব্যাপক যে পরিবর্তন, সেখানে জীন ও বাহ্যিক পরিবেশ অর্থাৎ জন্মগত প্রকৃতি ও প্রতিপালন বিধি—এই দুই পৃথক এলাকার কথা বলা যায় না। বিকাশের কারণ রূপে জীন ও পরিবেশের প্রভাবকে পৃথক করার যে গাণিতিক কৌশল ও হাতিয়ার তা সফলভাবে প্রয়োগ করতে হলে এমন কিছু ঘটনা থেকে উপাত্ত গ্রহণ করতে হবে, যেখানে জীনের প্রভাব আছে, পরিবেশের নেই, অথবা তার বিপরীত—অন্তত এমন কিছু অবস্থা চাই, যেখানে একটির প্রভাবকে উপেক্ষা করা যায়।

আরো একটি ব্যাপার আমাদের এই সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে, তা হল—ব্যক্তি-মানুষের শিক্ষা ও দক্ষতালাভের প্রশ্ন শুধু নয়, একটি মানবগোষ্ঠীর বিকাশ, পরিবর্তী পরিবেশে টিকে থাকার শক্তি অর্জনের কথা আমাদের ভাবতে হবে। এখানে উন্নয়ন ও যোগ্যতা অর্জনকে যাচই করতে হবে উচ্চতর এক স্তরে, ব্যাপকতর এক ব্যবস্থায়। ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বিন্যস্ত জীনসমূহের আচরণ ও মিথস্ক্রিয়া নয়, সমগ্র মানবগোষ্ঠীর মিলিত যে জীন পুল, এদের যে মিথস্ক্রিয়া—সেটাই হিসেব করতে হবে। এখানে পরম সার্থক বলে, দক্ষ বলে একজন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা বা তৈরি করার কোন অবকাশ নেই। বিপুল জীন পুলের মধ্যে যে মিথস্ক্রিয়া ঘটছে। জটিল, গতিশীল, মিশ্রণ ঘটছে অজস্র, জন্ম নিচ্ছে বিভিন্ন জীন-সমাবেশ—সেখানে বৈচিত্র্য শুধু অনিবার্য নয়, কাম্য-টিকে থাকার প্রয়োজনে, বিরূপ অনিশ্চিত পরিবেশের মোকাবেলা করতে।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখাতে চেয়েছি যে, জন্মগতভাবে যোগ্য বা দক্ষ বলে ব্যক্তিবিশেষকে চিহ্নিত করা কতটা অর্থহীন ও বিপজ্জনক, এবং জীন ও পরিবেশ এই দুই কারণে পৃথকীকরণ কতটা অবাস্তব— বিশেষ করে শিক্ষার মতন জটিল ও ব্যাপক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে।

প্রতিটি প্রজাতি পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়, পরিবেশকে কিছুটা রূপান্তরিত করে, কিছুটা নিজের মধ্যে আত্মস্থ করে। এবং এর অভিব্যক্তি ঘটতে পারে দেহের অথবা আচরণের, অথবা উভয়ের পরিবর্তনে। এই সমন্বয় ও উপযোগিতাকেই সুশিক্ষা বলতে পারি। মানুষের ক্ষেত্রে এই শিক্ষার মূল ব্যাপারটি ঘটে মানুষের মস্তিষ্কের গঠন ও তার শিক্ষালাভের যে প্রতিভাসে, তা গভীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

প্রতিটি প্রজাতি পরিবর্তনশীল ও বিরূপ পরিবেশে তার টিকে থাকার সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করে অভিযোজন প্রক্রিয়ায়। অর্থাৎ প্রাণীর অঙ্গ সংস্থান, শারীরবৃত্ত ও আচরণে পরিবর্তন সাধন করে। যে প্রজাতির মধ্যে এর অন্তর্গত পার্থক্যের ব্যাপ্তি বেশি, তার টিকে থাকার সম্ভাবনাও বেশি, পরিবর্তনশীল পরিবেশে। লক্ষণীয়, একটি প্রজাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার জন্য যেমন সুনির্দিষ্ট জেনেটিক গঠন চাই, তেমনি অভিযোজন প্রক্রিয়ায় টিকে থাকার প্রয়োজনে বিভিন্নতা চাই পরস্পরের মধ্যে। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই বৈশিষ্ট্য পরস্পরবিরোধী। কিন্তু গভীরতর বিশ্লেষণে আমরা দেখব একটির প্রয়োজন বিশুদ্ধ, নির্ভরযোগ্য, অনন্য বৈশিষ্ট্যের জন্য—যাতে কালের

www.pathagar.com

প্রবাহের মধ্যেও একে চেনা যায় ; অন্যটি হলো, ভারসাম্য বা স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য, যাতে ঘটনার প্রবাহের মধ্যেও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। কোন প্রজাতির একটি সদস্যকে সবচেয়ে দক্ষ ও সার্থক বলে হয়তো চিহ্নিত করা সম্ভব স্থান-কালের কোন এক বিন্দুতে, কিন্তু ঘটনার জগতের অন্য এক বিন্দুতে সে হয়তো অযোগ্য, অদক্ষ বলে প্রমাণিত। সুতরাং একটি সদস্য কোন এক মুহূর্তে তার টিকে থাকার দক্ষতার বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করতে পারে শুধু একটি শর্তে, তা হল তার জেনেটিক গঠনকে সুদৃঢ় ও অপরবর্তী একটি সুনির্দিষ্ট রূপ দিয়ে এবং সেই সঙ্গে ভবিষ্যৎ অদক্ষ ও অবলুপ্ত হবার ঝুঁকি নিয়ে। অন্যদিকে জেনেটিক গঠনকে নমনীয় ও সহজে পরিবর্তনশীল করে একটি সদস্য তার টিকে থাকার সম্ভাবনাকে পরিবর্তী অবস্থায় অর্থাৎ দীর্ঘকালের মধ্যে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে যে প্রজাতির সে সদস্য তার বৈশিষ্ট্যকে, এর জৈব গুণাবলীর অনন্য ও বিশুদ্ধরূপকে, বিলুপ্ত করার ঝুঁকি নিয়ে।

প্রাণিজগতে একটি প্রজাতি অদ্ভুত এক কৌশলে অবলুপ্তির এই দুই সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পাবার প্রয়াস পেয়েছে, এবং প্রতিটি সদস্য কালের প্রবাহের মধ্যে হারিয়ে যাবার ঝুঁকি নিয়েও একটি সুদৃঢ় অপরিবর্তী জেনেটিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখছে। অন্যদিকে একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে বিভিন্নতা,কালের প্রবাহের মধ্যে এর টিকে থাকার সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করেছে, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে চরম দক্ষরূপে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনাকে হারিয়ে। প্রাণিজগতে অভিযোজন তাই জটিল ও সূক্ষ্ম এক প্রক্রিয়া। কালের মধ্যে এর প্রক্রিয়াকেই শিক্ষার মূল ব্যাপার বলে চিহ্নিত করতে পারি প্রাণিজগতের জন্য। মানুষ এই প্রাণিজগতের ব্যাপকতর সংজ্ঞারই অন্তর্গত, যদিও আপন বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন ও অনন্য। মানুষের শিক্ষালাভের বৈশিষ্ট্য ও ভিন্নতার মূলে কাজ করছে তার অনন্য মস্তিষ্ক ও সাংস্কৃতিক প্রতিভাস।

মানুষের মস্তিষ্কের সবচাইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশ হল এর সেরিব্রাল করটেক্স বা গুরুমস্তিষ্কের বহিঃস্তর যা মস্তিষ্কের কোষের দুটো পিণ্ডরূপে স্ফীত হয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে এসে আবরণ সৃষ্টি করেছে ভিতরের আদি মস্তিষ্কের উপরে। মানুষের মস্তিষ্কের বড় আয়তনই তার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নয়। মানুষের তুলনায় বড় মস্তিষ্কের প্রাণীও রয়েছে ; যেমন, হাতি বা ডলফিন। এমনকি মস্তিষ্ক ও দেহের অনুপাত মানুষের তুলনায় বেশি এমন প্রাণীও খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কের যা সবচেয়ে অনন্য গুণ তা হল, এর বহিঃস্তরের স্নায়ুকোষগুলোর মধ্যে যে আন্তঃসংযোগ, তা যে কোন প্রাণীর তুলনায় অনেক বেশি। এক একটি নিউরণ দশ সহস্র সংযোগও সৃষ্টি করতে পারে প্রতিবেশী নিউরণগুলোর সঙ্গে। মানুষের নিকটতম আত্মীয় এইপের বেলাতে এই সংখ্যা এক-চতুর্থাংশের মতন। মানুষের মস্তিষ্কের নিউরণগুলোর এই সংযোগশীলতা তাকে তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দিয়েছে সূক্ষ্মতা, জটিলতা ও পার্থক্যযোগ্যতা। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কের নিউরণগুলোর মধ্যে এই প্রচণ্ড সংযোগশীলতা সবচাইতে গভীর ও সুদূরপ্রসারী যে প্রভাব মানুষের উপরে রেখেছে তা হল– এর অভিব্যক্তি ও বিকাশের প্রান্তহীন পথ, সামাজিক জীবন লাভ।

www.pathagar.com

প্রাণীরাও যূথবদ্ধ জীবন যাপন করে, কিন্তু মানুষ সামাজিক ভিন্ন এক অর্থে। মানুষ যে কথা বলতে পারে, বিশুদ্ধ অথবা প্রযুক্তিগত শিল্পের মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করতে পারে, তার যে ভাষা আছে—এ সবই তার অভিব্যক্তি ও অভিশ্রুতির ফসল যা আরোপিত হয়েছে তার জৈব ব্যবস্থার মধ্যে যৌথ জীবন সংগ্রাম ও সাংস্কতিক প্রভাব দ্বারা।

মানুষের দুই পায়ে দাঁড়িয়ে চলা এবং হাতিয়ার নির্মাণের শুরু থেকে মানুষের বিবর্তনের ধাপগুলো কেমনভাবে এসেছে? তা এখনো অনেকটা রহস্যাবৃত। কিন্তু নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণা থেকে যে তথ্য সম্প্রতি লাভ করা গেছে তাতে এটা এখন স্পষ্ট যে, উদ্ভিদভোজী জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিকারী জীবনে উত্তরণ ছিল মানুষের জন্য একটি গুরত্বপূর্ণ ধাপ, একটি ক্রান্তিক ঘটনা, যা তাকে মুক্ত করেছে তার নিকটতম আত্মীয় বানর বা এইপদের বিবর্তনের অন্ধগলিতে আটকে পড়া পশুসুলভ জীবনের ধারা থেকে। শিকারী জীবনের জন্য প্রয়োজন পড়ছে নতুন ধরনের সহযোগিতা, পরস্পরের মধ্যে সূক্ষ্মতর ও ঘনিষ্ঠতর সংযোগ, সমন্বিত জীবন ও যৌথ সিদ্ধান্ত। সেই সঙ্গে প্রয়োজন হয়েছিল শৃঙ্খলা, ধৈর্য, সামাজিক রীতিনীতি ও নিয়ম। এর ফলে মানুষ সমাজের স্বীকৃতি পেতে শুরু করল, সমাজকে সে কতটা দিয়েছে তার ভিত্তিতে—কতটা অন্যের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল তার ভিত্তিতে নয়, যেমনটি ঘটে বেবুনের ক্ষেত্রে। এই সামাজিক দৃষ্টি মানুষকে মুক্ত করল তার সংকীর্ণ জৈব অস্তিত্বের ভাবনা থেকে, কিছুটা ব্যাপকতর ও নৈর্ব্যক্তিক চেতনায়।

এক সময় মনে করা হত, মানুষের বৃহৎ মস্তিষ্ক তার হাতিয়ার নির্মাণ, তার শিকারী জীবন এবং সমাজ সংগঠনের পূর্ব—ঘটনা। অর্থাৎ মানুষের বৃহৎ মস্তিষ্কের জন্যই তার উন্নত জীবন সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি হমিনিড জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হবার ভিতর দিয়ে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আসল ব্যাপারটি ঠিক উল্টো। হাতিয়ার নির্মাণ,গাছ থেকে নেমে এসে সমতল ভূমিতে বসবাস, শিকারী জীবন—এসবই দায়ী মস্তিষ্কের বৃদ্ধি লাভের জন্য। বড় মস্তিষ্ক লাভের পর নতুন উন্নত জীবন মানুষ শুরু করেনি। জীবাশ্মের করোটি গহ্বর থেকে মস্তিষ্কের আয়তন যতটা মাপা সম্ভব হয়েছে তার আলোকে আমরা জানতে পেরেছি যে, হাতিয়ার নির্মাণের পর থেকে হিসাব করলে মানুষের মস্তিষ্ক অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক মানুষের অনন্য যে বৈশিষ্ট্য তা হল তার ছোট হয়ে আসা চোয়াল ও মুখ এবং প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মস্তিষ্ক, যা তার যান্ত্রিক সামাজিক জীবনের প্রভাবের ফসল। এই তথ্য মানুষের শিক্ষালাভের প্রকৃতি ও গুরুত্ব অবধারণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা একথা এখন বলতে পারি যে, মানুষের মস্তিষ্কের বিবর্তনের শেষ ধাপ এসেছে সেই কর্মধারা, হাতিয়ার ব্যবহার ও সামাজিক ব্যবস্থা থেকে, যা মূলত বাহ্যিক, অন্তর্গত নয়, এবং যা একত্রে কাজ করার ভিতর দিয়ে অভিযোজন প্রক্রিয়ায় অর্জিত হয়েছে। এসব শুধু কৃৎকৌশলগত উদ্ভাবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি ; যেমন চাকা, লিভার, গৃহনির্মাণের কৌশল ইত্যাদি, বরং যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতীক ব্যবহার, বিশেষ করে ভাষা সৃষ্টির মতন জটিল উদ্ভাবনের ভিতর দিয়ে পরম অভিব্যক্তি ঘটিয়েছে মস্তিষ্কের। এর সবটাকেই যদি সাংস্কৃতিক বিকাশ বলি তাহলে, সমাজবদ্ধ মানুষের

www.pathagar.com

আচার-আচরণ, নীতিমালা এমনকি রূপকথা, ধর্মীয় বিশ্বাস, কল্পনা এবং যা কিছুতে মানুষ একত্রে অংশ নিয়েছে, সবই মানুষের উপরে এক প্রভাব বৃত্তের উপাদানরূপে তাকে রূপান্তরিত করেছে। মানুষের মস্তিষ্কের যা কিছু অনন্যভাবে মানবসুলভ, তা হল, মানুষের সংজ্ঞাবহ ক্রিয়া বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যভাবে লব্ধ বহির্বিশ্বের সঙ্গে এবং ভাবনাকে সমন্বিত করা, এবং তার ব্যবহৃত হাতিয়ার কে তার ভাষা ব্যবস্থার সঙ্গে।

আমেরিকার শিক্ষা-দার্শনিক জন ডিউই এই ধারণার প্রতিই সম্ভবত ইঙ্গিত করেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন যে, মানুষ অন্য সব প্রাণী থেকে ভিন্ন তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল দ্বারা, যা ব্যক্তি মানুষের জৈব আচরণকে সামাজিক আচরণে রূপান্তরিত করে, বুদ্ধিগত মিথস্ক্রিয়ার ভিতর দিয়ে।

শিক্ষা-পদ্ধতি এবং শিক্ষা-দর্শনের কথা বলতে গিয়ে মানুষের মস্তিষ্কের জৈব প্রকৃতি ও বিকাশের ইতিহাস গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হতে হবে। এটা অবধারণ করতে হবে যে, মানুষের শিক্ষা ও আচরণ শেষ বিশ্লেষণে তার ব্যাপকতর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে ভিত্তি করে গড়ে উঠে। অর্থাৎ তার যে অভিযোজন প্রক্রিয়া শিক্ষা ও পরিবর্তনের, তার উৎস তার নিজের বাইরে তার সমাজ বা জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে। মানুষের নিজের মধ্যে কি ঘটছে তা নয়, তাদের পরস্পরের মধ্যে কি ঘটছে সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অন্য সব প্রাণিদের বেলায় যেমন আমরা দেখতে পাই যে, এটা ভিতর থেকে জীনের প্রভাবে বংশানুকৃত বৈশিষ্ট্যের বাহ্যিক বিকাশ ঘটায়, মানুষের বেলায় এই অভিব্যক্তি ঘটে বাইরে থেকে ভিতরে। অর্থাৎ এ্যারিস্টটল যে বলেছিলেন, মানুষ একটি সামাজিক প্রাণি সে কথা আধুনিক জীববিজ্ঞানের আলোকে গভীরতর অর্থে সত্য।

মানুষের বেলায় জেনেটিক পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু যেহেতু তা বোধগম্য নয়, অন্তত সেই স্তরে যা নিয়ন্ত্রণসাধ্য, অন্যদিকে সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপকতর– সংস্কৃতির গুরুত্ব অনুধাবন তাই বেশি প্রয়োজন। শিক্ষা শুধু ব্যক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি, বুদ্ধির বিকাশ বা সাফল্য বুঝায় না, শিক্ষাকে যাচাই করতে হবে সমগ্র সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের যে মিথস্ক্রিয়া ও অভিযোজন ও দলগতভাবে টিকে থাকবার ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করবার শক্তিলাভ— তার বিচারে। যে অর্থনৈতিক, ভৌত, প্রাকৃতিক ও সামাজিক সমস্যার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গিয়ে মানুষ উদ্ভাবন করেছে হাতিয়ার, যন্ত্র, প্রতীক, ভাষা, মূল্যবোধ– এ সবকিছুর মিলিত প্রভাব সৃষ্টি করে সেই ধাত্র যেখানে ব্যক্তি মানুষ শিক্ষা লাভ করে।

মানুষ তার সমস্ত ব্যক্তিত্ব ও পার্থক্য নিয়েও বিকশিত সংস্কৃতির এক আধার, যার নির্মাণে তার নিজেরও অবদান আছে। একই সঙ্গে মানুষ তাই স্বাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত। স্বাধীন তার নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতায়, নিয়ন্ত্রিত সে সংস্কৃতির প্রভাব বৃত্তের বাইরে নয় বলে। একইভাবে মানুষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সামাজিক। আপন অভিজ্ঞতা ও অনন্য বিকাশের ধারায় সে ব্যক্তি-মানুষ। আবার সমাজের সঙ্গে, ভাষা, মূল্যবোধ, প্রতীক ইত্যাদি একই সঙ্গে ব্যবহার ও উপভোগ করছে বলে সে সামাজিক ও অভিন্ন। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের মধ্যে এই বিপরীত গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলোর যথার্থ বিকাশ ঘটানো।

www.pathagar.com

মানব শিশু-শিক্ষা লাভের প্রতিশ্রুতি নিয়ে যার জন্ম

একটি ভাবনাকে রোপণ কর, তা একটি কর্মে রূপ নিবে। একটি কাজ শুরু কর, তা পরিণত হবে অভ্যাসে। একটি অভ্যাসকে রপ্ত কর তা একটি চরিত্র গঠন করবে। একটি চরিত্র সৃষ্টি কর তা ভাগ্যকে নির্ধারণ করবে। একটি মানব শিশুকে নিয়ে এই কথাগুলো বলেছিলেন একজন দার্শনিক।

শিশুর যখন জন্ম হয় তখন সে থাকে অসহায়, নমনীয় কিন্তু বিপুল সম্ভাবনাময়। তার বিশাল মস্তিষ্ক থাকে প্রায় অলেখা পাণ্ডুলিপির মতন সাদা। সম্পূর্ণ অলেখা বললে ভুল হবে। বাবা মার কাছ থেকে বংশানুক্রমিক কিছু অভিব্যক্তি জীনের ভিতর দিয়ে সে লাভ করে, যা প্রাথমিকভাবে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় ও আত্মরক্ষায় শিশুর জন্য সহায়ক হয়। যেমন, নবজাত শিশু পানি দেখে ভয় পায় না। পানিতে পড়ে গেলে সহজাত প্রবৃত্তিরূপে সে মুখ বন্ধ করে ফেলে, যাতে পানি তার গলা দিয়ে প্রবেশ না করে। পড়ে যেতে নিলে সে হাত বাড়িয়ে কোনো অবলম্বনকে ধরতে চায়, যাকে আমরা প্রতিবর্তী ক্রিয়া বালি। শিশুর তালুর মধ্যে আঙ্গুল বাড়িয়ে দিলে সে তা ধরে ফেলে। নবজাত শিশু শুধু উচ্চ শব্দ ও পতনকে ভয় পায়। ক্ষুধা পেলে সে মায়ের স্তনের দিকে আপনা থেকেই আকৃষ্ট হয়।

কিন্তু আত্মরক্ষাকারী এই প্রাথমিক প্রতিবর্তী ক্রিয়াগুলো তিন মাস বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যেতে থাকে। যেন শিশু বাহ্যিকভাবে শিক্ষা লাভের যোগ্য হবার আগ পর্যন্ত প্রকৃতি তাকে সাময়িকভাবে এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলো ধার দিয়েছিল। এর পর শিশু লাভ করে উপপ্রতিবর্তী ক্রিয়া। যেমন, এই সময় শিশু হামাগুড়ি দিতে বা গড়াতে পারে। ভারসাম্য রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। কিন্তু চার মাসের শিশুকে কোল থেকে নামাতে গেলে সে পা প্রসারিত করে। একে বলা হয় অবতরণ প্যারাসুট। তার শরীরকে সামনের দিকে ঝুকে দিলে সে হাত ও আঙ্গুল প্রসারিত করে, অবতরণের জন্য। একে বলা হয় সম্মুখ প্যারাসুট।

প্রথম এক বছরের মধ্যে শিশুর এই উপপ্রতিবর্তী ক্রিয়া সূক্ষ্মতর ও নিপুণতর হয়ে পড়ে। তার মস্তিষ্কের বিশেষ বিশেষ অংশে এ জন্য রূপান্তর ঘটে। আরো বেশি নিয়ন্ত্রণ তার ইচ্ছানুসারে সে করতে শেখে এক বৎসর হতে না হতেই এবং একটি চায়ের পেয়ালা ধরতে সে শিখে ফেলে। এই উপপ্রতিবর্তী ক্রিয়া অবশ্য শিশুর সচেতন শিক্ষার

www.pathagar.com

ফসল নয়, শিশুর মস্তিষ্কের মধ্যে জন্মগত ভাবেই এই সম্ভাব্য বিকাশ, জীনের নকশায় স্থাপন করা ছিল। ঢেকুর তোলা, হাই তোলা, বমি করা এসবই প্রতিবর্তী ক্রিয়া এবং অনেকটা স্থূল। ক্রমবিকাশমান মানব শিশুর আচরণে এই প্রতিবর্তী ক্রিয়ার দৃষ্টান্তগুলো ব্যতিক্রমমাত্র। তার অধিকাংশ আচরণ, মূলত প্রায় সব আচরণ, তার শিক্ষা লাভের ফল এবং তা সহজাতভাবে অনুশীলন ও পরিবেশের প্রভাবে ঘটে।

বাড়ন্ত শিশুর জন্য প্রতিটি মুহূর্ত শিক্ষা লাভের। প্রতিটি ছোট ঘটনার অভিঘাতই তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির এক জটিল জাল দিয়ে বহির্জগতের ঘটনামালা থেকে অভিজ্ঞতাকে ছেকে নিয়ে শিশু স্মৃতিতে সাজায় এবং ধাপে ধাপে তার উপলব্ধিকে সূক্ষ্ম ও গভীর করে।

সাধারণভাবে আমরা ধরে নেই, পঞ্চ-ইন্দ্রিয় যথা চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বকের সাহায্যে আলো, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শকে আমরা অনুভব করি। নবজাত শিশুর দেহে বিশেষ স্নায়ু থাকে, যা আলো, শব্দ, স্পর্শ, চাপ, তাপ, শীতলতা, ক্ষুধা, পিপাসা, বেদনা, ক্লান্তি এবং অন্যান্য উপলব্ধির দ্বারা উদ্দীপিত হয়। অসংখ্য এসব তথ্য থেকে বাছাই করে নির্বাচিত তথ্যগুলো তার মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। বাইরের পৃথিবী ও শিশুর দেহের ভিতরের নানা তথ্য শিশুর স্নায়ুতন্ত্রের ভিতর দিয়ে বিশ্লেষিত হয়ে নিজকে অবহিত করে ও প্রস্তুত করে তোলে প্রতি মুহূর্তে।

শিশুর জন্মের প্রথম মাসে স্পর্শই তার প্রধান ইন্দ্রিয়ানুভূতি রূপে কাজ করে। এই স্তরে শিশুর দৃষ্টিসীমা খুব সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তিতে এটিই হয়ে উঠে তার প্রধান অবলম্বন বিশ্বজগৎকে জানার। শিশুর মস্তিষ্কে তথ্য পৌছে প্রধানত তিন ধরনের স্নায়ু-প্রান্ত থেকে। এর একটি হল বাহ্যপরিবাহী। দেহের বাইরের জগৎ থেকে আসা নানা তথ্য, যেমন শীতলতা, উষ্ণতা, আলো, শব্দ, মায়ের গায়ের গন্ধ, বাবার হাতের স্পর্শ– এসবই কিন্তু লাভ করে বাহ্য গ্রাহকের সাহায্যে। অন্তর গ্রাহক স্নায়ু- প্রান্ত অর্থাৎ ভিতরের পরিবাহী স্নায়ু শিশুকে তার দেহের ভিতরের তাড়া, যেমন ক্ষুধা বা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে সাহায্য করে। তৃতীয় ধরনের স্নায়ুপ্রান্ত (Proprioceptor) শিশুর অবস্থান বোধ, যেমন হাত, পা ও পরবর্তীতে আঙ্গুলের সূক্ষ্ম চালনা নিয়ন্ত্রণ করে।

শিশুর দেহের ত্বক, যা আবরণ রূপে তাকে পৃথক করে রেখেছে, বাইরের জগৎ থেকে নানা ভৌত সঙ্কেত ও মানসিক উদ্দীপনা শিশুর মস্তিষ্কে পৌছে দেয়। শিশুর দেহকে আবৃত করে, যে সাত সহস্র সংবেদী বাহ্য স্নায়ুপ্রান্ত রয়েছে, তা বাবা-মার আদরের স্পর্শের খবর তাকে জানিয়ে দেয়। শিশু যখন মুষ্ঠি ভরে মায়ের চুল তার হাতের মধ্যে ধারণ করে, অথবা চুমো দেয় মায়ের গালে, তখন উপলব্ধিঘন অনুভূতি তার বাহ্য স্নায়ুপ্রান্ত বেয়ে সঞ্চারিত হয় তার মস্তিষ্কে। অথচ শিশুর কাঁধে হাত রাখলে সে হয়তো সেটা খেয়ালও করবে না। কারণ, সেখানে স্নায়ুপ্রান্তর ঘনত্ব কম।

বেদনাবোধও শিশুর শিক্ষালাভ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। শিশুর কতটা ব্যাথা অনুভব করবে তা নির্ভর করে দেহের কোন অংশ উদ্দীপিত হলো তার উপরে। আমরা হয়তো মনে করে থাকি যে, দেহের যে অংশে স্পর্শের অনভূতি প্রবলতর সেখানে বেদনাবোধও তীব্রতর। কিন্তু সবক্ষেত্রে এমনটি ঘটে না। যেমন, আঙুলের প্রান্ত অত্যন্ত স্পর্শ-সংবেদী, কিন্তু উদর এলাকার তুলনায় এর বেদনা সহ্য করার

www.pathagar.com

ক্ষমতা প্রায় বিশগুণ। আমরা আঙুলের প্রান্ত দিয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সবকিছু পরীক্ষা করতে যে প্রয়াস পাই সেটা এ জন্যেই। অন্যান্য অনুভূতির তুলনায় বেদনাবোধের সঙ্কেত অনেক মন্থর গতিতে সঞ্চারিত হয়। যে স্নায়ুতন্ত্রগুলো পুরু ও বড়, সেগুলো নিয়োজিত মৃদু স্পর্শ বা কম্পনের অনুভূতি সঞ্চারিত করার কাজে। কিন্তু বেদনার অনুভূতি সঞ্চারিত হয় ক্ষুদ্র ও সরু স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে। এ জন্যেই স্পর্শের অনুভূতি সঞ্চারী বৃহদাকার স্নায়ুকে উদ্দীপিত করলে তা কোনো বেদনা সৃষ্টি করে না, শুধু ঘর্ষণের অনুভূতি সৃষ্টি করে। বেদনাবোধ সঞ্চারণের জন্যে নিয়োজিত যে সব ক্ষুদ্রতর স্নায়ু, তাকে সামান্য উদ্দীপিত করলেই আমরা ব্যাথা অনুভব করি। মৃদু স্পর্শ ও বেদনাবোধ এই দুই চরম অনুভূতির মাঝামাঝি অন্য অনুভূতিগুলো নানা মাপের স্নায়ুতন্তর দ্বারা সঞ্চারিত হয় মস্তিষ্কে। আমরা যদি স্পর্শ-স্নায়ুকে আলতো ভাবে উদ্দীপিত করি তা সুড়সুড়ি সৃষ্টি করতে পারে। শিশু এসব অনুভূতিগুলোর মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে ধাপে ধাপে।

শিশুর ত্বকের গ্রাহক-স্নায়ুগুলো যে সংকেতই মস্তিষ্কে প্রেরণ করুক না কেন তা সুষুম্না কাণ্ডের ভিতর দিয়ে সঞ্চায়িত হয় এবং সেই সময় একটি প্রাথমিক বাছাই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে পার হয়। এরপর পুম্পাক্ষ বা থ্যালামাসের দ্বারা চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে। থ্যালামাসকে আমরা প্রধান সম্পাদক রূপে ভাবতে পারি যা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো বাছাই করে, বাকী অপ্রয়োজীয় তথ্যসমূহ বর্জন করে, মস্তিষ্কে প্রেরণের আগে। যেমন, কোনো সঙ্কেত যদি ক্রমাগত আসতেই থাকে তা অপ্রয়োজনীয় রূপে বর্জিত হয়। এ জন্যেই আমরা যে কাপড় পড়ে আছি বা চেয়ারে বসে আছি তা আমরা ভুলে যেতে পারি।

শিশুর বয়স যখন ছয় সপ্তাহ হয় সে তার দুই চোখকে একই সঙ্গে কোনো বস্তুর উপরে নিবদ্ধ করতে পারে। কিন্তু তার দৃষ্টিক্ষেত্র বড়দের তুলনায় তখনও অর্ধেক মাত্র থাকে। এই স্তরে এসেই শিশুর বাইরের জগৎ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠে দৃষ্টি। স্পর্শের মাধ্যমে সবকিছুকে জানায় যে প্রধান প্রাথমিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি, তাকে এই দৃষ্টি প্রতিস্থাপিত করে। দৃষ্টিই যে শিশুর প্রধান অবলম্বন বাইরের জগৎকে গভীর ও ব্যাপকভাবে জানার তার লক্ষণ এই সময়েই স্পষ্ট হয়ে উঠে। অন্য যে কোনো ইন্দ্রিয়ানুভূতির তুলনায় দৃষ্টির জন্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক স্নায়ুকোষ অর্থাৎ মস্তিষ্কের মোট স্নায়ুকোষের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অর্থাত কয়েক বিলিয়ন স্নায়ুকোষ নিয়োজিত হয়।

শিশু যখন তার মায়ের মুখ দেখে হাসে, তখন কি ঘটে তার ছোট মাথার মধ্যে? প্রথমত মায়ের মুখ থেকে আলো এসে তার দুই অক্ষিতারার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে স্নায়ু কোষ ক্যামেরার রন্ধ্রের মতন শিশুর অক্ষিতারা এর প্রবেশ পথকে ছোট-বড় করে আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। চোখের লেন্স চোখের পেছন দিকে অবস্থিত অক্ষিপটে উল্টানো প্রতিবিম্ব ফেলে মায়ের মুখের। অক্ষিপট আসলে মস্তিষ্কেরই একটি বিবর্ধিত অংশ, যেখানে আলোক সংবেদী স্নায়ুকোষগুলো জটিল এক জাল সৃষ্টি করে আছে।

www.pathagar.com

টেলিভিশনের পর্দায় বৈদ্যুতিক সঙ্কেত যেখানে আলোক চিত্র সৃষ্টি করে, অক্ষিপটে ঠিক তার বিপরীত প্রক্রিয়া চলে। আলোর তরঙ্গের যে ছবি এখানে তা রূপান্তরিত হয় তড়িৎ রাসায়নিক সঙ্কেতের চিত্রে। মস্তিষ্কের ভাষা এই সঙ্কেতকেই মাত্র বুঝতে পারে। অক্ষিপটের পর্দা ষাটলক্ষ কোণ ও সাড়ে বার কোটি রড দ্বারা তৈরী। কোণগুলো রং দেখতে পায় এবং রডগুলো শুধু সাদা-কালো বস্তু দেখতে পায় অতন্ত মৃদু আলোতেও।

অক্ষিপট থেকে মস্তিষ্কে তড়িৎরাসায়নিক সঙ্কেতের যে দীর্ঘ যাত্রা তা বেশ জটিল। অক্ষি স্নায়ু সন্ধিতে দুই চোখের ভিতর দিয়ে আসা আলো সংমিশ্রিত হয়ে থ্যালামাসে অর্থাৎ মস্তিষ্কের মধ্যস্থলের সন্নিকটে অবস্থিত স্নায়ুকেন্দ্রে চলে যায়। এরপর আলোর স্নায়ুর বিস্তারের ভিতর দিয়ে আলোক মস্তিষ্কবস্কল (Visualcetex) এ এই সঙ্কেত পৌছে যায়, যার অবস্থারন গুরু মস্তিষ্কের দুই অর্ধগোলকের পিছনদিকের প্রান্তে। এইখানে মায়ের মুখের বিভিন্ন অংশকে আলাদা করা হয় তাকে চেনার জন্যে। বিভিন্ন অংশকে আলাদা করে বিশ্লেষণ করা হয় সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। মায়ের মুখের আদল, তার চোখ, নাক, ঠোঁট— সব অংশ আলাদা করে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করে। এই অংশগুলো এবার একত্র করে কাছের দৃষ্টিতে অবধারণের চেষ্টা চলে। হিপোক্যাম্পাস যখন এই সমন্বিত চিত্রকে মস্তিষ্কের স্মৃতি ধরে সংরক্ষিত মায়ের ছবির সঙ্গে মিলাতে সফল হয়, তখনই মাত্র শিশুর মস্তিষ্ক শিশুকে নির্দেশ দেয় এবার তুমি হাস—এ মুখ তোমার মায়ের। এক পলকের মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি ঘটে, কিন্তু দীর্ঘ ও জটিল এক প্রক্রিয়ায়।

শিশুর অন্যান্য ইন্দ্রিয়ানুভূতি, যেমন শব্দ শোনা, ঘ্রাণ নেয়া ও স্বাদ গ্রহণ তার শিক্ষা লাভের প্রতিক্রিয়া রূপে গুরুত্বপূর্ণ হলেও, নবজাত শিশু বাইরের জগৎ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে স্পর্শ ও দৃষ্টিকে যতটা ব্যবহার করে, বাকী ইন্দ্রিয়গুলো তেমন করে না।

শিশুর শ্রবণেন্দ্রিয় যদিও তার জন্মের সময়েই পূর্ণতাপ্রাপ্ত থাকে, কোনো বিশেষ শব্দকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার দক্ষতা অর্জনে তার এক বছরের মতন সময় লেগে যায়। শিশুর স্বাদ গ্রহণের দক্ষতা বস্তুত বড়দের তুলনায় অনেক বেশি। বিপুল সংখ্যক তীক্ষ্ম স্বাদ গ্রহণের কোষ রয়েছে তার জিহ্বায়। ফলে, ক্রিমযুক্ত যে খাবারের স্বাদ বড়রা টের পায়না, শিশু তা পরম তৃপ্তিতে উপভোগ করে। নবজাত শিশুর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও অত্যন্ত তীক্ষ্ম ও পূর্ণতা প্রাপ্ত। ঘ্রাণ গ্রহণের জন্য তার নাকের মধ্যে যে বিশেষ পর্দা রয়েছে তার আয়তন এক বর্গ ইঞ্চির মতন হলেও সেখানে রয়েছে দুই কোটির মতন ঘ্রাণ গ্রহণের স্নায়ুপ্রান্ত। ঘ্রাণজ এই অংশগুলোর মোট ক্ষেত্রফল হিসাব করলে দেখা যাবে তা শিশুর দেহকে আবৃতকারী ত্বকের ক্ষেত্রফলের সমান। শিশুর ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল যে এক আউন্স কস্তুরীর শত কোটি কোটি ভাগের এক ভাগ পর্যন্ত তার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে।

শিশু তার বাহ্যপরিবাহী, যেমন আঙ্গুলের প্রান্ত, অন্তরপরিবাহী, যেমন পাকস্থলী, অবস্থানিক পরিবাহী, যেমন পেশী সেই সঙ্গে আলোক গ্রাহী চোখ, রাসায়নিক স্বাদ গ্রাহী জিহ্বা, গন্ধগ্রাহী নাসিকা ইত্যাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় গ্রাহকের সাহায্যে বিপুল পরিমাণ তথ্যের বর্ষণ ক্রমাগত লাভ করছে নানা সংকেতের মাধ্যমে। শিশুর মস্তিষ্ক এলোমেলো ও বিশৃঙ্খল এসমস্ত সঙ্কেতের জঞ্জালকে বিন্যস্ত করে, সেখান থেকে বোধগম্য তথ্য যে সে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়, সে এক পরম বিস্ময়। মস্তিষ্কে সমস্ত তথ্যই বাছাই, নির্বাচন

www.pathagar.com

ও বর্জন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে পার হয়। তথ্যের গুরুত্বের ভিত্তিতে শিশু তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে এবং প্রয়োজন বোধে নির্বাচিত তথ্য জমা করে রাখে স্মৃতি ধরে, পরবর্তিতে তা ব্যবহার করার জন্যে। এর সবটা মিলেই শিশুর অভিজ্ঞতা অর্জনও শিক্ষা লাভের ব্যাপারটি সংঘটিত হয়। শিশুর মস্তিষ্ক যেমন করে তার ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যরাজী থেকে অর্থ উদ্ধার করে ও প্রতিক্রিয়া দেখায়, তা উপলব্ধি করতে হলে তার মস্তিষ্কের গঠন ও কর্মধারা আমাদের বুঝতে হবে।

শিশু যখন তার মা বা বাবাকে স্পর্শ করে, তখন তার হাতের আঙুলের প্রান্ত উদ্দীপিত হয়। স্পর্শের যে অনুভূতি তা গ্রাহক থেকে স্নায়ুসন্ধি অতিক্রম করে রাসায়নিক সঙ্গেত রূপে স্নায়ুসন্ধি গ্রাহক ও পরবর্তী স্নায়ুকোষকে পৃথক করে রাখে। রাসায়নিক সঙ্কেত একবার স্নায়ুসন্ধি অতিক্রম করার পর বৈদ্যুতিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত হয় এবং কেন্দ্রাভিগ স্নায়ুসূত্রের জালের ভিতর দিয়ে নিউরোনে সঞ্চারিত হয়। নিউরোন হচ্ছে মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্র, যা এক একটি সুইচ বোর্ডের মতন কাজ করে। কেন্দ্রাভিগ স্নায়ুসূত্র ওনসাইড থেকে সঙ্কেত লাভের পর এবং নিজস্ব তড়িৎ সঙ্কেত কেন্দ্রাভিগ স্নায়ুসূত্রের মাধ্যমে পরবর্তী স্নায়ুসন্ধিতে প্রেরণ করে। সেখানে সমস্ত প্রতিক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি ঘটে। কোনো তথ্য মস্তিষ্কে পৌঁছার জন্য এই জটিল প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক থেকে বৈদ্যুতিক এবং পুনরায় বৈদ্যুতিক থেকে রাসায়নিক সঙ্কেতে রূপান্তরিত হবার ও লাফিয়ে লাফিয়ে স্নায়ুসন্ধি পার হবার পৌনঃপুনিক ধারা অনুসরণ করতে হয়। লক্ষ লক্ষ বার এই ধাপ পালিত হয় সেকেন্ডের ভগ্নাংশে। নবজাত শিশুর মস্তিষ্কে পাঁচ সহস্র কোটি থেকে দশ সহস্র কোটি নিউরোন রয়েছে যা সমগ্র দেহ থেকে তথ্য সংগ্রহে উদগ্রীব হয়ে আছে।

মস্তিষ্কে তথ্য প্রেরণ ও সেখান থেকে তথ্য উদ্ধারের প্রক্রিয়া যতই চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর হোক শিশুর শিক্ষা লাভের প্রাথমিক স্তরে, এতেও কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। বৈদ্যুতিক বর্তনীর বেলায় আমরা দেখতে পাই যে সংযোগকারী তারগুলো অন্তরিত থাকে। কোথাও এই অন্তরন না থাকলে ভুল সংযোগ ঘটে এবং যথাস্থানে সঙ্কেত না পৌঁছে বৈদ্যুতিক প্রবাহে গোলযোগ ঘটে। শিশুর জন্মের পর তার স্নায়ুতন্ত্রে কেন্দ্রাভিগ যে সব স্নায়ুসূত্র নিউরোন থেকে তথ্য বহন করে নিয়ে যায় তা যথার্থভাবে অন্তরিত থাকে না এবং যথেষ্ট পুরুভাবে তা গঠিত হবার মতন সময় পায় না। এর ফলে মস্তিষ্কে যে তথ্য প্রেরিত হয় তা পথেই হারিয়ে যায় অথবা গোলযোগ ঘটার ফলে ত্রুটিপূর্ণভাবে পৌঁছে। যেমন, শিশু তার মায়ের মুখ স্পর্শ করবে এমন তথ্য মস্তিষ্কে যাবার কথা। কিন্তু তথ্য গেল যে সে মায়ের নাক স্পর্শ করবে। এর ফলে ও মস্তিষ্ক শিশুকে শিখিয়ে দিল যে তার হাত মায়ের নাক স্পর্শ করবে। কিন্তু কেন্দ্রাভিগ স্নায়ুসূত্র অন্তরিত না হওয়ায় শিশুর হাত হয়তো ভুল নির্দেশ লাভ করে মায়ের চোখে হাত লাগিয়ে দিল।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য শিশু জন্মের পর পরই স্নায়ুতন্ত্র অন্তরিত হতে থাকে। মায়েলিন বা স্নায়ুসূত্রাবরক এই অপরিবাহী আবরণ সৃষ্টি করে, যেমন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির কেবল আবৃত থাকে রাবার বা প্লাস্টিক আবরণে। শিশুর বয়স যতই বাড়তে থাকে তার স্নায়ুসূত্রগুলো নিপুণভাবে অন্তরিত হতে থাকে। এলোমেলো তথ্য প্রেরণ ও আনুষঙ্গিক ব্যতিচার তখন বন্ধ হয়ে যায়। একটি পাঁচ বছরের শিশু তখন নির্ভুলভাবে

www.pathagar.com

একটি চায়ের পেয়ালা ধরতে পারে এবং তা থেকে নিখুঁতভাবে দুধ বা পানি পান করতে পারে। সে কলম বা পেন্সিল ধরতে শেখে। বাজাতে পারে বাদ্যযন্ত্র এবং ছবি আঁকতে পারে। শিশুর স্নায়ুতন্ত্র এমনিভাবে অন্তরিত হবার আগে তার কাছ থেকে এই নিপুণতা আশা করা ঠিক হবে না। অবশ্য দশ বছর বয়স পর্যন্ত এই স্নায়ুসূত্র অন্তরিত হবার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এর ফলে সঙ্কেত দ্রুততর গতিতে নির্ভুলতর পন্থায় সঞ্চারিত হতে পারে। মস্তিষ্ক তখন দক্ষতর হয়ে উঠে এর প্রতিক্রিয়ায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে।

স্নায়ুসূত্র মায়েলিন দ্বারা আবৃত হওয়া একটি পূর্ব নির্দেশিত প্রক্রিয়া মাত্র যা জীনের নকশায় আগে থেকেই প্রোগাম করা থাকে। মানব শিশুর জন্য যা সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও অনন্য তা হল, স্নায়ুকোষগুলোর মধ্যে যে সংযোগ তা নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন করে যুক্ত ও বিযুক্ত হবার ভিতর দিয়ে নতুন ভাবে বিন্যস্ত হয়। অনেক স্নায়ু সংযোগ, যা শিশুর কিছু ধরা বা হাই তোলার মতন অনৈচ্ছিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তা বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেখানে সৃষ্টি হয় নতুন স্নায়ুসন্ধি যা ঐচ্ছিক অঙ্গচালনা নিয়ন্ত্রণ করে।

অভিজ্ঞতার আলোকে শিশুর স্নায়ুতন্ত্রের এই বিবর্তন তাকে নতুন স্বাধীনতা দেয় পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের। এই পরিবর্তনটাই হচ্ছে ক্রান্তিক ঘটনা যা মানব শিশুকে অন্যান্য প্রাণীদের মতন প্রতিবর্তী ক্রিয়ার জগতে আবদ্ধ না রেখে চিন্তার জগতে উত্তীর্ণ করে। মানব শিশুর শিক্ষা লাভের জগৎ হয়ে ওঠে অন্তহীন।

অনৈচ্ছিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী নিউরনের সংযোগ যখন রূপান্তরিত হয় ঐচ্ছিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী নতুন নিউরন সংযোগে, সেই ক্রান্তিক সময়টা শিশুর জন্য বিপজ্জনকও বটে। এমন যদি ঘটে যে, জন্মগতভাবে প্রাপ্ত নিউরন সংযোগ, যা শিশুকে তার ঘুমের মধ্যে মাথা ঘুরাবার প্রতিবর্তী ক্রিয়া প্রদান করে, তা সবেমাত্র বিলুপ্ত হয়েছে; কিন্তু তা এখনো প্রতিস্থাপিত হয়নি ঐচ্ছিক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণকারী নতুন নিউরন সংযোগ দ্বারা, তা হলে সেই শিশু ঘুমের মধ্যে দম আটকে মারা যেতে পারে। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে হঠাৎ একটা বয়সে শিশুর মৃত্যুর হার যে বৃদ্ধি পায় তা এই ক্রান্তি কালকেই প্রমাণ করে। এখানে যে বিষয়টি আমাদের লক্ষ্য করার তা হল মানব শিশু যে মানুষের মতন স্বাধীন ভাবনা ও জ্ঞানার্জনের যোগ্য হয়ে ওঠে তার মূল্য হিসেবেই তাকে এই বিপজ্জনক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করতে হয়। মানব শিশু বাঁচতে পারে শুধু অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষালাভ করে এবং ঐচ্ছিক ক্রিয়ার জন্য নতুন নিউরন সংযোগ সৃষ্টি করে।

নবজাত শিশুর মস্তিষ্ক নবনির্মিত দালানের মতন, যার বৈদ্যুতিক সংযোগগুলো এখনো সম্পন্ন হয়নি। মস্তিষ্ক বল্কলের দুই অর্ধগোলক গঠিত হয়েছে কিন্তু নিউরনের সঙ্গে কেন্দ্রাভিগ ও কেন্দ্রাতিগ স্নায়ুসূত্রগুলা এখনো সংযুক্ত ও অন্তরীত নয় যা তাকে ভাবনা, ভাষা ও মানসিক চেতনা লাভের যোগ্য করে তুলবে। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে উদ্দীপিত হয়ে শিশুর মস্তিষ্ক সম্পন্নতা লাভ করে। মস্তিষ্কের নব যে বহিস্তর যা মানুষের বুদ্ধি ও সৃজনশীলতার উৎস তা তার সঙ্গে আদি মস্তিষ্ককাণ্ড, যা স্তন্যপায়ী প্রাণীর আবেগ ও সহজাত প্রকৃতির উৎস, সংযুক্ত হতে দীর্ঘ এক যুগ সময় প্রায় লেগে যায়।

www.pathagar.com

অর্থাৎ বার বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত মানব শিশু মানুষের মস্তিষ্কের পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে না।

একটি শিশুর ছোটকালের যে আবেগজনিত উদ্দীপনা তা তার মস্তিষ্কের গঠনকে প্রভাবিত করে এবং শিশুর ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করে। একটি শিশু তার প্রয়োজন কেমন করে মিটাবে তা সে অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে শেখে। সে যখন কাঁদে তার বাবা-মা ছুটে আসে। এ সহজ সম্পর্ক থেকে শিশুর মস্তিষ্কে নতুন সংযোগ সৃষ্টি হয়। এখানে শিশুর বেদনা বোধ বা ক্ষুধা হচ্ছে উদ্দীপক এবং তার কান্না হচ্ছে প্রতিক্রিয়া। কান্নার সঙ্গে সাহায্য প্রাপ্তির সহজ সম্পর্কটি যদি শিশু অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে লাভ করে, তার মস্তিষ্ক নিউরন সংযোগ এর ভিত্তিতে সৃষ্টি হবে। কিন্তু শিশু যদি কেঁদে বা হেসে কোন ফল না পায়, তার মস্তিষ্কে কেন্দ্রাভিগ-কেন্দ্রাতিগ স্নায়ুসূত্রের সংযোগ হবে অনেক জটিল ও সূক্ষ্ম। শিশু অভিমান করতে শিখবে, হয়তো মাকে দেখে হাসবে না। কারণ, সে সাহায্য করতে আসেনি বিপদে। অভিজ্ঞতা শিশুকে সূক্ষ্ম জটিল ও নানা সম্ভাবনাময় অনিশ্চিত আচরণে তাকে নিয়ে যাবে এবং এ সবই তার জটিল স্নায়ুসূত্রের সংযোগ জাল সৃষ্টির ভিতর দিয়ে ভৌত রূপ নেবে মস্তিষ্কে।

মায়ের আদর পেয়ে শিশু যখন হাসে, তখন চমৎকার এক ঘটনা ঘটে যায় শিশুর মস্তিষ্কের মধ্যে। তার আদি যে মস্তিষ্ক, যা সে বংশানুক্রমে লাভ করেছে স্তন্যপায়ী প্রাণী হিসেবে এবং যেখানে তার আবেগ ও প্রাণীসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করা আছে, তা সমন্বিত হচ্ছে বুদ্ধি ও চেতনার উৎস রূপ নবলব্ধ মস্তিষ্কবস্কলের সঙ্গে। শিশুর জন্য এটি একটি সহজ প্রাপ্তি হতে পারে। কিন্তু মানব জাতির জন্য এ এক বিরাট উত্তরণ—বুদ্ধির জগতে সীমাহীন অগ্রযাত্রার ও শিক্ষালাভের অসীম সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন।

শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ ঘটার অর্থ হল তার অভিজ্ঞতা স্মৃতি হিসেবে তার মস্তিষ্কে বিধৃত হওয়া। একজন মানব শিশুর যা কিছু আপন বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব তা আসলে তার স্মৃতিতে ধারণকৃত তথ্য ও ঘটনামালারই অপেক্ষক। অবশ্য আমাদের স্মৃতিতে কোনো ঘটনা কেমন করে লিপিবদ্ধ হয় এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে তা কিভাবে প্রভাব রাখে তা নির্দিষ্ট ভাবে জানা সম্ভব হয়নি ; কিন্তু যে টুকুই জানা গেছে তা অপার বিস্ময়ের।

আমরা কেমন করে মনে রাখি ও কেমন করে ভুলে যাই সে সম্পর্কে নানা তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। একটি তত্ত্ব হল আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির ভিতর দিয়ে যেসব তথ্য আমরা পাই তা মস্তিষ্কে পৌঁছার আগে দ্রুত সম্পাদনার ভিতর দিয়ে পার হয়। তাৎক্ষণিক স্মৃতি ধরে কিছু কিছু তথ্য নির্বাচিত হয়ে অস্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয় দশ থেকে তিরিশ সেকেণ্ড পর্যন্ত। এই অস্থায়ী স্মৃতিধর—এলাকা নির্ধারণ করে এই তথ্য নিয়ে এ কি করবে? কিছু কিছু তথ্য এই ক্ষণস্থায়ী স্মৃতি ধরে বার বার আবৃত হয় ; কিছু তথ্য সরাসরি দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিধরে প্রেরিত হয়। প্রায় সব তথ্যকেই পূর্বের সংরক্ষিত তথ্যের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং শ্রেণী বিন্যস্ত করে যথার্থ স্থানে প্রেরিত বা সংরক্ষিত হয়।

কোনো কোনো গবেষকের মতে ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিধর সম্পর্কিত, শব্দ ও বাণী নির্ভর তথ্যের সঙ্গে এবং কিছু স্মৃতি সম্পর্কিত চিত্রকল্প নির্ভর ধারণার সঙ্গে। কোনো টেলিফোন নম্বর যদি মনে রাখতে হয় তা হলে তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে মনের

www.pathagar.com

মধ্যে। তিন ধরনের দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতির কথা আমরা ভাবতে পারি। কেউ হাসলে যে আমরা হাসি–এই আচরণের মূলে কাজ করে উদ্দীপনা ও প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট স্মৃতি। দ্বিতীয় হল ঘটনা-স্মৃতি। চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় যে সব ঘটনা, ছোটবেলার বন্ধুদের সাথে বনভোজন বা ছুটির দিনে মেলামেশার যে স্মৃতি, তা দীর্ঘস্থায়ী রূপে সংরক্ষিত হয় মস্তিষ্কের সামনের উদগতাংশে। তৃতীয় ধরনের স্থায়ী স্মৃতি হল বিমূর্ত ধারণা ও নানা রকম বস্তু সামগ্রীর চেহারার স্মৃতি। এই স্মৃতি হল আসলে মস্তিষ্কের অভিধান।

ঘটনা - স্মৃতির মতন এই বিমূর্ত স্মৃতির পরিমাণ হতে পারে সীমাহীন। আমরা যে বিপুল পরিমাণ তথ্য স্মৃতিতে ধারণ করতে পারি, সেটাই সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার হল, আমরা অত্যন্ত দ্রুত স্মৃতি থেকে তথ্য পুনরুদ্ধার করতে পারি। মস্তিষ্কে কিভাবে তথ্য সাজানো থাকে তা জানা সম্ভব না হলেও কোনো ঘটনার কথা সহজভাবে মনে না পড়লে স্মৃতি থেকে তা উদ্ধার করার কৌশল মানুষ আবিষ্কার করেছে।

আমরা আসলে গুচ্ছ গুচ্ছ ভাবে তথ্যকে মনে রাখি। এই তথ্যগুলো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘটনার সংযোগে। ফলে কোন একটি নাম বা বিশেষ ঘটনা যদি মনে না আসে সেই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য কোনো ঘটনাকে ইঙ্গিত রূপে ব্যবহার করলে পুরো বিষয়টি হয়তো স্মৃতিতে জেগে উঠে। শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটি মনে রাখার মতই গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই আছে যারা অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন ছোট ছোট ব্যাপার ভুলতে পারে না। এদের পক্ষে নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে স্মৃতিকে সাজানো বা বাতিল তথ্য ও ধারণাকে শুদ্ধ ও আধুনিকতর তথ্য ও ধারণার স্থানে প্রতিস্থাপিত করা কঠিন হয়ে উঠে। শিক্ষা যেহেতু একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যেখান তথ্য ও ধারণার ক্রমাগত নবায়ন ও শুদ্ধতর বিন্যাস শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও উপলব্ধির জগৎকে নির্মাণ করে। ভুলতে না পারা মানেই আবর্জনাকে আঁকড়ে থাকা। ভুলে যাই বলে আমরা অনেক সময় দুঃখ করি, কিন্তু মস্তিষ্ক যে নির্বাচন করতে পারে এবং বর্জন ও গ্রহণের ভিতর দিয়ে আমাদের স্মৃতির জগৎকে ক্রমাগত নবায়ন করে, সেটি চমৎকার একটি ব্যাপার।

শিশুর স্মৃতিই তার অভিজ্ঞতাকে জানা ও অজানা বা পরিচিত ও অপরিচিত এই দুই ভাগে পৃথক করে দেখতে শিখায়। বন্ধু ও আগন্তুককে পৃথক করতে পারা যদিও শিশুর শিক্ষা লাভের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, একটি আনুষঙ্গিক বিপদ এর সঙ্গে যুক্ত। শিশুর বয়স যখন আট মাস, তখন সে হঠাৎ করে অপরিচিত সম্পর্কে লাজুক ও অপ্রতিভ হয়ে ওঠে। আধুনিক তত্ত্ব অনুসারে শিশু ক্রমাগত একটি বিশ্বচিত্র আঁকতে থাকে নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে। এই নতুন অঙ্কিত ছবিকে সে মিলিয়ে দেখে তার স্মৃতিতে পূর্বসঞ্চিত বিশ্বচিত্রের সঙ্গে। যেখানে সে গড়মিল ও অপরিচিত কিছু লক্ষ্য করে তখনই সে উদ্বিগ্ন ও অস্বচ্ছন্দ হয়ে উঠে। পরিচিতের সঙ্গে অপরিচিতের, চেনা মুখের সঙ্গে অচেনা মুখের যে পার্থক্যকরণ শিশুর, যার ভিতর দিয়ে সে তার অভিজ্ঞতাকে তার স্মৃতিতে সাজায়, তা শিশুর মনে স্থায়ী সংস্কার সৃষ্টি করতে পারে।

অন্য দেশের, অন্য বর্ণের বা অন্য ধর্মের মানুষকে ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখা সংরক্ষিত বিশ্বচিত্র ও বিশ্বাসের বাইরে সবকিছুকে বিরূপতা ও বিদ্বেষের সঙ্গে বিচার

www.pathagar.com

করা– এক মানসিক জড়তা। শিশুর বড় হবার ভিতর দিয়ে এই জড়তা তার মনকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বর্ণবিদ্বেষী ও সাম্প্রদায়িক করতে পারে। অথচ শিশুর শিক্ষা লাভের প্রক্রিয়ার অনিবার্য অংশ এই জড়তা। কারণ, এই বিপুল ও বিরূপ পৃথিবীতে শিশু নিঃসঙ্গ, নিরস্ত্র ও অনভিজ্ঞ। তার আত্মরক্ষার জন্যেই অতিসাবধানে নতুন অভিজ্ঞতাকে সামান্য সঞ্চিত পুরোনো অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তিতে নির্বাচিত তথ্যকে সাজাতে হয় মস্তিষ্কে। মস্তিষ্কে এই ক্রম সঞ্চিত ও বিন্যস্ত তথ্যই সৃষ্টি করে তার ব্যক্তিত্ব ও আচরণ। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে বিশ্বব্যাপী এই যে বর্ণ, ধর্ম ও জাতি বৈষম্য ও বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতার কুসংস্কার—তা কি অনিবার্য শিশুর জৈবিক বিকাশের অংশরূপে?

আসলে অন্যসব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের থেকে মানুষ ভিন্ন ও অনন্য এই কারণে যে, সে তার নবমস্তিষ্কে বল্কল বা নিওকর্টেক্সের কল্যাণে অতিক্রম করতে পারে তার পুরানো ম্যামেলীয় মস্তিষ্কের প্রভাব, যেখানে অবস্থান আবেগ ও অজানা জিনিসের প্রতি ভীতির মতন জৈব বৈশিষ্ট্যগুলো; মানব শিশুর শিক্ষালাভের বিস্ময়কর দিক হল চিন্তার স্বাধীনতা যা নিয়ন্ত্রণ করে নিয়োকর্টেক্স।

শিশুর বয়স যখন দুই বছর হয় তখন সে আর শিশু থাকে না। তার মস্তিষ্কে অনেক তথ্যের সমাবেশ ঘটে এবং অনেক সংযোগ সৃষ্টি হয় স্নায়ুতন্ত্রে। কেন্দ্রাভিগ স্নায়ুসূত্রের সংখ্যা পাঁচ ছয়গুণ বৃদ্ধি পায়। স্নায়ুসংযোগের সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় সাতকোটি। এই শিশুর মস্তিষ্কের স্নায়ু সংযোগের তুল্য কোনো ব্যবস্থা যদি আধুনিক ইলেকট্রনিক্স বর্তনীতে আনতে হয়, তা হলে তা একটি বড় শহরের জায়গা নিয়ে নেবে। এর পরেও সেই বর্তনী মানুষের মস্তিষ্কের জটিলতা ও সূক্ষ্মতা লাভ করবে না।

শিশু জন্ম নেয় শুধু সামান্য কিছু স্নায়ুসংযোগ নিয়ে, অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে অধিকাংশ নতুন সংযোগ সৃষ্টি হয়। এজন্য শিশুর স্নায়ুকে উদ্দীপিত করা চাই। মানব শিশুর শিক্ষালাভ অন্তহীন। মস্তিষ্কের কোষগুলোর ব্যবহার তাই অলস সৌখিনতা নয়। সচেতন ভাবনা এবং অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির উদ্দীপনায় ক্রমাগত নব নব সংযোগ সৃষ্টির ভিতর দিয়ে স্নায়ুজালের উদ্ভব। মানব শিক্ষার জন্য মূল কথা হল– মস্তিষ্কের কোষগুলোকে ব্যবহার করো, নতুবা এগুলো তোমার হয়ে উঠবে না।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে মানব শিশুর শিক্ষালাভের প্রক্রিয়া গভীরতর রূপে জানা সম্ভব হচ্ছে। যে প্রশ্নটি দীর্ঘদিন ধরে বিতর্কের সৃষ্টি করে আসছে, তা হল মানব শিশুর শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে বংশানুক্রমিকভাবে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য কতটা দায়ী এবং কতটা পরিবেশ ও অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জিত? মনোবিজ্ঞানী ডক্টর ক্যারোল্ড টজার্ড শিশুদের নানাভাবে উদ্দীপিত করে এবং তাদের আচরণের ও মুখভঙ্গির চলচিত্র গ্রহণ করে কতকগুলো সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তাঁর মতে, অন্তত ছয় ধরনের আবেগ, যথা আনন্দ, বিস্ময়, দুঃখবোধ, রাগ, বিরক্তি এবং ভয় শিশু জন্মগতভাবে লাভ করে। কিন্তু শিশু যখন দেড় বছরে পা দেয় তখন অন্য কতকগুলো আচরণ যথা আগ্রহ, লাজুকতা অপরাধবোধ, ঘৃণা ইত্যাদি সে লাভ করে।

লিজার্ডের সঙ্গে অন্যবিজ্ঞানীরা সবাই অবশ্য একমত পোষণ করেন না। তাঁদের ধারণা রাগ, দুঃখবোধ, লজ্জা ও অপরাধবোধ বড়দের মধ্যেই শুধু থাকতে পারে।

www.pathagar.com

কারণ, এ জন্য এক ধরনের অবধারণ ক্ষমতা প্রয়োজন, যা শিশুবয়সে অর্জন করা সম্ভব নয়। এসব মতামত সত্ত্বেও এ সত্যটি স্পষ্ট যে, শিশুর মস্তিষ্ক কোনো সাদা পাণ্ডুলিপি নয়। জন্মগতভাবে কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য সে লাভ করে, তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের আড়ালে যা প্রভাব রাখে। একটি মূল আবেগের রং নিয়ে যে শিশুর জন্ম তা উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার বিচিত্র প্রভাবে সূক্ষ্ম ও গভীর, জটিল ও বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। মানব শিশু তাই শিক্ষা লাভের বিপুল ও বিস্ময়কর সম্ভাবনা নিয়ে এক অনির্ধারিত ও অনির্বচনীয় পথের অভিযাত্রী– জ্ঞানের জগতে। জন্মগতভাবে প্রাপ্ত তার মস্তিষ্কের গঠন ও জৈব বৈশিষ্ট্য গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু পূর্ণ নিয়ন্ত্রক নয়।

জন্মগতভাবেই কেউ স্বাধীনচেতা, কেউ অধীনতা প্রবণ, কেউ সাহসী, কেউ ভিতু, কেউ নেতা, কেউ সাধারণ–এ কথা বলা যাবে না। মানব শিশুর অভিব্যক্তি ঘটে বাইরে থেকে ভিতরে শিক্ষার প্রভাবে, ভিতর থেকে বাইরে নয়, যেমনটি ঘটে অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে, পূর্বনির্ধারিত পথে। মানব শিশুর সবচেয়ে বড় পরিচয় সে যেন এক যন্ত্র শিক্ষা প্রাপ্তির। মানব শিশুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট সে সীমাহীন শিক্ষা লাভের যোগ্য এক প্রতিভাস। শিক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে আমরা তাকে শিখাতে পারি, এটা আমাদের স্বাধীনতা। কিন্তু মানব শিশুর স্বাধীনতা আরো বড়, কারণ, আমরাই তার একমাত্র শিক্ষক নই। তার শিক্ষালাভের ও বিকশিত হবার পথ মুক্ত, অনির্ধারিত ও অনির্বচনীয়।

www.pathagar.com

শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ

রূপকথার হাম্‌টি ডাম্‌টির উক্তি "কেউনা কেউ নিয়ন্ত্রণ করবে। প্রশ্ন হল কে নিয়ন্ত্রণ করবে?" শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ প্রশ্নটি পুরানো— কে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে? এই প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্যে একটি দৃষ্টিভঙ্গি নিহিত এবং তা হ'ল, শিক্ষাকে কেউ না কেউ নিয়ন্ত্রণ করবেই। শিক্ষা নিয়ে যত বিতণ্ডা তার অনেকটাই এই প্রশ্নের মীমাংসা নিয়ে। শিক্ষা বিষয়ক অন্য নানা বিতর্ক আছে। যেমন, কোন বিষয় কতটা গুরুত্ব পাবে? কোন শিক্ষা পদ্ধতি বেশি কার্যকর? শিক্ষা কি শিক্ষক—কেন্দ্রিক হবে অথবা শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক? মেধাবী ছাত্রদের প্রতি বেশি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন অথবা যারা পিছনে পড়ে আছে তাদের বেশি যত্ন প্রাপ্য? শিক্ষাখাতে কত ব্যয় হবে? ইত্যাদি।

শিক্ষা বলতে কি বুঝায় এই দার্শনিক প্রশ্ন নিয়েও অনেক বিতর্ক আছে। কিন্তু এইসব বিতর্ক বিতন্ডার রূপ নেয় না, যেমনটি ঘটে শিক্ষা কে নিয়ন্ত্রণ করবে? এই প্রশ্ন নিয়ে। এর কারণ, কোন প্রশ্নের জবাব যখন অভিজ্ঞতা ও তথ্যের ভিত্তিতে পাওয়ার চেষ্টা চলে নৈর্ব্যক্তিকভাবে ও সত্যানুসন্ধানের লক্ষ্যে, সেখানে তা আমাদের পূর্ণ সমাধান না দিলেও সমাধানের উচ্চতর স্তরে নিয়ে যায়। কিন্তু আধিপত্য বিস্তারের মনোভাব নিয়ে প্রশ্নকারী যেখানে আগেই তার জবাব তৈরি করে রাখেন নিজস্ব অবস্থান থেকে, যেখানে অন্ধবিশ্বাস ও আত্মশ্লাঘা প্রধানত কাজ করে, সেখানে বিতণ্ডা অনিবার্য। আমরা দেখব, শিক্ষা কে নিয়ন্ত্রণ করবে? এ প্রশ্নটি প্রায়শ ব্যক্তি অস্মিতা ও দলীয় স্বার্থবুদ্ধির প্রভাবে আন্তরিকতা হারিয়েছে ও বিতণ্ডার জন্ম দিয়েছে।

কবি যখন বলেন, "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে" তখন শিশুকে নিয়ে বড়দের ভাবনায় তাঁদের নিজস্ব অভীপ্সাই প্রাধান্য পায়। শিশু তার শৈশব নিয়ে স্বাধীনভাবে আপন অধিকারে ও নিজস্ব মূল্যে উপস্থিত থাকে না বড়দের ভাবনায়। শিশু যেন একটি ক্যানভাস, যার উপরে অভিভাবক, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, ধর্মপ্রচারক বা নানা আদর্শের প্রবক্তারা তাঁদের অভিরুচি ও অভীপ্সার ছবি আঁকার অধিকার প্রাপ্ত। শিশু যেন সেই কাদা মাটি, যাকে আপন ইচ্ছার ছাঁচে মূর্তি গড়ার জন্য সবাই চটকাতে পারে।

এদের মধ্যে পুরোহিত, ধর্মযাজক ও ধর্মগুরু সেজে যারা শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চান এবং যারা রাজনৈতিক দল হিসাবে নীতি প্রচার করেন, সেখানেই উত্তেজনা ও

www.pathagar.com

প্ররোচনা সবচেয়ে বেশি। শিক্ষক এবং অভিভাবকের নিয়ন্ত্রণ তুলনামূলকভাবে যদিও অন্তরঙ্গ, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারাও, কখনো সচেতনভাবে কখনো অজ্ঞাতে, তাঁদের নিজস্ব ধর্মীয় ভাবনা ও রাজনৈতিক মতবাদ শিক্ষার্থীদের উপরে চাপিয়ে দেন।

শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠির যে আধিপত্য তা আলোচনা করতে গিয়ে বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন, "শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে এমন কর্তৃপক্ষকে খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, সেখানে যাঁরা আধিপত্য ঘটাচ্ছে তাদের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্র, যাজক-সম্প্রদায়, স্কুল শিক্ষাক ও অভিভাবক। এদের কাউকেই আসলে বিশ্বাস করা যায় না, কারণ এদের সবারই নিজস্ব অভিসন্ধি আছে যা শিশুর কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল, শিশুর নিজস্ব কোন অভিজ্ঞতা নেই যার দ্বারা সে নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে পারে। শিশুর এই অসহায়ত্ব তাকে শিকার করে অন্যের অশুভ স্বার্থের। শিক্ষা এভাবেই একটি জটিল রাজনৈতিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে।"

রাসেল এ কথাগুলো বলেছিলেন প্রায় ষাট বছর আগে। সে সময় এ কথাগুলোর গুরুত্ব অনেকেই অনুধাবন করেন নি। কিন্তু এর পর বিশ্বজুড়ে আমরা দেখেছি কি নগ্নভাবে মিলিটারী জান্তা ও একনায়কেরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যবহার করেছে তাদের হীন স্বার্থে ও নিজস্ব মতবাদ প্রচারের কাজে। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য মাদকতা সৃষ্টি ও জনগণকে বিভ্রান্ত করার যে প্রচেষ্টা, সেখানে আদর্শ প্রচারের নামে শিক্ষাকে এরা ব্যবহার করেছে। শিক্ষা মননশীলতা, বিচারের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করা ও প্রতিভার স্ফূরণের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে, ক্ষমতা দখলের ও ক্ষমতা সংরক্ষণের হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

কোন বদ্ধমূল ধারণা চাপিয়ে দেয়া, এমন কি মগজ ধোলাইয়ের যে ব্যাপক প্রক্রিয়া হিটলার পরিচালনা করেছিল, তার প্রভাব থেকে জার্মানীর ছাত্র শিক্ষক এমন কি বিজ্ঞানীরাও রক্ষা পায়নি। এরা অনেকেই নাৎসিবাদের অন্ধ সমর্থক রূপে অনেক নৃশংসতাকে চোখ বুজে সমর্থন দিয়ে গেছে। মুসলিনির ইটালিতেও এই মগজ ধোলাইয়ের কাজটি কম ভয়াবহ ছিল না। ইটালির ফ্যাসিবাদের গোঁড়া অনুরক্ত ও অন্ধ প্রবক্তারা অত্যন্ত যত্নসহকারে এমন এক উত্তেজনাপূর্ণ শুদ্ধি আন্দোলন শুরু করল যে, যে সব শিক্ষক অন্ধভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিতে রাজি ছিল না, তারা চাকরীচ্যুত হল এবং শাস্তিপ্রাপ্ত। চরম আবেগ তাড়িত গোঁড়ামির এই পরিবেশে শিক্ষার্থী হয়ে উঠেছিল ব্যক্তি ও দলের স্বার্থে ব্যবহৃত হবার প্রচার মাধ্যম।

শিক্ষার লক্ষ্য তখন হয়ে উঠে কিছু নীতি কথা ও পূর্ব নির্ধারিত মূল্যবোধের প্রচার ব্যবস্থা এবং শিশু আবেগপূর্ণ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার লীলাক্ষেত্র। মানব মনের যে অনন্য বৈশিষ্ট্য— অনুসন্ধিৎসার, প্রশ্ন করার, অভিজ্ঞতা ও নতুন জ্ঞানের আহরণে ক্রমাগত অস্তিমান উপলব্ধির জগৎকে অতিক্রম করে যাওয়া, তা এখানে ব্যাহত। মনুষত্ব ও ব্যক্তিত্ব এখানে অবমানিত।

আধিপত্যবাদ ও একনায়কত্বের শাসন এতই প্রভাব বিস্তারী যে, এর অধীনে যে শিক্ষা ব্যবস্থা তা শিক্ষকের এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা গ্রাস করে ফেলে। এখানে পাঠক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতির নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণ চলে অনুগত মানুষ সৃষ্টির লক্ষ্যে।

www.pathagar.com

একনায়ক অথবা শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থ ও আধিপত্য সুকৌশলে চাপিয়ে দেয়া হয় শিক্ষার্থীদের উপরে— কখনো ব্যক্তি আনুগত্যে, কখনো জাত্যাভিমান বা সাম্প্রদায়িক অহংবোধ, কখনো রাজনৈতিক মতবাদ, কখনো বা ধর্মীয় অনুশাসন রূপে। মানুষের চিন্তার স্বাধীনতা ও জ্ঞানের জগতে অভিযানমুখীনতার যে সহজাত স্পৃহা, তাকে বন্দী করার একমাত্র কৌশল হল, আবেগ, অপ্রাণীয়ের জন্য মোহ এবং কাল্পনিক ভীতিকে ব্যবহার করা।

আবেগ, লোভ আর ভয়—সব প্রাণীদেরই আছে। মস্তিষ্কের কান্ড বা braim stem হল এদের উৎস যা মানুষ বিবর্তনের ধারায় লাভ করেছে কোটি কোটি বছর আগে। ফলে, এর প্রভাব আদিম ও স্থূল। বিচারবুদ্ধি, বিশ্লেষণের দৃষ্টি, সৃজনশীলতা ও সৌন্দর্য চেতনার উৎস হল লঘু মস্তিষ্ক, যা মানুষ লাভ করেছে তিরিশ চল্লিশ লক্ষ বছর আগে মাত্র। ফলে, এর প্রভাব তুলনামূলকভাবে অনেক সাম্প্রতিক ও সূক্ষ্ম এবং একমাত্র মানুষেরই অনন্য অর্জন, তার অভিব্যক্তির ফসল রূপে। এজন্যেই দেখা যায়, আবেগ তাড়িত, ভীত বা প্রলুব্ধ জনতা যখন উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে, বুদ্ধি, বিবেক ও বিশ্লেষণের শক্তি সেখানে প্রায়শ পরাভূত হয়। যেমনভাবে বেহালা বা সেতারের সূক্ষ্ম সঙ্গীত হারিয়ে যায় ঢোলের শব্দ বা বোমার বিকট আওয়াজে।

জ্ঞান সাধনার পথ দীর্ঘ ও বন্ধুর, যদিও এর প্রভাব সূক্ষ্ম ও গভীর। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয় তথ্য ও অভিজ্ঞতার বিশাল জগৎ থেকে গ্রহণ ও বর্জনের প্রক্রিয়ায় নিজস্ব উপলব্ধির জগৎ সৃষ্টি করে। শিক্ষা শুধু গ্রহণের ব্যাপার নয়, নির্বিচারে তথ্যকে স্তূপীকৃত করা নয়, এমন কি কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে অন্ধভাবে অনুকরণ করাও নয়। যে বিচার বুদ্ধি, রুচি ও যুক্তির জাল দিয়ে পরিশ্রুত ও পরিশোধিত করে অভিজ্ঞতা ও তথ্যকে সাজিয়ে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব উপলব্ধির জগৎ সৃষ্টি করবে, সেটা তার নিজস্ব নির্মাণ। শিল্পীর আঁকা ছবির মতন প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিশ্বচিত্রই বিশিষ্ট ও অনন্য। এটাই তারে ব্যক্তিত্ব। শিক্ষার্থী তার শিক্ষা লাভের ভিতর দিয়ে শুধু তথ্য ও অভিজ্ঞতাকে সাজায় না, তথ্য ও অভিজ্ঞতাকে সাজাবার যে যৌক্তিক জাল, যে রুচি, যে সৌন্দর্য্য বুদ্ধি—তারও ক্রমাগত বিকাশ ঘটায়।

মানুষ তাই বড় হচ্ছে গভীরতর অর্থে। তার জ্ঞান বাড়ছে, তথ্য, তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বড় হচ্ছে, এটা তার স্থূল বৃদ্ধি। কিন্তু সে যে তার বিচারের শক্তিকে বৃদ্ধি করছে, তীক্ষ্ণতর করছে যুক্তির ছুরি এবং উজ্জ্বলতর তার সৌন্দর্য বুদ্ধি, এটা তার নতুন মাত্রায় বড় হওয়া। প্রথম বড় হওয়াটা বৃক্ষের মতন বা অন্য প্রাণীদের মতন। এখানে বৃক্ষটা বড় হয়, কিন্তু বৃক্ষের যে জেনেটিকাল গঠন, যার ভিত্তিতে এটি সূর্যের আলোয়, বাতাস, পানি ও মাটি থেকে নেয়া উপাদান থেকে খাবার তৈরি করে, পল্লবিত হয়, সজ্জিত হয় ফুলে ফলে— তার কোন পরিবর্তন হয় না। ছোট্ট চারা গাছটি যখন বড় হয়, তাকে যে অর্থে একই বৃক্ষ বলতে পারি। কিন্তু শিশু যখন বড় হয়, তখন তাকে সেই অর্থে একই ব্যক্তি বলতে পারি না। কারণ শিশু যে দেশে বড় হচ্ছে এবং তথ্য ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হচ্ছে, তাই শুধু নয়, সে প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে তার যৌক্তিক গঠনে, তার রুচির বিকাশে।

www.pathagar.com

সভ্যতাও একইভাবে বিকাশ লাভ করছে শুধু অধিক সম্পদ বৃদ্ধি করে ও জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করে নয়, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী মানুষের সমন্বিত অবদানের ভিতর দিয়ে বিশ্বজগৎকে গভীরতর, সূক্ষ্মতর ও শুদ্ধতরভাবে দেখার শক্তিকে বৃদ্ধি করে।

প্রতিটি শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের পথ তাই ভিন্ন ও অনন্য। যদিও সে অনেকের সঙ্গে পড়ছে, অনেকের কাছে পড়ছে, অনেক মহৎ মানুষের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হচ্ছে তাদের বই পড়ে, তবু সে এদের কারও অনুকল্প নয়। জ্ঞানার্জনের ও শিক্ষা লাভের পথ যেখানে উদ্ভাবনের, বিশ্লেষণের ও উপলব্ধির, সেখানে প্রতিটি শিক্ষার্থীই এক এক জন নিঃসঙ্গ পথিক। শিক্ষার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রতিটি শিক্ষার্থীর বিকাশকে অতটাই মুক্ত ও স্বাধীনভাবে ঘটতে দেয়া, যাতে তার ব্যক্তিত্ব ও অভিনবত্ব নিয়ে সে তার প্রতিভার স্ফূরণ ঘটাতে পারে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যসূচি চাই, পাঠক্রম ও পাঠ্যবই, শিক্ষক, অভিভাবক, সামাজিক পরিবেশ ও শিক্ষাদানের নীতিমালা। এগুলো কি অনুশাসন নয়? মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সান্নিধ্য ও তাদের উপদেশ শিক্ষার্থীদের কি প্রভাবিত করবে না? এর কি প্রয়োজন নেই? শিক্ষা ব্যবস্থা কি শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতাকে খর্ব করে না।

এসব প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব হল, শিক্ষার সমস্ত আয়োজনই শিক্ষার্থীর জন্য পরিবেশ যা তার ব্যক্তিত্ব ও মানসিক গঠনের উপাদান যোগাবে। যে শিক্ষা ব্যবস্থা যত দক্ষতার সঙ্গে এই উপাদানগুলো যোগান দিতে পারে, শিক্ষা ব্যবস্থা তত সার্থক ও সফল হয়। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা কোন ছাঁচ নয়, যার চাপে যান্ত্রিকভাবে পূর্বপরিকল্পিত আকার ও চেহারা নিয়ে অভিন্ন সব মৃন্ময় পাত্রের মতন শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে আসবে। এবং শিক্ষক বা ধর্মগুরু নয় কোন কুম্ভকার।

কোন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বা মহৎ ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণও সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ, শিক্ষার্থী একজন অন্য ব্যক্তি এবং তার অবস্থান অন্য কালে। শিক্ষার সার্থকতা স্থান ও কালের মধ্যে ব্যক্তি মানুষের স্বাধীন অভিব্যক্তি ঘটানো। এর ভিতর দিয়েই সে সমাজকে বেশি দিতে পারবে, এবং সভ্যতাকে সমৃদ্ধতর করতে সক্ষম হবে নতুন কিছুর সংযোজনে। পাঠক্রম, বই, শিক্ষক এবং শিক্ষার সমগ্র আয়োজন সহ বিশ্বপ্রকৃতি হচ্ছে সেই ধাত্র, যার মধ্যে শিক্ষার্থী ব্যক্তি মানুষ হিসাবে বিকাশ লাভ করবে স্বাধীনভাবে। এই বিকাশের পথে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি স্বাধীনতাকে খর্ব করা নয়, বরং তাকে আরো সমৃদ্ধ করা। যেমন প্লেনে উড়ার অর্থ চলার স্বাধীনতা খর্ব করা নয়, বরং দ্রুততর গতিতে গন্তব্যে পৌছার স্বাধীনতা বৃদ্ধি। অবশ্য এখানেও কিছু মূল্য দিতে হয়, ইচ্ছা মতন হাত পা ছুঁড়ে, যে দিকে ইচ্ছা সেদিকে হাঁটার স্বাধীনতা প্লেনে চড়লে থাকে না। কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে ও গতির স্বাধীনতা পেতে প্লেনকে বেছে নেবার স্বাধীনতা অধিকতর স্বাধীনতা।

সভ্যতার অগ্রযাত্রায় যাঁরা পূর্বসূরী, তাঁরা তাঁদের আবিষ্কার ও অবদান দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন জ্ঞানের জগৎ। ইতিহাসের বিখ্যাত সব ব্যক্তি— যেখানে আছেন বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রযুক্তিবিদ, দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, বা ধর্মগুরু— তাঁদের সমস্ত জ্ঞান ছাপানো বই বা কম্পিউটারের স্মৃতি ধরে, সংরক্ষিত হয়ে আছে

www.pathagar.com

সভ্যতার সঞ্চয় রূপে। এদের অবদান এক একটি অগ্রগতির ধাপ সভ্যতার অগ্রযাত্রায়। পুরানো এসব জ্ঞান আছে বলেই সেই সিঁড়ি বেয়ে জ্ঞানের বিকাশ ঘটতে পারছে দ্রুত। পূর্বসুরীদের অবদানের জন্যেই— যাঁরা যত পরে আসছে পৃথিবীতে, অতীতের সমস্ত জ্ঞানকে ব্যবহার করার স্বাধীনতা নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে পারছে।

পাখিরা ডানা মেলে যত দূর উড়তে পারে, এর ছানা বড় হয়ে তার বেশি উড়তে পারে না। কারণ, পাখির ছানাকে সেখান থেকেই শুরু করতে হয়, যেখান থেকে তার মা শুরু করছিল। আর এজন্যেই প্রাণীদের বিকাশের পথ অন্ধগলিতে আটকে আছে। মানুষের সভ্যতার অগ্রযাত্রা, এর বিকাশের পথ অন্তহীন। কারণ, প্রতিটি নতুন প্রজন্ম শুরু করছে সেখান থেকে, যেখানে, তাঁর অব্যবহিত পূর্ব প্রজন্ম শেষ করেছিল। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা পশ্চাদগামী, যারা অতীতের মধ্যে আটকে থাকতে চায় আধিপত্যবাদ ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাঁরা সভ্যতার শত্রু।

শিক্ষালাভের একটি বড় কাজ হল অতীতকে জানা, বিশ্বের সঞ্চিত জ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। কিন্তু আর একটি বড় কাজ, এবং যা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হল, অস্তিমান জ্ঞানের জগৎকে অতিক্রম করে যাওয়া। জ্ঞানের ক্ষেত্রে যদি কোন নৈতিকতা থাকে তা হল, মানব প্রজাতির উপরে অর্পিত এই সম্মুখ চলার দায়িত্ব— বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে অতীতকে জেনে, পুরানো জ্ঞানকে পটভূমিরূপে ব্যবহার করে, নতুন উদ্ভাবন ও নতুন আবিষ্কার ও নতুন উপলব্ধি সৃষ্টি।

অতীতের প্রতিটি অগ্রগতির ধাপকে যদি সভ্যতার এক একটি সিঁড়ি বলি, তাহলে যাঁরা অতীতের কোন ঘটনার মধ্যে আটকে থাকতে চায়, চির সত্যের প্রবক্তা রূপে কোন মহৎ ব্যক্তিকেও আকড়ে থাকতে চায়, তাঁর কাজটি হবে সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে থাকার মতন। সিঁড়ি ব্যবহৃত হবার, সিঁড়ি আমাদের চলার পথে সহায়ক, কিন্তু সিঁড়ি দাঁড়িয়ে থাকার জন্য নয়। শিক্ষার নিয়ন্ত্রক সেজে যারা জ্ঞানের বিকাশের পথকে রুদ্ধ করছে—দূরভিসন্ধি, ব্যক্তিস্বার্থ, সংস্কারের জড়তা অথবা অজ্ঞতার কারণে, তারা কালকে অস্বীকার করছে।

বৃক্ষের উপমায় আবার ফিরে আসতে চাই। গাছ এর পরিবেশকে ব্যবহার করে বিকাশ লাভ করছে, বড় হচ্ছে। মাটি ও বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান নিচ্ছে, সূর্য থেকে নিচ্ছে আলো। এজন্য রসসিক্ত নরম মাটি চাই, যেখানে এর শিকড় বিস্তার লাভ করতে পারে, প্রয়োজনীয় খাদ্যউপাদানগুলো ও পানি সংগ্রহ করতে। চাই মুক্ত হওয়া, যেখানে পর্যাপ্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন আছে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য। চাই উন্মুক্ত আকাশ, যেখান থেকে আলো নিয়ে এর পাতা সালোক-সংশ্লেষণ ঘটাতে পারে। গাছকে এর প্রয়োজনীয় খাবার, বাতাস, পানি আর আলো আমরা যান্ত্রিকভাবে প্রদান করি না। সজীব গাছ এর অন্তর্নিহিত জৈবিক গঠন দ্বারা ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় এর খাদ্যোপাদানগুলোকে আত্মস্থ করে নেয় এর দেহে। এখানে শোষণ করে নেয়া আছে আকাশের আলোকে, সালোকসংশ্লেষণে এবং খাদ্যরূপে নেয়া অণুগুলোর বিন্যাস নতুন অণুবন্ধনে।

তুলনা করা যাক এই জীবন্ত গাছের সঙ্গে আমাদের ঘরে সজ্জিত কাঠের আসবাবপত্রের। এই কাঠগুলোও একসময় গাছের অংশ ছিল, সজীব ও পরিবর্তনশীল।

www.pathagar.com

সযত্নে নির্মিত রং করা কাঠের আসবাবগুলো দামী সেগুন কাঠের হতে পারে অথবা বড় কোন বৃক্ষের। কিন্তু এখন তা মৃত বলেই সময়ের প্রভাব এতে পড়ে না। বছরের পর বছর এর চেহারা একই থেকে যায়। নতুন রাসায়নিক বন্ধনে এর মূল্যবান উপাদানগুলো বিন্যস্ত হয় না নিজস্ব সজীবতায়।

গাছের জন্য এর উপাদানগুলো যেমন সূর্যের আলোয় সালোকসংশ্লেষণ ঘটিয়ে খাবার তৈরি করে, শিক্ষা লাভের কাজটিও তেমনি ঘটে পুরানো তথ্য ও জ্ঞানের বিন্যাস ঘটিয়ে। সেই সংশ্লেষণ ঘটায় যুক্তির আলো ও উপলব্ধির চেতনা। পুরানো তত্ত্ব ও মতবাদ যেখানে মৃত কাঠের আসবাবপত্রের মতন সংরক্ষিত, যা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না, যে জ্ঞান পণ্ডিতের অহংবোধকে প্রশ্রয় দেয়, কিন্তু বিশ্লেষণ ও রূপান্তরের ভিতর দিয়ে নতুন জ্ঞানের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া ঘটায় না, যে জ্ঞান— যে তথ্য ও তত্ত্ব শুধু কণ্ঠস্ত করার, যা নিয়ে প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ, তা কাল নিরপেক্ষ এবং তা ঘরের আসবাবপত্রের মতই মৃত।

জ্ঞানের সাধনা একটি জৈব প্রক্রিয়ার মতন। বৃক্ষের চেয়েও যা বেশি সজীব। কারণ, নতুন জ্ঞান শুধু পুরানো জ্ঞান থেকে উপাদান সংগ্রহ করেই এর দেহকে পুষ্ট করে না, ক্রমাগত জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে যে মিথষ্ক্রিয়া, জ্ঞানের উপাদানগুলোর যে সংশ্লেষণ— তা ঘটে নব নব পদ্ধতিতে। কেমন করে আগামীতে নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হবে, কত দ্রুত জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে, সে সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে পুরানো অভিজ্ঞতার আলোকে, কিন্তু নিশ্চিত করে জানা সম্ভব নয়। জ্ঞান চর্চার ও নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সময় এমন সক্রিয়, গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক যে, আগামীকাল কি ঘটবে তা জানতে আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই অনিশ্চয়তা কোন অতৃপ্তি দেয় না। বরং জ্ঞান তত্ত্বের নতুন আলোকে জ্ঞানের সাধনা মুক্তপ্রান্ত ও অনিশ্চিত বলে, আরো বেশি আকর্ষণীয়। শিক্ষার এই নতুন গতিশীলতাকে অবধারণ করতে হলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি চাই শিক্ষাদর্শন সম্পর্কে।

শিক্ষাকে সব ধরনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে গিয়ে শিক্ষা কি লক্ষ্যহীন হয়ে পড়বে? বস্তুত ইংল্যান্ডে এমন একটি নীতিই শিক্ষা সম্পর্কে গৃহীত হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। অর্থনৈতিক উদার নীতির অনুকরণে শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করা হয়েছিল। ফলে, শিক্ষা বেসরকারি ও স্বেচ্ছাধীন ব্যবস্থায় পরিচালিত হবার নীতি গৃহীত হয়। আসলে শিক্ষার ক্ষেত্রে মুক্ত বাজার অর্থনীতি বা উদার নীতির ধারণা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। শিক্ষক, সমাজের গুণীজন বা রাষ্ট্র যদি শিক্ষা সম্পর্কে নিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করে, শেষ পর্যন্ত শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ অভিভাবক বা স্বেচ্ছাধীন কোন সামাজিক সংস্থার হাতে গিয়ে পড়বে। এমনকি সন্তান স্কুলে যাবে কি যাবে না, এ সিদ্ধান্তও অভিভাবকের হাতে গিয়ে পড়ে। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণহীনতা আসলে শিক্ষার দায়িত্ব থেকে সমাজ ও সরকারকে মুক্ত করে দেয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই অনভিজ্ঞ, অজ্ঞ ও সংস্কারাবদ্ধ অভিভাবকের অহং বা স্বার্থ শিশুর শিক্ষাকে প্রভাবিত করে।

শিক্ষা এত গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্য বিপ্লব ও জ্ঞানের দ্রুত বিস্তারের যুগে যে, এর দায়িত্ব অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বা স্বার্থান্বেসী মহলের হাতে তুলে দেয়া যায় না। শিশুর উপরে অভিভাবকের একচ্ছত্র অধিকার, শিশু বাবা-মার, এই ধারণা থেকে অনেক অভিভাবক,

www.pathagar.com

শিশুর নিজস্ব অধিকারকে ক্ষুণ্ন করেন। প্রতিটি মানব শিশুর যেমন নিজস্ব অধিকার আছে শিক্ষা লাভের, নিজের প্রতিভা বিকাশের, তেমনি একটি দায়িত্ব তার উপরে আরোপিত সময় ও সভ্যতার দ্বারা। যে কালে ও সমাজে শিশুর জন্ম, সেই স্থান কালের পরিমণ্ডল তাকে অনেক কিছু দেয় এবং দেবে, কিন্তু এই প্রাপ্তি শর্তহীন নয়। এই প্রাপ্তির মধ্যে বস্তুগত আড়ম্বর ও নিরাপত্তা শুধু নয়, তথ্য, জ্ঞান, উপলব্ধি এবং এসব নিয়ে নানা প্রশ্ন ও সমস্যার মিলে যে জগৎ— চেতনার ও সংস্কৃতির, সেখানেই শিশুর অবস্থান। এখান থেকেই শিশুকে বড় হতে হবে, এবং তার জন্য যে দায়িত্ব অপেক্ষা করে আছে, তার উপযুক্ত হয়ে উঠতে হবে শিক্ষার ভিতর দিয়ে।

কে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে? কার কতটা আধিপত্য থাকা উচিত? শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বা অভিভাবক কতটা স্বাধীন? এসব প্রশ্নের বিচ্ছিন্ন কোন জবাব নেই। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের ধারার বিশেষ কাল ও বিশেষ সামাজিক অবস্থায় প্রতিটি শিশুর জন্ম। তার উপরে যে দায়িত্ব এসে পড়বে, যে সব সমস্যার সমাধান তাকে করতে হবে এবং সে কাজে জ্ঞানের যে পরিবেশ তার জন্য প্রাপ্তিযোগ্য—এসব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই শিক্ষার আয়োজন করতে হবে। শিক্ষার সম্পর্ক জ্ঞানের সঙ্গে। জ্ঞান সৃষ্টি, এর সংরক্ষণ, সঞ্চারণ এর বিভিন্ন শাখার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া এবং জ্ঞানের প্রয়োগের অর্থাৎ এর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার একটি সমস্যা আছে। এই সমস্যার আলোকে শিক্ষার আয়োজন যদি করা হয়, শিক্ষার্থীর নিজস্ব বিশিষ্টতা ও তার স্থান কালকে মনে রেখে, তা হলে ব্যক্তিগত অস্মিতা বা কোন গোষ্ঠির স্বার্থবুদ্ধি বা সংস্কারের জড়তায় শিক্ষাকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা কমে যায়।

শিক্ষা সম্পর্কে যে দুটি প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গি—একটি ব্যক্তি বা দলের স্বার্থ বা মতবাদের দ্বারা অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ, অন্যটি সম্পূর্ণ উন্মুক্ত নীতি যা শিক্ষা সম্পর্কে রাষ্ট্রকে প্রায় দায়িত্বহীন করে ফেলে, এর কোনটিই সমর্থনযোগ্য নয়। এই দুই চরম পদ্ধতির মাঝামাঝি একটি অবস্থান হল, গঠনমূলক বা ধণাত্মক গণতন্ত্রের পথ। এখানে শিক্ষা নীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণের অবকাশ আছে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের। কিন্তু এই নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপরে অর্পিত হলেও এর সার্বভৌম ক্ষমতা সরকারের নয়, বরং প্রাসঙ্গিক অন্যসব ব্যক্তি ও সংস্থা একত্রে এখানে কাজ করার কথা। শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষাদার্শনিক, পরিকল্পনাবিদ, জনসাধারণ— সবাই তাদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের প্রত্যাশার প্রতিফলন চাইবে শিক্ষা ব্যবস্থায়, এবং সরকার এই প্রত্যাশার আলোকে নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল করার লক্ষ্যে সুচরম পথ অবলম্বন করবে। কিন্তু শিক্ষার প্রভাব যেহেতু দীর্ঘমেয়াদী, শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন ও শিক্ষা পরিকল্পনার ফললাভে যেহেতু পনের থেকে বিশ বছর সময় লাগে, অথচ কোন রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অতদিন একনাগারে সরকারি ক্ষমতায় নাও থাকতে পারে, ফলে বাস্তব কারণেও শিক্ষা পরিকল্পনায় রাজনৈতিক দলের কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বা মতবাদ প্রতিফলিত হওয়া উচিত নয়।

অন্যদিকে জনসাধারণ তাদের ইচ্ছা ও প্রত্যাশার প্রতিফলন অবশ্যই দেখতে চাইবে শিক্ষা ব্যবস্থায়, বিশেষ করে শিক্ষা যেখানে অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং সে ব্যয় তারাই শেষ পর্যন্ত বহন করে। কিন্তু শিক্ষাদানের পদ্ধতি, শিক্ষাদর্শন এবং জ্ঞান সৃষ্টির

www.pathagar.com

ও গবেষণার গভীর বিষয়সমূহ জটিল ও নির্বাচিত। একটি জাতির উন্নয়ন প্রত্যাশা ও অস্তিত্বের ভিত্তি যেখানে শিক্ষা, এর পরিকল্পনা ও পরিচালনার দায়িত্ব সেখানে স্বভাবতই অত্যন্ত গুরুত্বের। বিদ্বজ্জন বা বিশেষজ্ঞ না হয়ে শিক্ষার গভীর বিষয়গুলো এবং শিক্ষা পরিকল্পনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব অবধারণ সম্ভব নয়। ক্রমসঞ্চিত জ্ঞানের পরিমাণকে শিক্ষার জড়তা বলতে পারি। গতি বাড়াতে হলে জড়তা কমাতে হয় আমরা জানি। শিক্ষা ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্বকে বিসর্জন না দিয়ে গতিশীলতা ও পরিবর্তন আনতে হলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে জানার আকাঙ্ক্ষা ও সৃজনশীলতার সংযোজন চাই জ্ঞান সাধনার সঙ্গে। শিক্ষক যেখানে সংগৃহীত জ্ঞানের সংরক্ষণ ও বিতরণে শুধু নিয়োজিত, সেখানে পাণ্ডিত্বের জড়তা ও কর্তৃত্বব্যঞ্জক মনোভাব প্রাধান্য পায়। কিন্তু শিক্ষক যেখানে উদ্ভাবকও এবং শিক্ষার্থীদের প্রেরণার উৎস, সেখানে পাণ্ডিত্বের জড়তা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারেন।

শিক্ষার আভ্যন্তরিক একটি নিয়ন্ত্রণ আছে, বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও। শিক্ষাদানের পদ্ধতি, শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার্থীর প্রবণতা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা ব্যবস্থাকে যতবেশি এর ভিতরের প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তত তা স্বাধীনতা লাভ করে। গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হলেও, শেষ পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারাই শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হতে হয়। জনগণের একটি প্রজ্ঞা আছে এবং একটি সুসমঞ্জস দৃষ্টি— যতক্ষণ না কোন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্ররোচনায় তারা উচ্ছৃঙ্খল ও উত্তেজিত হয়ে তাঁদের সহজাত প্রজ্ঞা হারিয়ে ফেলে। নতুন জ্ঞান সবসময়েই প্রচলিত ধারা ও ঐতিহ্যকে অতিক্রম করে যায়। অভিনবত্বের একটি অভিঘাত আছে অস্তিমান জ্ঞান ও ঐতিহ্যের উপরে, যা শুধু সাধারণ মানুষকে নয় পণ্ডিত ব্যক্তিদেরও বিব্রত করে। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই একটি নিজস্ব জড়তা আছে পরিবর্তন ও অগ্রগতির বিরুদ্ধে। এই জড়তাও শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই জড়তার বিরুদ্ধে কাজ করে অবশ্য অনুসন্ধিৎসা ও আবিষ্কারের স্পৃহা। অবশ্য জ্ঞান ও সত্যকে অজ্ঞানতা ও অসত্যের বিরুদ্ধে রক্ষা করার জন্য কিছুটা ভর অর্থাৎ জড়তা এতে যুক্ত হতেই হয়। এতে শিক্ষা বরং কিছুটা বাহ্যিক স্থূল নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে উঠে।

যদিও কোন দেশের রাজনৈতিক দর্শন সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করার কথা, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কোন দেশের অতীত ইতিহাস দীর্ঘদিন ধরে সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে থাকে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, এমনকি রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে যাবার পরও। শিক্ষার উপরে রাজনৈতিক প্রভাব প্রত্যাবর্তী নয়, বিশেষ করে খারাপ প্রভাবগুলো, যেখানে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে মানুষের আবেগ, জ্যাত্যভিমান, সাম্প্রদায়িক ভাবনা বা গোঁড়ামিকে সুকৌশলে ব্যবহার করা যায়। এই পরিবর্তনগুলো আসলে সভ্যতার অগ্রযাত্রার এক একটি খাদ বা কৃষ্ণ গহ্বর।

কোন রাষ্ট্রনায়ক বা দল যখন এই পশ্চাদমুখী পরিবর্তনগুলো আনে, তখন তা শোষণের লক্ষ্যে প্রতারণার মাধ্যমেই আনে। যেমন, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যখন কোন

www.pathagar.com

রাজনৈতিক দল ছড়ায় এবং জনগণকে উত্তেজিত করে, এজন্য কোন ত্যাগ বা মূল্য তাদের দিতে হয় না—বরং সমাজকে যে পরিমাণে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে এবং এর পতন ঘটায়, সেই পরিমাণে এর পতনের শক্তিকে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বিদ্বেষের আগুন রূপে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে যদি পাহাড়ী পথ বেয়ে একটি গাড়ির ক্রামাগত উপরে উঠা বলি, তা হলে এই উত্তরণের জন্য শক্তি ব্যয় করতে হবে, যা সভ্যতার বিভব শক্তিরূপে সমাজে সঞ্চিত হয়। কেউ যদি সভ্যতার এই উর্দ্ধগামী যাত্রাকে অর্থাৎ আমাদের প্রতীকী গাড়িকে কোন খাদে ফেলে দেয়, তখন এর বিভব শক্তি থেকে তাপ অথবা বর্ধিত গতি সৃষ্টি হতে পারে উচ্চতার মূল্যে।

উপমাটা আরো মিলে যায় এই কারণে যে, যখন গাড়িটিকে গর্তে ফেলে দেবার নিমিত্তটি থাকে না, গাড়িটি তখনও গর্তে পড়ে থাকে। আর এজন্যেই রাজনৈতিক যে পরিবর্তনগুলো শোষণের লক্ষ্যে সমাজের অগ্রগতির মূল্যে ঘটে, তার ক্ষতি রাজনৈতিক সংকট দূর হবার পরও থেকে যায়। উত্তরণ অবশ্য সম্ভব, কিন্তু সেজন্য যে পরিমাণ মূল্য দিতে হয় তা সহজে জোটে না। এর দৃষ্টান্ত আমরা পাই রাশিয়া ও জার্মানীর শিক্ষা ব্যবস্থায়। জারের যুগে রাশিয়াতে শিক্ষাকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের যে ধারা প্রচলিত ছিল, বিংশ শতাব্দীর এত বড় বিপ্লবের পরও দেখা গেল সেই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ধারা অব্যাহত রয়েছে। যদিও শিক্ষার নানা ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং শিক্ষা দর্শনকেও নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল, ইতিহাসের প্রভাবকে মুছে ফেলতে পারেনি রাজনৈতিক বিপ্লবও। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এর যে সংবিধান তৈরি হয়েছিল তা ছিল আধুনিক ও ধর্ম নিরপেক্ষ। কিন্তু মিলিটারী জান্তা ক্ষমতায় এসে যে পশ্চাদমুখী পরিবর্তন এনেছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরে আসার পরেও তা রয়ে গেছে, বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে।

জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুত্থানের অনেক আগে থেকেই মনে করা হত শিক্ষা হচ্ছে রাষ্ট্রের অধীন এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্যই হল রাষ্ট্রের অনুগত প্রজারূপে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা। জার্মান সাম্রাজ্য যখন গড়ে উঠছিল হোহেনজোলার্নস এর অধীনে, তখন বলা হত "যা তুমি রাষ্ট্রের মধ্যে স্থাপন করতে চাও তা আগে স্কুলে স্থাপন কর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্র ক্ষমতাকে মদত দেবে এটাই ছিল সমর্থিত ধারণা। রাষ্ট্রের যে শক্তি প্রয়োজন তার মহড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলছিল। যে যুদ্ধের জন্য জার্মানরা প্রস্তুত হচ্ছিল, তার অস্ত্রশাণিত হচ্ছিল স্কুলে। জার্মানির বাধ্যতামূলক শিক্ষার লক্ষ্য ছিল একই সঙ্গে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রের খুঁটি হিসাবে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা। হিটলার তার সম্প্রসারণ লিপ্সা পূরণের লক্ষ্যে যুদ্ধের যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তারই অংশ রূপে যুব আন্দোলন ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে নগ্নভাবে ব্যবহার করছিল। কিন্তু জার্মানির সম্প্রসারণ জিঘৃক্ষা পূরণে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করার কাজে হিটলারই উদ্ভাবক নয়।

ইংল্যান্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দীর্ঘদিন অনেকটা শিথিল ছিল। এর একটি কারণ, মতামতের ভিন্নতা ও জীবন ধারার বৈচিত্র্য মেনে নেবার একটি সহজাত

www.pathagar.com

ঐতিহ্য এই দেশে গড়ে উঠেছিল দীর্ঘদিন ধরে। এই নমনীয়তা ও সহনশীলতার পিছনে কাজ করেছে একদিকে মুক্ত বাজার উদার নীতির দর্শন, অন্যদিকে চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের জটিল সম্পর্ক। সমস্ত মধ্যযুগ ধরে শিক্ষার দায়িত্ব প্রায় এককভাবে পালন করেছে চার্চ। মধ্যযুগের ইউরোপের সমাজ, নিয়মশৃঙ্খলা ও সূক্ষ্ম রীতি নীতি মেনে চলাকে মূল্য দিত খুব বেশি, এবং সমাজ ছিল অবিচল ও অপরিবর্তী। এর প্রতিফলন পড়েছিল শিক্ষায়। ফলে, শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়কেই কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে চলতে হত। স্কুল অর্ডিনেন্সে শিক্ষকের যোগ্যতা, তাদের দায়িত্ব ও আচরণবিধি, ব্যবহৃত পাঠ্যবই, চার্চে ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান—সব কিছু সম্পর্কে নিয়ম বাঁধা ছিল। এই নিয়ন্ত্রণের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল বিশপ।

এই সময়ে কিছু কিছু ঘটনা ঘটতে থাকে, যেখানে মুক্ত বুদ্ধি ও রাজনৈতিক মতের কারণে কোন কোন শিক্ষককে নাজেহাল হতে হয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, শিক্ষার প্রসার, বিশেষ করে গ্রামার স্কুলের সংখ্যার বিস্তার ও গুণগতমান উন্নয়ন, ভিতর থেকে এক শক্তির জন্ম দিচ্ছিল, যা মধ্যযুগের রক্ষণশীল শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও রেনেসাঁসের জন্ম দিল। বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সৃষ্টি হল, যাঁরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখল ও সামাজিক ও বুদ্ধিগত পরিবর্তন এনেদিল।

যাকে আমরা রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বলি, তা নতুন এক প্রেরণার উৎস রূপে কাজ করল। শিক্ষার উপরে নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে গেল। অনেক নতুন সজীব বিষয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত হল। ব্যক্তি স্বাধীনতা নিয়ে ও মুক্তবুদ্ধি নিয়ে মানুষ প্রশ্ন করল, চার্চের প্রতি পুরানো আনুগত্যকে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে। চার্চের আধিপত্য ও একচ্ছত্র প্রভাব ভেঙ্গে পড়তে থাকল। এই মুক্তবুদ্ধির উদ্বোধন মানুষের দৃষ্টিকে ধর্মীয় ধ্যানমগ্নতা থেকে বাহ্যিক জগৎ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ও অনুসন্ধানী করলো। রেনেসাঁসের সূচনা হয় ইটালির চিত্রশিল্পীদের কাজের ভিতর দিয়ে। বাইজেনটাইনের যে ধর্মীয় ঐতিহ্য তা ভঙ্গ করে, গিয়োটো এবং অন্যান্য শিল্পীরা প্রকৃতি, মানবদেহ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ও পর্যবেক্ষণের বিষয়কে তাঁদের চিত্রে স্থান দিলেন।

লিউনার্ডো দা ভিঞ্চি মানব দেহের ব্যবচ্ছেদ থেকে শারীরবিদ্যা সম্পর্কে এমন গভীর জ্ঞান তুলে ধরেছিলেন তার ছবিতে, যা তার সময়ের তুলনায় ছিল অনেক বেশি অগ্রসর। পাখিদের উড়ে যাওয়া পর্যবেক্ষণ করে উড়ন্ত মেশিন ও হেলিকপ্টারের ধারণা উদ্ভাবন করেন। আধুনিক বিজ্ঞানের যে উদ্ভব ঘটলো ইটালিতে, তা ছড়িয়ে পড়ল ফ্রান্স, হল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে। এই সময়ে জার্মানি ধাতুবিদ্যা ও খনিজ সম্পদ উত্তোলনে অগ্রগামী থাকা সত্ত্বেও, দীর্ঘ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায়, বিশেষ অবদান রাখতে ব্যর্থ হল, এবং স্পেন তখনকার সবচেয়ে ধনী দেশ হওয়া সত্ত্বেও, বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়ল ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায়, বিশেষ করে ধর্মীয় বিতর্ক ও তদন্তে জড়িয়ে পড়ে।

শিক্ষা, ধর্ম ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মধ্যযুগে যেমন স্থিতিশীলতা পেয়েছিল, তা আসলে মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও ব্যক্তি স্বাধীনতার মূল্যে। যদিও ষষ্ঠ ও সপ্তদশ শতাব্দীর রেনেসাঁসকে একটি বিপ্লবাত্মক আকস্মিক ঘটনা মনে হয়, এর প্রস্তুতি চলছিল ভিতর

www.pathagar.com

থেকে দীর্ঘদিন ধরে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক ছোট ছোট অগ্রগতি সাধিত হচ্ছিল। তবে ক্রিশ্চান ধর্মের আধ্যাত্মিক প্রভাব ও জীবনবিমুখ দর্শন, যেখানে জন্মই আজন্ম পাপ বলে গণ্য করা হত, মুক্তচিন্তা, প্রশ্ন করার স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতাকে ভীষণভাবে নিরুৎসাহিত করতো। পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপের নানা কৌশল উদ্ভাবনের ভিতর দিয়ে বেবিলন ও ইজিপ্টে যে বিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল এবং বিজ্ঞানের ও গণিতের বিমূর্ত ভাবনাগুলো উদ্ভাবিত হয়েছিল গ্রীসে, তার গতি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ইউরোপে, ক্রিশ্চান ধর্মের গোঁড়ামির দ্বারা।

খৃষ্টপূর্ব চারশ অব্দে লিউসিপাস ও ডিমোক্রিটাস আধুনিক বিশ্বের যে ধারণা দিয়েছিল, তা প্রায় দুই হাজার বছর ধরে এভাবে থেমে ছিল। এর কারণ, শিক্ষাকে এই দীর্ঘ সময় ধরে নিয়ন্ত্রণ করেছিল ক্রিশ্চান ধর্মযাজকরা।

মধ্যযুগের এই অন্ধকার সময়টায় শিক্ষাদানের কেন্দ্র ছিল মনাস্ট্রি পরিচালিত স্কুলগুলোতে। গ্রীক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলো প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল। সমস্ত ভাবনাই ছিল ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক, যার মূল সুরটি ছিল সেন্ট অগাস্টিনের দেয়া। বিশ্বজগৎকে ব্যাখ্যা করা হত অতিকথা, রূপক কাহিনী ও প্রতীক ব্যবহার করে। সমস্ত মধ্যযুগ ধরে নানা কল্পগল্প লিখিত হয়েছিল শুধু বাইবেলে বর্ণিত কাহিনীর সমর্থনে। যেমন, বলা হত সামুদ্রিক পাখি অ্যালব্যাট্রাস এর বাচ্চাকে নিজের রক্ত খাওয়ায়, যা যীশুখৃষ্টের নৈশ ভোজোৎসবের প্রতীক। সিংহ জন্মে মৃত অবস্থায় এবং পরে এতে প্রাণ সঞ্চার ঘটে, যা যীশুখৃষ্টের বর্ণিত পুনরুত্থানের প্রতীক। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর একশৃঙ্গ প্রাণী ইউনিকর্ণকে নিষ্পাপ কুমারীর কোলে নিয়ে প্রশমিত করার চিত্রকে খৃষ্টের দেহধারণের প্রতীক ধরা হত। জীবতত্ত্ব এবং নানা কল্প কাহিনীর অদ্ভুৎ মিশ্রণ ঘটিয়ে অলীক এক জগৎ উপস্থিত করা হত শিক্ষার্থীদের কাছে, বাস্তব জগতের প্রতিকল্প রূপে।

সেন্ট অগাস্টিনের মতে, কোন প্রাণী বাস্তবে আছে কিনা সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল কিসের সে প্রতীক? আকাশের নক্ষত্রদের সম্পর্কে মনে করা হত, মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ও তাকে পরিচালিত করার জন্য এরা সৃষ্টি হয়েছে। স্কুল শিক্ষকরা দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার চর্চা করতো, কিন্তু তাদের আকর্ষণ ছিল ধর্মীয় ভাবনা ও পুরানো জ্ঞান নিয়ে বড়জোর বিতর্ক করা। কিন্তু প্রকৃতি বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তাভাবনা সামাজিকভাবে সম্মানজনক ছিল না? এবং শিক্ষার বিষয়রূপে তা শিক্ষক বা শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতো না। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি বা আবিষ্কারের প্রত্যাশাও তাদের ছিল না।

গ্রীকদের যে বুদ্ধিগত অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, তার একটি মূল কারণ ছিল তাদের সমাজের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে রাষ্ট্র পরিচালিত হত জ্ঞানী মানুষদের সমষ্টিগত ভাবনা ও তাদের দার্শনিক চিন্তার প্রভাবে।

গ্রীসের প্রকৃতি দার্শনিকরা নিয়ন্ত্রিত ছিল না রাজশক্তির দ্বারা বা ধর্ম যাজকদের দ্বারা। প্রকাশ্যে তাদের মত পার্থক্য নিয়ে বিতর্ক করতে পারতো, যা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। ডিমক্রিটাস মনে করতেন আমাদের ভাবনাও একটি ভৌত প্রক্রিয়া, এমন কি

www.pathagar.com

আত্মাও পরমাণু দিয়ে তৈরি। কিন্তু প্লেটো এবং অ্যারিষ্টোটল এই মতের বিরোধিতা করেন। দান্তে ডিমক্রিটাসের দ্বারা আত্মার অবমাননার জন্য তাঁকে নরকে স্থান দেন।

অ্যারিস্টোটল যদিও একজন অত্যন্ত উচ্চমানের জীববিজ্ঞানী ছিলেন, তার এই বিষয়ক জ্ঞান ততটা গুরুত্ব পায়নি তার উত্তসূরীদের কাছে, যতটা পেয়েছে পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ভ্রান্ত ধারণাগুলো। সেন্ট টমাস অ্যাকুইনাস ক্রিশ্চান ধর্মের বিশ্বাস ও অ্যারিস্টোটলের বিজ্ঞানের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম মিল প্রতিষ্ঠা করেন এবং অ্যারিস্টোটরে ধারণার যেগুলো ক্রিশ্চান ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তা বর্জন করে একটি বিশ্বধারণা উপস্থিত করেন। অ্যারিস্টোটল বিশ্বাস করতেন অন্তর্নিহিত পরম কারণবাদ বা টেলিওলজিতে এবং ক্রিশ্চান বিশ্বাস ছিল, গডের ব্যক্তিগত ইচ্ছায় সবকিছু ঘটে। আমরা দেখি অ্যারিস্টোটলের ধারণা পরে সমালোচিত ও প্রতিস্থাপিত হয়, অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষালব্ধ সাধারণীকৃত প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা। এই সমালোচনা ঘটে চতুর্দশ শতাব্দীতে অক্সফোর্ড ও প্যারিসে।

আরব বিজ্ঞানীদের অনুসরণে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অ্যারিস্টোটলের কার্যকারণবাদকে রূপান্তরিত করে প্যারিসে এই ধারণা উপস্থিত করা হয় যে, মহাবিশ্বের সব ঘটনা কার্যকারণের ধাপ অনুসরণ করে ঘটে, যেখানে ব্যক্তি এমনকি গড নিজেও স্বাধীনভাবে নিজস্ব ইচ্ছায় কিছু ঘটাতে পারে না কার্যকারণের বাইরে। পঞ্চদশ শতাব্দীকে এই আন্দোলন প্যারিস থেকে পাদুয়াতে চলে যায়, যেখানে ধর্মীয় বিধি-নিষেধের বাইরে অ্যারিস্টোটলের মতবাদ নিয়ে আলোচনা করার স্বাধীনতা সৃষ্টি হল। অ্যারিস্টোটলের পদ্ধতি ছিল স্বজ্ঞামূলক কোন নীতিকে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে অভিজ্ঞাত বিশ্বজগৎকে ব্যাখ্যা করা। ফলে, তার বক্তব্য নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ ছিল না। এই পদ্ধতির পরিবর্তে যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রবর্তন হল, সেখানে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে মূল কারণ সম্পর্কে অনুমানাত্মক ধারণা গ্রহণ করা হয়, যার সত্যতা আবার পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে যাচাই করা হয়।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর গ্রীক বিজ্ঞানের ঐতিহ্য সংরক্ষিত ও সম্প্রসারিত হয়েছিল আরব বিশ্বে। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমানরা ছড়িয়ে পড়ে এশিয়া মাইনর, পারস্য, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে, এবং নবম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইসলামের সভ্যতা ক্রিশ্চান সভ্যতাকে ছাড়িয়ে যায়। মুসলিম বিজ্ঞানীরা মূলত নিয়োজিত ছিলেন রসায়ন শাস্ত্র, আলোকবিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে। সংখ্যা বিজ্ঞানেও তাদের চর্চা ছিল। বাগদাদের খলিফার পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শন আরবী ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। কিন্তু গ্রীকদের জ্ঞানকে সংরক্ষণে মুসলমানরা যতটা সফল হয়েছিল, জ্ঞানের সংযোজন ও উন্নয়নে তা করতে পারেনি, সামাজিক রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য।

প্রাচ্য এখন পাশ্চাত্য থেকে বিজ্ঞান ও দর্শনকে আমদানি করছে, এবং তাঁদের দর্শন। কিন্তু মধ্যযুগের ইউরোপীয় জ্ঞানী ব্যক্তিরা অ্যারিস্টোটলের দর্শনের ব্যাখ্যা জানতো ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইসলামিক দার্শনিক অ্যাভারোসকে পাঠ করে। গ্রীক বিজ্ঞান

www.pathagar.com

ও দর্শন আরবদের কাছ থেকে ইউরোপে আবার ফিরে আসে স্পেন ও সিসিলির মাধ্যমে, আরবী থেকে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে। একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাত্র ইউরোপের জ্ঞানী ব্যক্তিরা ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত হয়ে শিক্ষাকে সেকিউলার বা অনাধ্যাত্মিক এবং বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে সক্ষম হন।

শিক্ষা কে নিয়ন্ত্রণ করবে? এই প্রশ্নের অনুসন্ধান করতে গিয়ে সভ্যতার বিকাশের ইতিহাস কিছুটা পর্যালোচনা না করে উপায় নেই। আর সে জন্যেই উপরের বর্ণিত ঘটনাবলীর অবতারণা। আমরা লক্ষ্য করেছি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা যেখানে ব্যাহত কর্তৃত্বব্যঞ্জক অনুশাসন দ্বারা, ফলে মুক্ত বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা বাঁধাগ্রস্ত, সেখানে সভ্যতা স্তব্ধ হয়ে যায় অথবা পশ্চাদমুখী। এই জড়তা ও প্রতিবন্ধকতার উৎস হতে পারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির একগুয়েমী ও একনায়কত্ব, সামাজিক সংস্কার ও রক্ষণশীলতা—এমনকি বিদ্বজ্জনের পাণ্ডিত্বের অহমিকা। কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ হল ধর্মীয় গোঁড়ামি ও আধ্যাত্মবাদের অদৃশ্য প্রভাব, যা ভিতর থেকে বিহ্বল করে ফেলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে—ভয়, লোভ ও অন্ধবিশ্বাসের আবেশ সৃষ্টি করে। খ্রীশ্চান ধর্মের প্রভাবে প্রায় দুই হাজার বছর ধরে ইউরোপের অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকা এর দৃষ্টান্ত।

লক্ষণীয়, অ্যারিস্টোটল তাঁর অনেক অবদান সত্ত্বেও দুই হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বাঁধা হয়ে বসে ছিলেন, যতটা তার নিজের ভুলের জন্য নয়, তাঁকে ঘিরে অন্ধ ব্যক্তি পুঁজার কারণে। গল্প আছে যে, সপ্তদশ শতাব্দীতেও ফাদার সেইনার তার সঙ্গীকে বল্লেন যে, তিনি সূর্যে সৌরকলঙ্ক দেখেছেন, সঙ্গীটি উত্তর দিলেন, তা কখনই হতে পারে না, কারণ তিনি অ্যারিস্টোটল পড়েছেন এবং সেখানে কোথাও সৌরকলঙ্কের কথা লেখা নেই।

আধুনিক বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতি ও শিল্পবিপ্লব কেন রেনেসাঁসের জন্য অপেক্ষা করেছিল? তার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যাবে, এজন্য প্রয়োজন ছিল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়। প্রথমটি নির্ভর করে স্বজ্ঞা, অনুমান, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা, তত্ত্ব আবিষ্কার ও তত্ত্ব যাচাইয়ের উপরে। দ্বিতীয়টি নির্ভর করে কৃৎকৌশল, যন্ত্রনির্মাণ ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের উপরে। ভিন্ন দুই সৃজনশীল ঐতিহ্য রূপে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি ঘটলেও, এদের সমন্বয় ঘটেছিল. শিল্প বিপ্লবের ভিতর দিয়ে। গ্রীসে যে শিল্প বিপ্লব ঘটতে পারেনি বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও, তার কারণ, কৃতদাসরা সব হাতের কাজ করতো বলে সামাজিকভাবে তাত্ত্বিক আবিষ্কার শুধু সম্মানিত হত। অ্যারিস্টোটল বলেছিলেন, উদ্ভাবন দু'রকম হতে পারে। কোন কোন উদ্ভাবন আমাদের প্রয়োজনে আসে এবং কোন কোন উদ্ভাবন বিশুদ্ধ ও অপ্রয়োজনীয়। স্বভাবতই যেগুলো নিছক আনন্দের জন্য তা উন্নত জ্ঞান থেকে আসে এবং তা বেশি মূল্যবান। আর্কিমিডিস, যিনি সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী ছিলেন সে সময়ের এবং একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সর্বকালের, তাঁর বিচারেও প্রায়োগিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ছিল কম মূল্যপ্রাপ্ত। যদিও তিনি নিজে লিভার, তরল স্থৈতিক নিয়ম, প্রান্তহীন স্ক্রু ব্যবহারে পানি উত্তোলনের যন্ত্র, এবং যুদ্ধাস্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন।

www.pathagar.com

প্রযুক্তি সম্পর্কে অসম্মানজনক মনোভাব এবং প্রযুক্তিগত দুর্বলতাই ছিল পুরানো সভ্যতার থমকে যাবার প্রধান কারণ। প্রযুক্তির উদ্ভাবন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে এবং সভ্যতা গতি লাভ করে। ধর্মীয় সংঘাত যখন ইউরোপে কমে গেল, সেই সঙ্গে মুক্তচিন্তা ও প্রশ্ন করার ও বিকল্প ভাবনার স্বাধীনতা, তখন শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত বাঁধা দূর হল। ছাপাখানার আবিষ্কার দ্রুত তথ্যকে পৌঁছে দিল অনেকের মধ্যে এবং তার চেয়ে বড় কথা, পুরানো জ্ঞানকে স্মৃতিতে ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা গেল কমে। মানুষ তার মস্তিষ্ককে ব্যবহার করতে পারলো নতুন ভাবনা ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির কাজে। রোমান সভ্যতার ঐতিহ্য ছিল বক্তৃতা ভিত্তিক শিক্ষা। সেই ধারার পরিবর্তে বিজ্ঞান চর্চার ও মৌলিক চিন্তার ধারা প্রতিষ্ঠিত হল।

ইউরোপের, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের শিক্ষা ক্ষেত্রে, দীর্ঘ যে পরিবর্তনের ধারা, এবং বিভিন্ন স্তরে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণের বাঁধা অতিক্রম করার যে ইতিহাস, তা আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। প্রথমত ইংল্যান্ডের কাছ থেকেই আমরা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, যদিও সে দেশের শিক্ষা দর্শনকে আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আত্মস্থ করতে পারিনি। দ্বিতীয়ত অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ সহজতর, যদি বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে অন্য দেশের ইতিহাস আমরা অনুধাবন করতে পারি। তৃতীয় কারণটি খুব বাস্তব ও দুঃখজনক। যদিও আত্মসমালোচনা ও আত্মবিশ্লেষণ সবচেয়ে প্রশংসনীয় ও কার্যকর পথ নিজেকে সুধরাবার, তবু অসুবিধা হল যখন নিজের সমাজ ও অব্যবহিত পরিবেশ সম্পর্কে আসা যায়, তখন সেই আত্মসমালোচনা শুধু দুঃসাধ্য নয়, বিপজ্জনকও বটে। নিজের জুতার ফিতা ধরে যেমন নিজেকে শুন্যে তোলা যায়না, সমাজে বাস করে সমাজকে উপরে তোলা তেমনি দুঃসাধ্য কাজ, বিশেষ করে গোঁড়ামি ও সংস্কার যখন সমাজকে বেঁধে রাখে। অন্য দেশ বা অন্য কালের ইতিহাস যে দূরত্ব দেয়, তা লিভারের দণ্ডের মতন কাজ করে। ধীরে হলেও এক্ষেত্রে অনেক ভারী ওজনকে অল্প বল প্রয়োগেও উপরে তোলা সম্ভব। অন্য দেশের ইতিহাস আলোচনা এজন্যই প্রাসঙ্গিক।

শিক্ষার নিয়ন্ত্রণে ধর্মীয় প্রভাব কতটা থাকা সঙ্গত তার সবচেয়ে চমৎকার ব্যাখ্যা আমরা পেতে পারি ইতিহাস থেকে। আমেরিকার বিখ্যাত জাজ জে. এস. ব্লাক প্রায় একশ তিরিশ বছর আগে বলেছিলেন, 'এদেশের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের লক্ষ্য ছিল ধর্ম ছাড়া একটি রাষ্ট্র এবং রাজনীতি ছাড়া একটি চার্চ। অর্থাৎ তারা চেয়েছিলেন এর একটি যেন অন্যটির ইঞ্জিন হিসাবে ব্যবহৃত না হয়। আমাদের পূর্ব পুরুষরা এই বিশ্বাসে আন্তরিক ছিলেন যে এতে চার্চের সদস্যরা অনেক বেশি দেশপ্রেমিক হবেন এবং নাগরিকগণ অনেক বেশি ধার্মিক হবেন, রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে দেয়াল তুলে রেখে।'

চার্চ এবং রাষ্ট্রকে পৃথক রাখার নীতির এই ব্যাখ্যাকে স্পষ্টভাবে পাকাপাকি করে আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ১৯৪৭ সালে এবং পুনরায় ১৯৪৮ সালে । দুই ক্ষেত্রেই

www.pathagar.com

বিচারপতি হুগো ব্লাক ঘোষণা করেন, কোন রাষ্ট্র বা ফেডারেল সরকার না পারবে এমন আইন পাশ করতে যা কোন ধর্ম বা সব ধর্মকে সাহায্য করে, অথবা কোন বিশেষ ধর্মকে অন্য কোন ধর্মের উপরে প্রাধান্য দিতে। কোন ব্যক্তিকে আইন করে চার্চে নিতে অযথা চার্চে যাওয়া থেকে বিরত করতে পারবে না তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। কোন রকম খাজনা বসানো যাবে না ধর্মীয় কর্মকাণ্ড বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য, তা যে নামেই থাকুক না কেন। জেফারসনের ভাষায়, "চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দেয়াল তুলতে হবে।"

এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা নিয়ে পরে অবশ্য বিতর্ক দেখা গেছে আমেরিকায় এবং একথা সত্য যে, এ সমস্যার সমাধান সহজ নয়। কারণ, ধর্মের একটি গঠনগত রূপ আছে যা এক ধর্মকে অন্য ধর্ম থেকে পৃথক করে, বিশ্বাসে ও ধর্মের আনুষ্ঠানিক পালনে। ধর্মের অন্য একটি রূপ হল, ধর্ম মানুষের বাহ্যিক আচরণকে বদলে দেয়। ধর্ম যে অর্থে কোন সম্প্রদায়ের বা কোন ব্যক্তি বিশেষের নিজস্ব বিশ্বাস, ফলে, বিশিষ্ট ও নির্বাচিত, সেখানে তা ব্যক্তিগত। কিন্তু ধর্ম বলতে যদি এমন কোন বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয় যা মানব প্রজাতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও সহজাত গুণ তা হলে তা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে অন্য ব্যক্তি বা সম্প্রদায় থেকে পৃথক করার কথা নয়।

অনুসন্ধিৎসা, সৃষ্টিশীলতা, প্রশ্ন করার প্রবণতা, ভালবাসার শক্তি, যোগাযোগ করার ক্ষমতা, বিশ্বজগৎ ও পারিপার্শিক ঘটনাপ্রবাহকে উপলব্ধি করা, এদের মধ্যে সম্পর্ক উদঘাটন এবং আবিষ্কৃত প্রকৃতির নিয়ম ব্যবহার করে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন— এসবই কি মানুষের ধর্ম নয়, যেমন পানির ধর্ম তাপে বাষ্প হওয়া, ঠাণ্ডায় কেলাসিত বরফে রূপান্তরিত হওয়া, বা সর্বদ্রাবক রূপে কাজ করা। আসলে ধর্মকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করলে ধর্ম শিক্ষাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিখাতে কোন বাধা থাখার কথা নয়। কিন্তু যে অর্থে ধর্ম প্রতিটি ধর্মভিত্তিক সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন এবং রাষ্ট্র এর অন্তর্গত সব নাগরিকের জন্য অভিণ্ন যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের অঙ্গিকারবদ্ধ, সেখানে সেই বিষয়গুলোই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যা বাইরে থেকে কোন পার্থক্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করে না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, শিক্ষার্থীদের সবাই অভিণ্ন বিষয় পড়ে না। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম শিক্ষা বিদ্যালয়ে পড়লে আপত্তি কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব হল, অভিণ্ন শিক্ষা ব্যবস্থা হচ্ছে এমন একটি শিক্ষার আয়োজন, যার সমস্ত উপাদান পরস্পরের পরিপূরক রূপে কাজ করে। একটি অভিণ্ন ব্যবস্থা বলতে সেই সব অংশের সমষ্টিকে বুঝায়, যাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটানো সম্ভব। যেমন, আমাদের মহাবিশ্ব সেই সব দূরের ও কাছের গ্যালাক্সি নিয়ে গঠিত যেখন আলো পরস্পরের কাছে পৌছতে পারে। যদি এমন কোন দূরের গ্যালাক্সি থাকে, যা এত দূরের এবং সেই কারণে এত দ্রুত ছুটে যাচ্ছে আমাদের কাছ থেকে যে, সেখান থেকে আলো আমাদের কাছে পৌছবেনা, অথবা আমাদের গ্যালাক্সি থেকে আলো সেখানে—তা হলে সেই গ্যালাক্সি আমাদের মহাবিশ্বের অংশ নয়। এই নীতিতে যে বিষয়গুলো পরস্পর থেকে ভিন্ন, কিন্তু সেই জ্ঞান যোগাযোগ

www.pathagar.com

সাধ্য। ফলে এক বিষয়ের শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে অন্য বিষয়ের শিক্ষার্থীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম, — সেক্ষেত্রে তারা মিলে একটি শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত। যেখানে ধর্মের কোন বিশেষ বিশ্বাস বা উপলব্ধি, সেই বিশেষ ক্ষেত্রের বাইরে যোগাযোগ সাধ্য নয়, এবং যার পাঠ পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব লাঘব না করে, দূরত্ব বৃদ্ধি করে। সে শিক্ষা সর্বজনীন হতে পারে না।

এর অর্থ অবশ্য এই নয় যে, ধর্ম শিক্ষা গুরুত্বহীন, বা এর প্রভাব প্রকাশ সাধ্য জ্ঞানের তুলনায় কম শক্তিশালী। যেমন, প্রকৃতিতে চারটি মৌলিক বল বা প্রভাব ক্ষেত্র আছে। যথা মহকর্ষ বল, তড়িৎ-চুম্বক বল, দুর্বল নিউক্লীয় বল ও প্রবল নিউক্লীয় বল। কিন্তু এর মধ্যে মহাকর্ষ বলই সর্বব্যাপী, যদিও সবচেয়ে দুর্বল। এবং মহাবিশ্বের বিভিন্ন গ্যালারক্সি পরস্পরের উপরে প্রভাব বিস্তার করছে মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্র কণিকা গ্রাভিট্রনের বিনিময়ে। তড়িৎ-চুম্বক বল কাজ করে শুধু চার্জযুক্ত কণিকার মধ্যে এবং নিউক্লীয় বল কাজ করে ক্ষুদ্র দূরত্বের মধ্যে। অথচ মহাকর্ষ বল আধান নিরপেক্ষভাবে সমস্ত বস্তুর উপরে সকল দূরত্বে কাজ করে বলেই— সর্বগামী এর প্রভাব। শিক্ষাকেও নিয়ন্ত্রণ করবে সেই সব জ্ঞান যা মানব সভ্যতাকে বিকাশমান, সমৃদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ করে, বিভাজন ও বিরোধকে বৃদ্ধি না করে।

কেউ হয়তো বলবেন, শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ তা হলে কে করবে? অভিনব ও বিচিত্র সব জ্ঞানের উদ্ভব যেখানে ঘটছে, মত পার্থক্য ও প্রতিযোগিতা যেখানে চলছে, সেই বিভক্ত বিচ্ছিন্ন সমাজকে একত্রে ধরে রাখার জন্য অবশ্যই নিয়মের বা নীতির আধার চাই। আসলে শিক্ষার মূল উপাদান হচ্ছে জ্ঞান। তথ্য ও জ্ঞান সৃষ্টির বিস্ফোরণ যেখানে ঘটছে, বিংশ শতাব্দীর এই শেষ লগ্নে, সেখানে জ্ঞানের জগৎকে বলতে পারি অতি দ্রুত গতির এবং অসম্ভব শক্তিধর বিপুল সংখ্যক বিন্দু বিন্দু জ্ঞান বা তথ্যের সমাবেশ। শক্তিধর অভিনব এসব জ্ঞানের সংগ্রহকে তুলনা করতে পারি প্লাজমার সঙ্গে। প্লাজমা হচ্ছে চার্জযুক্ত বস্তু কণিকার সমাবেশ, যেখানে বস্তু কণিকাগুলো এত উচ্চ তাপমাত্রায় থাকে ও এত দ্রুত গতিতে ছুটাছুটি করে যে, পরস্পরের সংঙ্গে সংঘর্ষে আয়নিত হয়ে যায়। কোন পাত্রে একে ধারণ করা যায় না। কারণ, মিলিয়ন ডিগ্রী তাপমাত্রায় সমস্ত পাত্রই গলে যাবে এবং তার চেয়ে বড় কথা, আয়নিত উচ্চ গতির কণিকা কোন পাত্রের দেয়ালে আঘাত করলে তা আয়নিত অবস্থা হারাবে ও পাত্রের গায়ে শোষিত হয়ে হারিয়ে যাবে। এই অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে বৈজ্ঞানিকরা চৌম্বক বোতলের কথা ভেবেছেন। এটি কোন বস্তুগত পাত্র নয়। চার্জযুক্ত কণিকা যখন ছোটে তার গতি একটি চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে, যা এই চার্জযুক্ত কণিকার উপরে আবার প্রভাব রাখে। চার্জযুক্ত কণিকাগুলোর গতিপথ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে যে, এর নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রই একে ধারণ করবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রও বাহ্যিক কোন নীতির পাত্র প্রয়োজন নেই, সেই কারণে যান্ত্রিক কোন নিয়ন্ত্রণ। জ্ঞান নিজেই এর ক্ষেত্র সৃষ্টি করে মূল্যবোধের ও রুচির, যা জ্ঞানের সাধকদের নিয়ন্ত্রণ করবে।

www.pathagar.com

শিক্ষার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের কথা এই প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয় ছিল না। আদর্শগত ও নীতিগত যে সমস্যা, অদৃশ্য সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক যে সমস্যা শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণের, যেখানে শিক্ষাহীন কোন স্বৈরাচার, একনায়ক বা গোষ্ঠী আপন স্বার্থ উদ্ধার ও ক্ষমতায় টিকে থাকার কৌশল রূপে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এবং ব্যবহার করতে চায় তাদের স্বার্থের বগিকে টানার ইঞ্জিন রূপে, সেখানে সমস্যা শিক্ষার স্বরূপ নির্ধারণের।

শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ হতে হবে জ্ঞানের উপাদানগুলোর পারস্পরিক প্রভাবে, তথ্যের ভিত্তিতে, অংশিদারিত্বের ভিতর দিয়ে। জ্ঞানের নিজস্ব যে প্রভাব ক্ষেত্র তা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে এর গতিশীলতায়।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান শিক্ষা

বিজ্ঞানের মূল কাজ হচ্ছে প্রকৃতির নিয়মগুলো ক্রমাগত শুদ্ধতর রূপে জানা ও তার প্রয়োগে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করা। ক্রমাগত নতুন উদ্ভাবন, আবিষ্কার, সংযোজন সংশোধন ও রূপান্তরের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানের জ্ঞান বিকাশ লাভ করছে বিশ্বজুড়ে। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির মূলে কাজ করছে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, পরিমাপণ, তত্ত্বনির্মাণ, বিশ্লেষণ ও গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগ— এবং সমগ্র তথ্য ও তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন। এখানে উপাত্ত সংগ্রহ, আপাতদৃশ্যমান ও পর্যবেক্ষণসাধ্য ঘটনার জগৎকে সম্প্রসারিত করার জন্য যন্ত্র নির্মাণ ও যন্ত্র উদ্ভাবন, এমনকি নতুন ভাষা, গণিত ও চিত্রকল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। বিজ্ঞানের এই সজীব গতিশীলতা, পরিবর্তনীয়তা ও সৃজনশীলতা বিজ্ঞান শিক্ষার ধারায় সুনিশ্চিত করতে হবে।

বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারে বিজ্ঞানীদের যে কঠোর শ্রম, সাধনা ও আত্মত্যাগ তার আড়ালে কাজ করে বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসা, প্রেরণা, সৌন্দর্যবৃদ্ধি ও শ্রম। বিজ্ঞান তাই যান্ত্রিক নয় মানবিক। বুদ্ধিগত শ্রমের মাধ্যমে অর্জিত বিজ্ঞানের জ্ঞান অসংখ্য বিজ্ঞানীর অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির ভাগ করে নেয়া অভিজ্ঞান। বিজ্ঞান সমগ্র মানব জাতির একটি যৌথ অভিযান, একটি সার্থক আয়োজন। এর জ্ঞান ক্রমাগত সঞ্চারিত ও সমন্বিত হয়ে এক পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক উপলব্ধি সৃষ্টি করে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে।

বিজ্ঞান তাই ভৌগলিক, জাতীয় ও ভাষাগত সীমা অতিক্রম করে সর্বজনীন, ব্যাপক এবং গভীর কর্মধারা রূপে আত্মপ্রকাশ করছে, যা বিশ্বসংস্কৃতির সবগুলো বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত। বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের এমন ভাবে প্রস্তুত করা যেন তারা প্রতিভা বিকাশ, জ্ঞানের সাধনা ও সৃষ্টিশীলতায় আন্তর্জাতিক মান অর্জন করতে পারে।

বিজ্ঞান শিক্ষার নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান কি? বিজ্ঞানের চর্চা কেন? বিজ্ঞান চর্চা কেমন করে করা হয়? বিজ্ঞানের বিকাশ কেমন করে ঘটেছে? উন্নত বিশ্বে এখন কি ঘটছে? বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ কি? বিজ্ঞানের সঙ্গে ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, অর্থনীতি, সভ্যতার ইতিহাস, আমাদের মূল্যবোধ, সৌন্দর্যবোধ ও নৈতিকতা কিভাবে সম্পর্কিত?

প্রযুক্তির বিকাশ, শিল্পায়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণে বিজ্ঞানের ভূমিকা কি? এসব প্রশ্নের আধুনিকতম জবাব ও উপলব্ধি বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ, শিক্ষাদার্শনিক ও বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে তা পটভূমি রূপে কাজ করবে শিক্ষানীতি প্রণয়নে। বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষা ও মানবিক শিক্ষার যে পারস্পরিকতা ও

www.pathagar.com

পরিপূরকতা তা উপলব্ধি করে একটি সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার অংশ রূপে বিজ্ঞান শিক্ষা কাজ করবে।

শিক্ষার্থীদের বুদ্ধির বিকাশ, উপলব্ধিক্ষমতা ও প্রয়োজনবোধের স্তরকে শিক্ষা লাভের ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, দক্ষতর ও প্রাসঙ্গিক করার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার চারটি স্তর রয়েছে। যথা— প্রাথমিক, মাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। এই স্তরগুলোর মধ্যে বিচ্ছিন্নতা না থাকলেও প্রত্যেকটি ধাপ এক ধরনের পূর্ণাঙ্গতা পাবে এবং সমন্বিত পর্যায়রূপে বিজ্ঞান শিক্ষার এক একটি একক রূপে কাজ করবে।

কেমন একটি বিশেষ ধাপ শেষ করে পরবর্তী ধাপে প্রবেশের সুযোগ যদি কোন শিক্ষার্থী না পায় তা হলেও যেন তার অর্জিত জ্ঞান ও উপলব্ধি তার জীবন ও জীবিকার সহায়ক হয় এমনভাবে পাঠক্রমগুলো বিন্যস্ত হবে। এই স্তরভাগ প্রাতিষ্ঠানিক নয়, মূলত শিক্ষাগত।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষা হবে প্রথম প্রাথমিক স্তর। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা হবে দ্বিতীয় প্রাথমিক স্তর। মাধ্যমিক স্তরের দুটো ভাগ থাকবে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক স্তর বিস্তৃত হবে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। এর দুটো উপস্তর থাকবে। প্রথশ উপস্তরটি হবে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। দ্বিতীয় উপস্তরটি হবে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত।

বিজ্ঞান শিক্ষা প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হওয়া উচিত। বস্তুত শিশুরা তাদের অনুসন্ধিৎসা জানার সহজাত আগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ প্রবণতায় প্রকৃত একজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সহজাত বৈজ্ঞানিক সুলভ মানসিকতা ও প্রশ্ন করার স্বাধীনতা বাধা প্রাপ্ত ও নিরুৎসাহিত হয়ে আসছে। শিশুদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে প্রকৃতির ঘটনামালা ও সহজ নিয়মগুলোর সঙ্গে পরিচিত করে। শিশুর বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু হতে হবে সাহিত্য পাঠের আবহে, শিশুর অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে দৃষ্টান্ত নিয়ে। পরীক্ষা করার ও নতুন উপলব্ধি লাভের আনন্দ যাতে শিশু লাভ করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

শিশুরা শুধু নিরস বইয়ের তথ্য জানতে চায় না। প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে নিজেই তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে এবং সেই সঙ্গে তার লব্ধ তথ্যকে সে সাজাতে চায় তার নিজস্ব যৌক্তিক কাঠামোতে। শিশুরা প্রশ্ন করতে চায় এবং সে সব প্রশ্নের জবাব পেতে চায়।

শিশুদের বুঝতে দিতে হবে যে বিজ্ঞানের জ্ঞান বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন ও ক্রমাগত সংশোধন ও রূপান্তরের ভিতর দিয়ে শুদ্ধতর রূপে প্রকাশ করেন। সক্রিয় ও সজীব অংশগ্রহণের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞানীরা এই জ্ঞান সৃষ্টি করছেন। বিজ্ঞানের বিকাশের পথ তাই উন্মুক্ত ও অন্তহীন।

কর্তৃত্বব্যঞ্জক পদ্ধতির পরিবর্তে শিক্ষার্থীর স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও প্রশ্ন করার প্রবণতাকে শিক্ষক উৎসাহিত করবেন। সেই সঙ্গে সঠিক তথ্য প্রদান করে শিক্ষার্থীর ভুল সংশোধন করবেন। শিক্ষার্থী যুক্তির অন্ধগলিতে আটকে গেলে তাকে সাহায্য করবেন সঠিক পথে অগ্রসর হতে।

www.pathagar.com

এই উদ্ভাবনমূলক বিজ্ঞান শিক্ষা শিক্ষার্থীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুটো কারণে। প্রথমত উপাত্ত ও তথ্য অপরিবর্তী নয়। শিক্ষার্থী বড় হয়ে যখন তার ছোট বেলার শেখা তথ্য ব্যবহার করতে চাইবে, দেখবে অনেক তথ্যের পরিবর্তন ও সংশোধন ঘটেছে। দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান যে অপরিবর্তী নিরস কিছু তথ্যের সংগ্রহ নয়, একটি সৃজনশীল সক্রিয় ও আনন্দপূর্ণ কর্মধারা প্রকৃতির রহস্যোদঘাটনের, এই সত্যটি যাতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থী লাভ করতে পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে পাঠের বিষয় নির্বাচন, পাঠ্যবই রচনা ও পাঠদানের পদ্ধতিতে।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রকৃতি পাঠ, পরিবেশ, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্ব পাবে। দৈনন্দিন জীবনের নানা ক্ষেত্রে, যেমন কৃষিকাজে, গৃহনির্মাণে, কলকারখানায় নানা সামগ্রীর উৎপাদনে, পথ-ঘাট ব্রীজ ও বাঁধ নির্মাণে ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে প্রয়োগ চলছে, সেদিকে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে হবে পাঠদানের ভিতর দিয়ে।

প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ঘটনার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিমূর্ত ধারণা প্রদান যথাসম্ভব সীমিত রাখতে হবে। প্রকৃতি, পরিবেশ এবং পারিপার্শিক ঘটনামালা সম্পর্কে শিশুরা যাতে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, সে জন্য নানা চিত্র প্রদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও সহজ নানা পরীক্ষণের আয়োজন থাকবে।

শিক্ষার্থীদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সহজলভ্য ও সরল হবে, যা বিজ্ঞান শিক্ষক ছাত্রদের সহযোগিতা নিয়ে নির্মাণ করতে পারবেন। এজন্য যন্ত্রনির্মাণ ও বৈজ্ঞানিক প্রজেক্ট তৈরি এবং পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের সহায়তাদানকারী বই রচিত হবে। সহজ সব প্রদর্শনমূলক (Demonstrative) পরীক্ষা নিরীক্ষা ও যন্ত্রনির্মাণের কাজ নির্দিষ্ট পাঠদানের বাইরে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের আবহে বিজ্ঞান মেলার পরিবেশে ঘটতে পারে।

এই স্তরে পরীক্ষাগুলো যেহেতু কোন তত্ত্ব যাচাই বা উপাত্ত সংগ্রহমূলক নয় বরং প্রদর্শনমূলক, ফলে সূক্ষ্ম পরিমাপ এখানে প্রয়োজন নেই। যেমন, লোহা যে কাঠের চেয়ে বেশি তাপ পরিবাহী, কালো কাপড় যে সাদা কাপড়ের চেয়ে বেশি বিকিরণ শোষণ করে নেয়, বাতি জ্বলতে যে অক্সিজেনের প্রয়োজন, গাছের জন্য যে আলো প্রয়োজন—এসবই নিচের ক্লাসে প্রদর্শন করা সম্ভব সহজ নানা পরীক্ষার দ্বারা। কিন্তু পরিমাণগতভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করতে গেলে সূক্ষ্ম ও জটিল যন্ত্র প্রয়োজন, যা উপরের ক্লাসে লাগবে।

লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষার্থীরা যেসব পরীক্ষা করবে তা যেন আসল (True) পরীক্ষা হয়। অর্থাৎ নতুন তথ্য সংগ্রহ বা পর্যবেক্ষণলব্ধ নতুন জ্ঞান প্রদানে সহায়ক হয়। যেমন, অজানা বস্তুর দৈর্ঘ্য মাপা, বৃষ্টিপাত মাপা, পোকামাকড় সংগ্রহ করে বিবর্ধক কাচের সাহায্যে এদের পর্যবেক্ষণ করা ও তা লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি—নতুন অভিজ্ঞতা লাভ ও আনন্দ সৃষ্টিতে সহায়ক হতে পারে। একঘেয়ে ও গতানুগতিক পরীক্ষা, পরীক্ষার ফল আগে থেকেই জানা এমন পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করেনা এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা যে নতুন তথ্য সংগ্রহ বা বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক উদ্‌ঘাটনের জন্য গুরুত্বপূর্ এই উপলব্ধি তাদের মধ্যে জাগ্রত করতে ব্যর্থ হয়।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের বইতে যথাসম্ভব আধুনিকতম আবিষ্কারের ঘটনা ও দৃষ্টান্ত সহজভাবে উপস্থাপিত হতে হবে। শিশুরা ছোট বলে তাদেরকে শুধু পুরানো ও গতানুগতিক উদাহরণ ও তথ্যের সঙ্গে পরিচিত করার যে প্রবণতা পাঠ্যবই রচনার ক্ষেত্রে রয়েছে, তা দূর করতে হবে।

বিজ্ঞানের বই পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা যেন উপলব্ধি করে যে, সে আধুনিক যুগে বাস করছে। বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেসব আবিষ্কার চলছে এবং আমাদের দেশে বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ও প্রচেষ্টা চলছে তার প্রতিফলন বইতে থাকবে আকর্ষণীয় বর্ণনায়।

শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানকে অতীতের বা বিদেশের ব্যাপার বলে শুধু জানবেনা, নিজস্ব সমাজ ও কালের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে সম্পর্ক এবং ভবিষ্যতে যে সম্ভাবনার দাঁড় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্মোচিত করতে পারে, সেদিকে শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করবে।

বিজ্ঞানের বিষয়গুলো অসংলগ্ন ও বিচ্ছিন্ন তথ্য রূপে উপস্থাপিত না হয়ে, একটি সমন্বিত সজীব কর্মকাণ্ড রূপে বিজ্ঞানের বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ ঘটছে প্রযুক্তিতে, ফলে নানা যন্ত্রপাতির বর্ণনা বিজ্ঞানের বইতে অন্তর্ভুক্ত করার এবং বিজ্ঞানের প্রায়োগিক ও প্রযুক্তিগত দিক বেশি করে তুলে ধরার প্রবণতার ফলে বিজ্ঞানের বই ভারাক্রান্ত ও অনাকর্ষণীয় হয়ে পরে। বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য যে প্রকৃতির নিয়মগুলো জানা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, বিজ্ঞানের বইতে ও বিজ্ঞান পাঠের পদ্ধতিতে তা প্রতিফলিত হতে হবে।

ছোটদের হাতেকলমে প্রযুক্তির কৌশল শিখানো বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য নয়। বরং বিভিন্ন যন্ত্র নির্মাণে বিজ্ঞানের মূল যে নীতি কাজ করছে তার সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করার দিকে শুধু লক্ষ্য থাকবে।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার একটি সমন্বিত কোর্স থাকবে। জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা পৃথক পৃথক শৃঙ্খলা রূপে এই পর্যায়ে চিহ্নিত হলেও, এদের মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও পরিপূরকতা রয়েছে, সেই ব্যাপারটি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হবে পাঠক্রমে।

বিজ্ঞানের সাধারণীকৃত ধারণা (Generalized concepts), বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, বিজ্ঞানের সঙ্গে ব্যক্তিজীবন, সামাজিক জীবন এ সভ্যতার যে সম্পর্ক, তা কিছুটা ইতিহাসের দৃষ্টিতে, কিছুটা দার্শনিক দৃষ্টিতে, কিছুটা মানবিক ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এবং বিজ্ঞানীদের ব্যক্তি প্রচেষ্টা, তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতার আলোকে উপস্থাপিত হবে।

শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়স বৃদ্ধি পাবার পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো এই উপস্তরে বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে, পরিমাণগত ভাবে গাণিতিক পদ্ধতিতে ও কার্যকারণের আলোকে উপস্থাপিত হবে।

অষ্টম শ্রেণীর পর অনেক শিক্ষার্থী বিজ্ঞান শাখার পরিবর্তে মানবিক, সমাজবিজ্ঞান বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য পৃথক হয়ে পড়বে, অনেকেই আবার এই পর্যায়ে শিক্ষা শেষ করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে। ফলে, বিজ্ঞান শিক্ষাকে এক ধরনের পূর্ণাঙ্গতা ও সার্বিকতা দিতে হবে এই স্তরে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান শিক্ষা এই উপস্তরে উদার, মানবিক ও ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে জীবনের বৃহত্তর পরিসরে বিজ্ঞান যে চিন্তার শৃঙ্খলা, যৌক্তিকতা, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, কার্যকারণ সম্পর্ক উদ্‌ঘাটনের ও বিশ্লেষণের শক্তি দেয়, তা শিক্ষার্থী অর্জন করতে সক্ষম হবে।

মাধ্যমিক স্তরের দুটো উপস্তর থাকবে। নবম ও দশম শ্রেণীকে নিয়ে প্রথম মাধ্যমিক স্তর এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে নিয়ে দ্বিতীয় মাধ্যমিক স্তর।

মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগের বাইরে অন্য সকল শাখায় সাধারণ বিজ্ঞান আবশ্যক বিষয়রূপে পড়ানো হবে। এতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রধান বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। বিজ্ঞানের মানবিক ও কল্যাণকর দিক এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক, বিজ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক, বিজ্ঞানের ইতিহাস ও দর্শন যথাসম্ভব সহজ ও আকর্ষণীয়ভাবে সমন্বিত দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে পড়ানো হবে। মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা বাংলা ও ইংরেজিসহ পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা ও গণিত আবশ্যিক বিষয় হিসাবে পড়বে। এছাড়া ইতিহাস ও ভূগোল একত্রে একটি আবশ্যিক বিষয়রূপে পড়বে এবং আরো দুটো বিষয় ঐচ্ছিক হিসাবে নিবে। নবম ও দশম শ্রেণীতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ঐচ্ছিক বিষয়ের মধ্যে থাকবে ঃ উচ্চতর গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, প্রাথমিক অর্থনীতি, বস্ত্র ও পরিচ্ছদ, আবহাওয়াবিদ্যা, কারিগরী অঙ্কন ইতাদি।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী নিয়ে যে উপস্তর তা দ্বিতীয় মাধ্যমিক স্তররূপে গণ্য হবে। বাংলা ও ইংরেজি ছাড়াও গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যা আবশ্যিক বিষয় হিসাবে থাকবে। পঞ্চম বিষয়টি নিচের যে কোন একটি হতে পারে।

জীববিজ্ঞান, ভূগোল, কম্পিউটার বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, অর্থনীতি, পুষ্টিবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, প্রকৌশল অঙ্কন, ওয়ার্কশপ প্র্যাকটিস, কৃষিবিজ্ঞান, পরিবেশ বিজ্ঞান ইত্যাদি।

মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার মান ও ধারা আন্তর্জাতিক মানে উন্নিত করার লক্ষ্যে ধাপে ধাপে উন্নতর পাঠক্রম প্রবর্তন করতে হবে। এজন্য পাঠ্যসূচি উন্নয়নের সাথে সাথে পাঠ্যবই ও শিক্ষকের মান দ্রুত উন্নত করতে হবে।

উন্নত ও আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞানের পাঠ্যবই রচনার জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি নির্বাচন এবং প্রয়োজনবোধে ইংরেজি ভাষায় রচিত অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ পাঠ্য বইয়ের অনুসরণে বই লেখা যেতে পারে। বিজ্ঞান যেহেতু আন্তর্জাতিক কর্মকাণ্ডরূপে প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে অভিন্ন এক উপলব্ধি সৃষ্টি করছে, বিদেশী ভাল বিজ্ঞান বইয়ের অনুবাদ অথবা এর অনুসরণে লেখা বাংলা বই একদিকে আমাদের পাঠ্য বইয়ের মানকে উন্নত করবে অনদিকে আমাদের ভাষা সমৃদ্ধ হবে আধুনিকতম তথ্য ধারণ করে।

বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয়ের তুলনায় যোগ্য ও সফল শিক্ষকের সংখ্যা অপ্রতুল এবং বিজ্ঞানের তথ্য দ্রুত নবায়িত ও পরিবর্তিত হচ্ছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ছাত্র সংখ্যা ও তথ্য বিস্ফোরণের এই সমস্যা সমাধানে আধুনিক শিক্ষা প্রযুক্তির সব কৌশল দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষা দানের প্রতিটি স্তরে রেডিও, টেলিভিশন,

www.pathagar.com

অডিও রেকর্ড, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট ইত্যাদি ইলেকট্রনিক মাধ্যম বিজ্ঞান শিক্ষার কাজে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে পূর্বিতা লাভ করবে।

বিজ্ঞানের যে দু'টি মাত্রা, যথা প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি, তা শিক্ষার্থীদের বুঝতে দিতে হবে। এই দু'টো মাত্রা পরস্পরের পরিপূরক রূপে কাজ করে। কোন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর বর্ধিত জ্ঞান তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতর করে। আবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্পর্কে তার দক্ষতা ও উপলব্ধি বৃদ্ধি তাকে বিজ্ঞান সম্পর্কে গভীরতর ও বিস্তৃততর জ্ঞানার্জনে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীর বয়সের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিজ্ঞান শিক্ষার এই দুই মাত্রার মিশ্রণ ঘটাতে হবে।

অসংলগ্ন ধারণা বা তথ্য প্রদানের পরিবর্তে মৌলিক ধারণার ভিত্তিতে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো উপস্থাপিত হবে পাঠ্য বইয়ে, যেমন ভ্যালেন্সি বা পারমাণবিক গঠন, পারমাণবিক বন্ধন প্রভৃতির জ্ঞান প্রয়োগ করে রসায়ন বিদ্যায় শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। মাধ্যমিক স্তরেই গণিতের আধুনিক সব ধারণা, যেমন সেট থিউরী, গ্রুপ থিউরী বা সংখ্যাতত্ত্ব সহজভাবে দৃষ্টান্ত সহকারে উপস্থাপিত হতে পারে। পদার্থ বিজ্ঞানে ভর, শক্তি, ভরবেগ, চার্জ ইত্যাদির নিত্যতার নিয়ম, স্থান ও কালের প্রতিসাম্যের ধারণা গভীর উপলব্ধি দিতে পারে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে।

জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞান মৌলিক কণিকা থেকে গ্যালাক্সি ও মহাবিশ্বের জ্ঞানকে একীভূত করার নতুন উপলব্ধি দিয়েছে। ডি. এন. এ'র আণবিক গঠন জানার ভিতর দিয়ে জীববিদ্যা সমন্বিত হয়েছে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার সঙ্গে। সাইবারনিটিক্স যন্ত্রবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যার মধ্যে মিথোজীবিতা সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞানের এসব বিষয় জ্ঞানের জগতকে দর্শনের চেয়েও সর্বজনীনতা ও ব্যাপকতা দিয়েছে, এবং বিশ্ব সংস্কৃতি ও চেতনার ঐক্য সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের এই নতুন দিগন্তের সঙ্গে পরিচিত করতে হবে।

মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে উপলব্ধি ও বিশ্লেষণের ক্ষমতাকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায়।

তথ্য বিস্ফোরণ এবং সেই সঙ্গে তথ্য সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও সঞ্চারণ সহজতর হবার কারণে তথ্য মুখস্থ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রদান ও মেধা যাচাই পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন সাধন করে উপলব্ধির গভীরতা ও সৃজনশীলতার ভিত্তিতে মেধা যাচাই করতে হবে।

ক্রমবিস্তারমান জ্ঞানের জগতের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করার ও বিচিত্র বিষয়ে তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে পাঠ্যবইয়ের বাইরে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপরে গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য যোগ্য লেখকদের বিজ্ঞানের জনবোধ্য বই রচনায় উৎসাহিত করতে হবে এবং বই প্রকাশ ও বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে পাঠাগার গড়ে তুলতে হবে এবং পাঠ্যবইয়ের বাইরে সহায়ক বই পড়তে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

উদ্ভাবনমূলক ও উপলব্ধি ভিত্তিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যোগ্য শিক্ষক সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য মেধাবী ও সৃজনশীল স্নাতকদের শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করতে হবে।

www.pathagar.com

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের সান্নিধ্যে এনে, এবং সর্বক্ষণ আধুনিকতম জ্ঞানে সমৃদ্ধ রাখতে সঞ্জীবনী কোর্স প্রদান করতে হবে প্রতিটি শিক্ষককে অন্তত প্রতি চার বছরে একবার।

বিজ্ঞান শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ও আনন্দদায়ক করার জন্য শিক্ষার্থী যাতে তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষালাভের সুফল দেখতে পায় নিজের জীবনে, তা নিশ্চিত করতে হবে।

বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশের ফলে, এর বিস্তার, জটিলতা ও গভীরতা এত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, সব প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও উপলব্ধি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও নির্বাচিত পাঠ্যসূচির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। একজন বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান তার সৃজনশীলতা ও সম্ভাবনা, পাবলিক পরীক্ষার ফলে প্রতিফলিত করা সম্ভব নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। অন্যদিকে বিজ্ঞান এত সর্বজনীন ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা যাঁরা লাভ করেনি তাদের কাছেও বিজ্ঞানের তথ্য, এর উপলব্ধি ও চেতনা পৌঁছে দেয়া অপরিহার্য। কারণ, সমগ্র উন্নয়ন পরিকল্পনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান সবচেয়ে বেশি, এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অবহিত জনগণই শুধু কার্যকরভাবে অংশ নিতে পারে।

এছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা ব্যয়বহুল এই অর্থ যোগান দেয় সাধারণ মানুষ। ফলে, তাঁদের অধিকার ও দায়িত্ব আছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে অন্তত সাধারণ ধারণা লাভের।

এ সবকিছুর জন্যেই প্রতিটি শহরে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্র এবং রাজধানীতে একটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শহর গড়ে তুলতে হবে। এইসব কেন্দ্রে বিভিন্ন পেশাদার সোসাইটির সভা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞান ক্লাব ও বৈজ্ঞানিক সংগঠন কাজ করবে। সৌখিন উদ্ভাবকরা স্বাধীনভাবে গবেষণা ও আবিষ্কারের কাজ করার সুযোগ পাবে। বিজ্ঞান যাদুঘর, বিজ্ঞান পাঠাগার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি থাকবে এবং বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম ক্রয় বা ধার করার ব্যবস্থা থাকবে। এই কেন্দ্রগুলো পরিচালনা ও পরিকল্পনা করবেন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণ।

স্নাতক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষা সাধারণভাবে চার বছর মেয়াদী হবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্নতমানের কিছু কলেজ ছাড়া অনেক ডিগ্রী কলেজে এই মুহূর্তে চার বছরের স্নাতক কোর্স প্রদান সম্ভব হবে না বলে, পরিবৃত্তিকালের জন্য এই সব কলেজে তিন বছরের স্নাতক কোর্স থাকবে।

তিন বছরের বি.এস.সি কোর্সে বারটি পত্র থাকবে। এই পর্যায়ে বিজ্ঞানের নিম্নলিখিত শাখাসমূহের কোর্স থাকবে ঃ

গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ভূগোল, ফার্মাকলোজি, পুষ্টিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি।

প্রতিটি বিষয়ে একশ নম্বরের তিনটি পেপার থাকবে। তিন বছরের স্নাতক শ্রেণীতে বারটি পেপার নিতে হবে। এর মধ্যে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে থাকবে দুইশ নম্বরের

www.pathagar.com

গণিত, দুইশ নম্বরের পদার্থবিদ্যা ও দুইশ নম্বরের রসায়ন বিদ্যা। বাকী ছয়শ নম্বরের ছয়টি পেপার ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নেয়া যাবে।

চার বছরের স্নাতক ডিগ্রীর বেলায় একটি প্রধান ও দু'টি সহায়ক বিষয় থাকবে। মূল বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন দু'টি বিষয় সহায়করূপে নেয়া যাবে। মূল বিষয় ও সহায়ক বিষয়গুলোর নম্বর সমন্বিত করে শিক্ষার্থীর ফল নির্ধারণ করা হবে। মোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অনার্স বা বিশেষ ক্লাস প্রাপ্তি নির্ধারিত হবে।

কোন শিক্ষার্থী যদি চার বছরের কোর্স সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয় এবং অন্তত অর্ধেক কোর্স সম্পন্ন করে, তা হলে তাকে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট দেয়া যেতে পারে। যা নিম্ন স্নাতক Lower graduation রূপে গণ্য হবে।

চার বছরের স্নাতক ডিগ্রী প্রান্তিক ডিগ্রী রূপে গণ্য করা হবে। ফলে, উচ্চতর স্তরে শিক্ষা দান বা গবেষণার কাজে নিযুক্ত হওয়া ভিন্ন, অন্য সকল ক্ষেত্রে এই স্নাতক ডিগ্রী পর্যাপ্ত বলে গণ্য করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষক ও ভৌত সুবিধাদিসহ উচ্চমানের নির্বাচিত কলেজেই শুধু স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদান করা যাবে। এজন্য গবেষণা ল্যাবরেটরী, প্রয়োজনীয় বই ও জার্নাল সমৃদ্ধ লাইব্রেরী, গবেষণার এবং অভিজ্ঞতাসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক থাকতে হবে।

স্নাতকোত্তর ডিগ্রীগুলো হবে এম.এস.সি, এম.ফিল ও পিএইচ-ডি। তিন বছরের স্নাতকোত্তর শুধু উচ্চতম গ্রেড প্রাপ্তরাই এই সুযোগ পাবে। চার বছরের ডিগ্রী প্রাপ্তদের জন্য নূন্যতম এক বছর লাগবে এম.এস.সি ডিগ্রী অর্জনে। দুই বছর লাগবে এম. ফিল ডিগ্রী পেতে এবং তিন বছর লাগবে পিএইচ-ডি ডিগ্রী পেতে।

তিন বছরের স্নাতকদের জন্য দুই বছর লাগবে এম.এস.সি করতে। এম.এস.সি ডিগ্রী করার পরই শুধু এরা এম.ফিল বা পিএইচ-ডি'তে ভর্তি হতে পারবে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর জন্য গবেষণায় মৌলিক অবদান রাখতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কোর্সওয়ার্ক করতে হবে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর ছাত্র হিসাবে উচ্চ মেধা সম্পন্ন সৃজনশীল ব্যক্তিদের শুধু নির্বাচন করা হবে। এই শিক্ষা যাতে আন্তর্জাতিক মানের হয় সে লক্ষ্যে পাঠক্রম ও গবেষণা পরিচালিত হতে হবে যোগ্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান শিক্ষার অনেকগুলো লক্ষ্য আছে, যথা বিজ্ঞান চর্চার উচ্চতম মান রক্ষা করা, জ্ঞানদক্ষ ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি করা এবং সর্বোপরি নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে অংশ নেয়া। বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণা, প্রকৃতি ও বিশ্বজগৎ সম্পর্কে যে গভীর উপলব্ধি দেয়, দীর্ঘমেয়াদী ও অব্যাহত অর্থনৈতিক উন্নয়নে ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে যে অবদান রাখে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রায় যে সূক্ষ্ম ও ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে এবং জাতীয় চেতনা ও প্রেরণা সৃষ্টিতে যে ভূমিকা রাখে— তার তুল্য অন্যকোন আয়োজনের কথা আমরা ভাবতে পারি না। আর এজন্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ কি? তা নির্ভর করবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিরূপ পরিগ্রহ করবে আগামী দিনগুলোতে তার উপরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তখনই শুধু এর উচ্চতম মান ও দক্ষতা লাভ করে, যখন গবেষণার ও মুক্তবুদ্ধির আবহে তা পরিচালিত হয়। যাঁরা নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে এবং

www.pathagar.com

পুরানো ধ্যান-ধারণা ও ভাবনাকে বিশ্লেষণ করে নতুন উপলব্ধি সৃষ্টির কাজে নিয়োজিত, তাঁরা শিক্ষার্থীদের মধ্যে শুধু জ্ঞান সঞ্চারিত করেন না, সেই সঙ্গে সত্যানুসন্ধান ও জ্ঞান সৃষ্টির প্রেরণাও সঞ্চারিত করেন। শিক্ষা দানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গবেষণায় নিয়োজিত থাকা তাই অপরিহার্য।

শিক্ষকগণ যখন গবেষণা পরিচালনা করেন, তখন একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ গবেষক হবার প্রশিক্ষণ দান করেন ও নিজে গবেষণা করেন। দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী জাতীয় সমস্যা সমাধানে এবং উন্নয়নের কৌশলগত অবস্থান নির্ধারণে এই গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও স্নাতক স্তরের শিক্ষা যদি জ্ঞান দান, সুনাগরিক সৃষ্টি ও সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য হয়, স্নাতকোত্তর শিক্ষা হচ্ছে নতুন জ্ঞান ও নতুন চেতনা সৃষ্টির ভিতর দিয়ে সামাজিক অগ্রগতির জন্য ত্বরণ সৃষ্টি।

স্নাতকোত্তর গবেষণার মান, বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কোন জাতির অগ্রগতির স্তর নির্ধারণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যখন উচ্চমান সম্পন্ন এবং যথেষ্ট সংখ্যক পিএইচ-ডি ডিগ্রী প্রদানে সক্ষম হয়ে উঠে, একটি উত্তরণের স্তর তখন সে দেশ অতিক্রম করে। আমাদের উচ্চশিক্ষার ও প্রযুক্তির শিক্ষাকে গবেষণা ও জ্ঞান সৃষ্টির সেই আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যেতে হবে। এজন্য ভৌত কাঠামো সৃষ্টি, উচ্চমানের জনশক্তি গড়ে তোলা, অর্থ বিনিয়োগ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সৃষ্টি ও উন্নত অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করতে হবে।

বিজ্ঞানের জ্ঞান দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। কারো কারো মতে প্রতি দশ বছরে এই জ্ঞান দ্বিগুণ হচ্ছে। এদিকে প্রযুক্তির রূপান্তর ঘটছে দ্রুত এবং তা ক্রমাগত বেশি করে বিজ্ঞান নির্ভর ও নতুন তথ্য নির্ভর হয়ে উঠছে, শ্রম কেন্দ্রীকতা কাটিয়ে। তথ্য বিপ্লব ও তথ্যের দ্রুত সঞ্চারণ নতুন এক নৈকট্য ও নিরবচ্ছিন্নতা দিচ্ছে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তথ্যের ক্ষেত্রে।

সমগ্র নতুন ও আধুনিকতম পদ্ধতিতে শিল্প সামগ্রী প্রবেশ করছে বাংলাদেশের মতন অনুন্নত দেশগুলোতেও। এমতাবস্থায় দারিদ্র্যের অজুহাতে শুধু গ্রামীণ প্রযুক্তি, লাগসই প্রযুক্তি ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার অবকাশ নেই। একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে বাংলাদেশের টিকে থাকার একমাত্র পথ হল, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আত্মস্থ করার চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করা। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন ধারাকে স্থিতিশীল করার একমাত্র পথ হল প্রযুক্তির স্থানান্তরণের প্রচেষ্টা শুধু নয়, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের স্থানান্তরণ নিশ্চিত করা, যে কথা প্রফেসর আবদুস সালাম অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন।

বস্তুত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জাতীয় উন্নয়নের জন্য স্বার্থকভাবে কাজে লাগাতে হলে, মৌলিক গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা, উন্নয়ন গবেষণা, উৎপাদন ও বাজারজাত (Basic research, Applied research, Development, Production ও Marketing) করণের যে উদ্ভাবন চক্র তা সম্পন্ন করতে হয়।

তথ্য ও জ্ঞানের বিস্ফোরণ একদিকে যেমন জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে গভীর, জটিল, গূঢ় ও নির্বাচিত করে তুলেছে, ফলে, আপাত বিচ্ছিন্ন নানা জ্ঞানের শাখা উদ্ভব ঘটেছে বিশেষজ্ঞের বিষয়রূপে, তেমনি জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তার জ্ঞানের বিভিন্ন

www.pathagar.com

শাখার মধ্যে আন্তঃমিল, পারস্পরিকতা ও পরিপূরকতা দিয়েছে। যেমন, রঞ্জনরশ্মির ব্যবহার আমরা দেখতে পাই পদার্থ বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ, জীব বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, ভূ-বিজ্ঞানী, প্রত্নতত্ত্ববিদ, এমন কি একজন ইতিহাসবিদের ক্ষেত্রে। মৌলিক কোয়ান্টাম তত্ত্ব ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার প্রযুক্তি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন এবং অভিনব সব জমাট পদার্থের উদ্ভাবন ও প্রয়োগের ভিত্তি রূপে কাজ করছে।

আধুনিক বিজ্ঞান যেমন প্রযুক্তিকে উচ্চতর মানে ও বৈচিত্র্যে নিয়ে যাচ্ছে, প্রযুক্তির অগ্রগতিও তেমনি মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণাকে নতুন সব যন্ত্রের উদ্ভাবন ও উপার্জিত অর্থের বিনিয়োগে সম্ভব করে তুলছে। ডিএনএ এর গঠন আবিষ্কার, যে বায়োটেকনোলজি ও বায়োইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্ম দিয়েছে, সেটি আর একটি দৃষ্টান্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পারস্পরিকতার। বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার আরেকটি দৃষ্টান্ত, যেখানে নিউক্লিয়ার পদার্থবিদ্যার অগ্রগতি বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রেও অবদান রেখেছে, নিউক্লিয়ার বিকিরণ দ্বারা পরিব্যক্তি ঘটিয়ে নতুন ধরনের ফসল উদ্ভাবন করে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখার এই যে আপাত পরস্পর বিরোধী দুই বৈশিষ্ট্য, যথা একই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ও নির্বাচিত হয়ে উঠা এবং পারস্পরিকতায় পরিপূরক হয়ে উঠা, তা ধারণ করতে পারে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে প্রত্যেক গবেষক তার নির্বাচিত বিষয় নিয়ে জ্ঞানের সীমান্তে পৌছার স্বাধীনতা যেমন পাবে, তেমনি বিভিন্ন শাখার জ্ঞান সম্মিলিতভাবে যে বিকাশমান দিগন্ত সৃষ্টি করে জ্ঞানের, তার প্রভাবকে অনুভব করবে।

সব বিশ্ববিদ্যালয়ই যথার্থ অর্থে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠবে বিভিন্ন বিভাগ ও অনুষদের সমন্বয়ে, বিষয় ভিত্তিক বা অনুষদ ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত না হয়ে। এতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সুস্থ্ মিথস্ক্রিয়া যেমন ঘটতে পারবে, তেমনি একটি ব্যবস্থাপনাগত সুবিধাও সৃষ্টি হবে।

আধুনিক লাইব্রেরী ও উন্নত গবেষণাগারের সুযোগ অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক একত্রে ব্যবহার করবে বলে খরচ কম হবে। অন্যদিকে সময়ের সঙ্গে কোন বিষয়ের গুরুত্ব যদি বৃদ্ধি পায় এবং অন্য বিষয়ের গুরুত্ব যদি হ্রাস পায়, তা হলে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এই পরিবর্তনীয়তা ধারণ করা যাবে। গতিশীলভাবে উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনা এতে সহজতর ও কম অপচয়ী হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান গভীরভাবে নির্ভরশীল এর গবেষণার মান দ্বারা। গবেষণার জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে এই লক্ষ্যে যে, উচ্চতর বিজ্ঞানের গবেষণা জাতীয় সমস্যা সমাধান ও উন্নয়ন সাধনের জন্যেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার পরিবেশ উন্নয়ন করা ও গবেষকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি না করলে, ভয়াবহ যে মেধা পাচার ঘটছে, বাহ্যিক ও অন্তরগত, তা রোধ করা যাবে না।

পরীক্ষাগার ও ল্যাবরেটরী উন্নয়নের জন্য ইকুইপমেন্ট বোর্ড পুনঃস্থাপন করতে হবে অবিলম্বে। যন্ত্রউদ্ভাবন ও উন্নয়ন বস্তুত প্রযুক্তির অগ্রগতি ও শিল্পায়নের মূল ভিত্তি রূপে কাজ করেছে উন্নত দেশগুলোতে। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা, নতুন তথ্য উদ্ভাবন, তত্ত্ব

www.pathagar.com

সৃষ্টি ও উপলব্ধি এবং এদের যথার্থতা যাচাই করার ক্ষেত্রেই শুধু অপরিহার্য নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যে সব শব্দ, পদ ও ধারণা, যেমন— ভর, চার্জ, বল, শক্তি, ভরবেগ, তাপমাত্রা, চুম্বকক্ষেত্র ইত্যাদির করণ অর্থ বা operational meaning, তা প্রদানের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র নির্মাণ ও উদ্ভাবন অপরিসীম গুরুত্বের। স্থানীয়ভাবে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্মাণ ও উদ্ভাবন বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে গভীর এক মাত্রা সংযোজন করে। এই আয়োজন শুধু স্থানীয় নির্মাণ বস্তুর ব্যবহার ও ভৌত অবকাঠামো সৃষ্টিকেই উৎসাহিত করে না, স্থানীয় মেধা ও সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত ও সংগঠিত করে। ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের মূলেও ছিল যন্ত্র নির্মাণ ও উদ্ভাবন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র নির্মাণ, উদ্ভাবন ও উন্নয়নের পরিকল্পনা ও আয়োজন স্থানীয়ভাবে দক্ষ কৃৎকৌশলী, প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করে। এর কারণ, মৌলিক গবেষণায় ব্যবহৃত যন্ত্র ও পরিমাপ কৌশলগুলোর সঙ্গে উন্নত শিল্প কারখানার ব্যবহৃত যন্ত্র ও পরিমাপ কৌশলে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। প্রকৃতির নিয়মগুলো জানা যদি বিজ্ঞান চর্চা হয় তাহলে এই নিয়মগুলো আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য উদঘাটন এবং আবিষ্কৃত তত্ত্বের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যে যন্ত্র, তার নির্মাণ ও উদ্ভাবনকে গভীরতর বিজ্ঞান চর্চা বলতে পারি। অনুন্নত দেশগুলোর পশ্চাদ্‌পদতার অন্যতম প্রধান কারণ— যন্ত্র নির্মাণ, উদ্ভাবন ও পরীক্ষামূলক কাজে আমাদের অনীহা ও অদক্ষতা।

গবেষণার জন্য উন্নত আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরী গড়ে তুলতে হবে কেন্দ্রীয়ভাবে। কেন্দ্রীয় এই উচ্চমানের ল্যাবরেটরীর সমস্ত যন্ত্রপাতি একই স্থানে স্থাপনের প্রয়োজন নেই। শুধু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা হবে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্তিযোগ্য বিশেষজ্ঞের ভিত্তিতে বিভিন্ন যন্ত্র স্থাপিত হবে, যা ব্যবহার করার স্বাধীনতা সবার থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রের পাঠাগারের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রয়োজনীয় সমস্ত বই ও জার্নাল অন্তত দেশের মধ্যে প্রাপ্তিযোগ্য হয়। আধুনিক ইলেকট্রনিক মেইল ও ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ গবেষণার কাজে ব্যবহারের অগ্রগণ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রগুলোতে যারা ভাল অবদান রাখছেন গবেষণায়, তাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীলতাকে যথাযোগ্যভাবে কাজে লাগাবার জন্য তাদের কর্মজীবনকে দীর্ঘতর করতে হবে অবসর গ্রহণের বয়সকে বাড়িয়ে দিয়ে, যদি তারা শারীরিকভাবে সুস্থ থাকেন।

লক্ষ্য করার যে, একজন পিএইচ-ডি তৈরি করতে বিপুল অর্থ ব্যয় ও জটিল সব বাছাই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যেতে হয়। এবং এই ডিগ্রী লাভের সময়, অর্থাৎ চার থেকে পাঁচ বছরের জন্য, তাঁর সার্ভিস থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বঞ্চিত হয়।

গবেষণার অগ্রগতি যাচাই ও গবেষণার ফল জাতীয়ভাবে সবার কাছে পৌঁছে

www.pathagar.com

দেবার জন্য বিষয় ভিত্তিক জাতীয় গবেষণা জার্নাল প্রকাশ করতে হবে। এই জার্নালগুলো প্রতিটি ক্ষেত্রে গবেষণার কাজকে প্রতিফলিত করবে। যে সব গবেষণা প্রবন্ধ বিদেশী জার্নালে প্রকাশিত হবে তার সারসংক্ষেপ বা তালিকা অন্তত প্রাসঙ্গিক জার্নালে অন্তর্ভুক্ত হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নত করতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সাহায্য প্রয়োজন হবে। বিদেশী ঋণ ও সাহায্য গ্রহণের একটি নির্দিষ্ট অংশ বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জন্য পূর্ব নির্ধারিত থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি, পাঠ্য বিষয়ের দ্রুত পরিবর্তন, পরীক্ষণ যন্ত্র ও গবেষণাগারে নতুন সব যন্ত্রের ব্যবহার এবং গবেষণায় নতুন কৌশলের উদ্ভব, এবং সর্বোপরি তথ্য বিস্ফোরণের ফলে, শিক্ষা প্রদান একটি জটিল ও কৌশলগতভাবে বিশেষজ্ঞের ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ফলে আধুনিক সব শিক্ষা প্রযুক্তির ব্যবহার ও তথ্য নেটওয়ার্কের যথাযথ প্রয়োগের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য গবেষণার অভিজ্ঞতা ছাড়াও শিক্ষাদানের কৌশল ও দক্ষথা অর্জন অপরিহার্য হয়ে, উঠছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের খণ্ডকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা প্রয়োজন। এ প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে থাকবে বক্তৃতা, টিউটোরিয়াল, সেমিনার, ল্যাবরেটরী, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, ছাত্রবৃত্তি, ভাষা ল্যাবরেটরী ব্যবহারের কৌশল ইত্যাদি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশন অথবা বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব আয়োজনে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।

বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণাকে দেশের উন্নয়ন ও শিল্পায়নের সঙ্গে সার্থকভাবে সম্পর্কিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। একথা সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা যেখানে দীর্ঘমেয়াদী, মৌলিক ও ব্যক্তিনির্ভর, যা থিসিস প্রণয়ন ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশের দ্বারা সার্থকতা পেতে চায়, শিল্প গবেষণা সেখানে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমেয়াদী, প্রয়োগিক ও দলগত, যা শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রাসঙ্গিক হয়েই মাত্র সার্থকতা পায়।

কিন্তু এই পার্থক্য বস্তুত দৃষ্টিভঙ্গির। দুই গবেষণার মধ্যে অন্তর্গত মিল এদের মধ্যেকার আপাত পার্থক্যের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দুই ক্ষেত্রেই ব্যয়বহুল ও আধুনিক সব পরীক্ষা যন্ত্র ও ভৌত অবকাঠামো প্রয়োজন, সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের গবেষক। যেমন— এক্স-রে ও ইলেকট্রন ডিফ্রাকাটোমিটার, ইলেকট্রন ফিল্ড আয়ন মাইক্রোস্কোপ, মাইক্রোসকোপ, আর. ই. পি. লিড (LEED) আওগার স্ক্যানিং ইত্যাদি এবং তাত্ত্বিক ও পরীক্ষাকারী, তরুণ ও অভিজ্ঞ বিশ্লেষক ও সমন্বয়কারী গবেষক ও গবেষণার পরিচালক সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প গবেষণার বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও এখানে নিয়োজিত গবেষকগণ পরস্পরকে সহযোগিতা দিতে পারেন এবং দুর্লভ বিশেষজ্ঞ ও দুর্মূল্যের যন্ত্রপাতি যৌথভাবে কাজে লাগাতে পারেন। এজন্য যৌথ গবেষণা প্রজেক্ট গ্রহণ,

www.pathagar.com

মতামত ও তথ্য বিনিময় এবং বিশেষজ্ঞদের পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

আমাদের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্প ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদপদতা, বিভিন্ন ডিগ্রীপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের এবং অব্যবহিত নানা সমস্যার বাস্তবতাকে শুধু গুরুত্ব দেয়া নয়, বরং বর্তমান অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যেই বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারিত হবে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে সামনে রেখে, এবং একটি সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

বিজ্ঞান সম্পর্কে বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাদার্শনিকগণ আধুনিক যেসব ধারণা ও বিশ্লেষণ দিয়েছেন তার আলোকে আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার নীতি নির্ধারিত হবে। এই শিক্ষানীতি হবে সমকালীন, গতিশীল, নমনীয় ও বাস্তবমুখী— যাতে প্রস্তাবিত নীতিমালা বাস্তবায়িত ও কার্যকর হবার নিশ্চয়তা পায়।

www.pathagar.com

জীবনের মান উন্নয়নে বিজ্ঞান

বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য হল জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উপায় হিসেবে এবং সংস্কৃতির অঙ্গরূপে বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরা।

বিজ্ঞান শব্দটি এই প্রবন্ধে ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হবে যাতে প্রযুক্তি বা বিজ্ঞানের প্রয়োগিক দিকটাও এর অভিধানভুক্ত হয়।

যেহেতু এই কর্মশালার ব্যাপকতর পটভূমি হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার চর্চা নিয়ে আলোচনা এবং অনুক্ত থাকলেও এই আলোচনা মূলত উন্নয়নকামী দেশগুলো তথা বাংলাদেশ প্রসঙ্গে, তাই চেষ্টা থাকবে বক্তব্যকে নির্দিষ্ট পটভূমিতে স্থাপন করা। লক্ষ্য থাকবে —

বিজ্ঞানের চর্চা জীবনের মান উন্নয়নে এবং আমাদের ব্যাপক সাংস্কৃতিক চেতনা সৃষ্টিতে কি গুরুত্ব বহন করে তা কিছুটা ইতিহাসের যুক্তি ও বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখা।

বিজ্ঞানের গতানুগতিক সংজ্ঞার্থকে অতিক্রম করে একটি গতিশীল ও কর্মভিত্তিক সংজ্ঞার্থ আমরা উপস্থিত করব— যাতে বিজ্ঞানের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সম্পর্ক যাচাই করতে সহজ হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক সাধারণভাবে স্বীকৃত হলেও, এই সম্পর্কের জটিল ও সূক্ষ্ম প্রকৃতি— বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ তথ্য এবং প্রায়োগিক কৌশল ছাড়াও আরো অনেকগুলো উপাদান যে কাজ করে শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক সাফল্যের পেছনে, তা স্পষ্ট নয় সকলের কাছে। আমরা লক্ষ্য করব, বাংলাদেশের মত উন্নয়নকামী দরিদ্র দেশগুলোর ভবিষ্যৎ কি ভয়াবহ হতে পারে! যদি বিজ্ঞান চর্চা ও শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে বর্তমান বৈষম্যের ধারা অব্যাহত থাকে।

প্রত্যেক দেশই তার সম্পদ, ভৌগলিক অবস্থান, জন-গোষ্ঠী ও তাদের শিক্ষাগত মান ও উদ্ভাবনী দক্ষতা, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপরে ভিত্তি করে উন্নয়নের এক একটি ধাপে অবস্থান করছে। সেই অবস্থান থেকে উন্নয়নের সম্ভাব্য পরবর্তী স্তরে উত্তীর্ণ হবার পথ কখনো কখনো অত্যন্ত দুর্গম ও সঙ্কীর্ণ হতে পারে। বাংলাদেশে বিজ্ঞান চর্চা ও এর যথার্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের অনুকরণের কোন অবকাশ নেই। এখানে আলস্য, অবহেলা, নির্বুদ্ধিতা ও অপচয় শুধু আত্মঘাতী নয়, অক্ষম্য অপরাধ ভবিষ্যৎ সমাজের কাছে।

www.pathagar.com

বিজ্ঞান চর্চার এই গভীর গুরুত্ব স্মরণ রেখেই বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কৌশলগত অবস্থান কি হবে? বিদ্যালয় বহির্ভূত বিজ্ঞান চর্চা কতটা ভূমিকা রাখতে পারে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায়? এই বিজ্ঞান চর্চার প্রকৃতি ও পদ্ধতি কি অর্থে ভিন্ন আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞান চর্চা থেকে? আমাদের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বিজ্ঞান কতটা প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে? কি আমাদের করণীয়? এসব প্রশ্ন উত্থাপিত হবে।

বলা বাহুল্য এসব প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয় এককভাবে। কারণ, উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি— এসবই বহুমাত্রিক, পরিবর্তনীয় ও মিশ্র ধারণা, যা একটি দেশ ও জাতিই শুধু নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রভাব দ্বারাও রূপ লাভ করে। তবু আমাদের বিশ্বাস, অবস্থার বিশ্লেষণ ও সমস্যার অবধারণ সমাধানের পথ-সন্ধানকে সহজতর করবে।

যে ঘটনা থেকে নৃবিজ্ঞানীরা আমাদের আদি পূর্বপুরুষদের চিহ্নিত করেন তা হলো আগুনের আবিষ্কার ও হাতিয়ারের ব্যবহার। সভ্যতার ইতিহাসকে স্তর ভাগ করা হয় - প্রস্তর যুগ, ব্রঞ্জ যুগ, লৌহ যুগ বা বর্তমানের ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার বা পারমাণবিক শক্তির যুগ রূপে। এ থেকে মানুষে সভ্যতার বস্তুগত ভিত্তি স্পষ্ট হয়ে উঠে। যখন থেকে মানুষ তার শ্রম, বুদ্ধি ও নৈপুণ্য প্রয়োগ করে তার বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে শুরু করেছে, হাতিয়ার ব্যবহার করতে শিখেছে তখনই সে তার আদি ব্যবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে মানুষে।

এই উত্তরণকে আমরা সভ্যতার দশা পরিবর্তন বলতে পারি, যেখানে ইতিহাসের ধারা প্রকৃত ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার পরিবর্তে মানুষের সচেতন ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে শুরু করল।

এখানে একটি বিষয়ের দিকে আমি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তা হলো - স্বাচ্ছন্দ্য ও ঐশ্বর্যময় জীবনই সভ্যতার মাপকাঠি নয় বরং নিজস্ব অবস্থার পরিবর্তনে আমাদের ভূমিকা ও স্বাধীনতা কতটুকু— সেটই নির্ধারণ করে সভ্যতার কোন স্তরে আমরা অবস্থান করছি। শুনতে পাই প্রাচীনকালে বাংলাদেশে অনেক সমৃদ্ধির মধ্যে মানুষ বাস করেছে, জনসংখ্যার স্বল্পতা ও প্রাকৃতিক পরিবেশের আনুকূল্যে। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক তেল সমৃদ্ধ দেশ ঐশ্বর্যের অধিকারী প্রকৃতির কল্যাণে। কিন্তু একে সভ্যতার সূচক হিসেবে আমরা ধরতে চাই না।

যাকে আমরা প্রথম শিল্প বিপ্লব বলি ইংল্যাণ্ডে তার সূচনা হয়েছিল ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে। ১৭৫০-১৮৩০ এই সময়টাকেই চিহ্নিত করা হয় বৃটেনের শিল্প বিপ্লবের কালরূপে। বাহ্যিকভাবে যা ঘটেছিল তা হল, প্রচুর সংখ্যক শ্রমিক গ্রামের কৃষি কাজ ছেড়ে শহরের কারখানাগুলোতে জমা হতে শুরু করল, কাপড়ের উৎপাদন ১৭৮৫ থেকে ১৮৫০ এর মধ্যে বেড়ে গেল— ৩ কোটি ৭০ লক্ষ মিটার থেকে ১৮.৫০ কোটি মিটারে অর্থাৎ ৫০ গুণ। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে কয়লার উৎপাদন বাড়লো ১৮০০ খৃস্টাব্দে ১০ মিলিয়ন টন থেকে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ৬০ মিলিয়ন টনে এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ২১০ মিলিয়ন টনে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জীবনের মান ইউরোপ ও আমেরিকায় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেল এর আগে দুহাজার বছরেও তা ঘটেনি। এ সবই স্পষ্ট পরিসংখ্যানমূলক দৃষ্টান্ত যে, বিজ্ঞানের প্রয়োগ জীবনের মান উন্নয়নে বিস্ময়কর প্রভাব

www.pathagar.com

রাখতে পারে। একটা ব্যাপার অবশ্য উল্লেখ্য এখানে যে, যদিও শিল্পের উন্নয়নে বিজ্ঞানের অবদান ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অপেক্ষাকৃত কম—শেষার্ধে বিজ্ঞানের আবিষ্কার গভীর অবদান রাখতে শুরু করলো, বিশেষ করে তড়িৎ শিল্প ও রসায়ন শিল্পে যেখানে কৃত্রিম রং, সুগন্ধি, বিস্ফোরক দ্রব্য— এসব কিছুতেই গবেষণার ফল কাজে লাগানো হল।

বিজ্ঞানের সঙ্গে শিল্পায়নের সম্পর্ক নিয়ে যে বিতর্ক আমরা প্রায়শ লক্ষ্য করি এবং যেখানে বলা হয়ে থাকে শিল্পায়নের ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানের গবেষণা অপরিহার্য নয়। তার সংক্ষিপ্ত জবাব হল ঃ শিল্পায়নের প্রাথমিক স্তরে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং হাতের কাজের দক্ষতা মানুষ ব্যবহার করেছে ঠিকই। সেই স্তরে, বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্য উদঘাটনের বিশুদ্ধ অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞান পিপাসার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং শিল্প ও প্রযুক্তি স্থূল বস্তুগত প্রয়োজন মেটাবার পন্থা হিসেবে গণ্য হয়েছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা লক্ষ্য করি যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার জটিলতা উভয়ই প্রসার লাভ করে পরস্পরকে স্পর্শ করলো। বিজ্ঞান ও শিল্পের এই প্রাবরণ ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা দ্রুতগতিতে প্রভাব রাখল পরস্পরের উপরে। বিজ্ঞানের তত্ত্ব সম্ভব করলো নতুন প্রযুক্তির এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্র নির্মাণ ও গবেষণার প্রয়োজনীয় অর্থ ও সামাজিক উৎসাহ সৃষ্টি করে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করলো।

কিন্তু শিল্প বিপ্লব ব্রিটেনেই কেন ঘটলো? তার জবাব খুঁজতে হলে ব্রিটেনের সার্বিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করতে হবে —এর সঞ্চিত অর্থ এবং শিল্পে তার বিনিয়োগের মনোভাব, কাঁচামাল, দক্ষ শ্রমিক, নিপুণ কারিগর, সামাজিক বিন্যাস, ক্রমবিস্তারমান পণ্যের বাজার, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের প্রতি জনসাধারণের অনুকূল মনোভাব—এসব কিছুর সন্নিপাত। ব্রিটেনের অনুসরণে ফ্রান্স ও জার্মানীতে শিল্প বিপ্লব ঘটেছে - আমেরিকায় ঘটেছে একটু ভিন্ন ধারায় গৃহ যুদ্ধের পরে (১৮৬১-১৮৬৫) এবং রাশিয়া ও জাপানে ঘটেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে।

শিল্পোন্নত দেশগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সম্পর্কটি আমাদের প্রলুব্ধ করে নিঃসন্দেহে। কিন্তু সেই সঙ্গে তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে একটি বিভ্রান্তি আমাদের হতাশ করে প্রচণ্ডভাবে। গত তিনশ বছরে ইউরোপ ও আমেরিকার মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় বিশ থেকে তিরিশগুণ হয়েছে—অথচ এশিয়া ও আফ্রিকায় অধিকাংশ দেশে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি না পেয়ে কমতে শুরু করেছে। যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নয়ন ভীষণভাবে গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষার উপর নির্ভরশীল এবং বিশ্বের জ্ঞান যেখানে প্রায় প্রতি দশ বছরে দ্বিগুণ হচ্ছে, সেখানে শুধু অর্থনৈতিক ব্যবধান উন্নত ও অনুন্নত দেশের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই না, এই আধুনিক শিল্পের মূলচালিকা শক্তি যে গবেষণালব্ধ নতুন জ্ঞান তার ক্ষেত্রেও বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উন্নত দেশগুলোর তুলনায় এর ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ যেখানে আমাদের মাথাপিছু আয়, সেখানে শিক্ষা ও গবেষণা খাতে ব্যয়ের অংশটাও আবার উন্নত দেশের তুলনায় ক্ষুদ্র।

www.pathagar.com

এদিকে শিল্প ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দক্ষতা পেতে হলে যে আধুনিক ও বড় শিল্প প্রয়োজন- তার জন্য অর্থ বিনিয়োগ আমরা করতে অক্ষম। এর কারণ শুধু অর্থের অভাবই নয়, বরং ক্রমোন্নত বড় শিল্পগুলোর ক্ষেত্রে অনেক বেশি অর্থ বিনিয়োগ করতে হয় প্রতিটি কর্মসংস্থানের জন্য।

বর্তমান বিশ্বের শিল্প পণ্যের বাজারে যে নির্মম প্রতিযোগিতা, সেখানে দরিদ্র দেশগুলো তাদের নিজের অবস্থান থেকে শুধুই পরাভব ও ক্ষতি স্বীকার করে ক্রমাগত দরিদ্রতর হচ্ছে।

এ সমস্ত আলোচনার মূল লক্ষ্য হল, উন্নয়নকামী দেশগুলোর বাস্তব সমস্যা তুলে ধরা এবং এই বক্তব্যকে স্পষ্ট করে তোলা যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এমন কোন যাদু নয় যা ধার করে এনে রাতারাতি দরিদ্র দেশগুলোর ভাগ্য বদল করা যাবে।

একথা সত্য যে, আমাদের অবস্থা যতই দুর্বিষহ হোক, এ অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকেই ব্যবহার করতে হবে, তবে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বা শুধু ধার করে আনা জ্ঞানে সেটা সম্ভব নয়। আমাদের সামগ্রিক অবস্থার বিশ্লেষণ করতে হবে, উদ্ভাবন ও আবিষ্কার বিশ্লেষণ করতে হবে, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারে অংশ নিতে হবে— আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে গতিশীল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখার জন্য প্রতি স্তরে। আর এখানেই বিজ্ঞান শিক্ষা গভীর গুরত্ব বহন করে ; শুধু তথ্য ও বিশেষজ্ঞের জ্ঞান সংগ্রহের জন্য নয়, সংস্কারমুক্ত প্রেরণা ও কর্মতৎপরতা সৃষ্টি এবং বস্তুনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে।

বিজ্ঞানকে কখনো কখনো সংজ্ঞায়িত করা হয়ে থাকে বস্তুজগৎ সম্পর্কে সুশৃঙ্খল জ্ঞান রূপে। বিজ্ঞানের এ ধরনের সংজ্ঞায়নে অসুবিধা হল এর পরিবর্তী বা গতিশীল দিকটা অনুক্ত থেকে যায়। বস্তুত বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এর বিধৃত তথ্য বা জ্ঞান নয় বরং এর জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষমতা। কোন একটি সময়ে বিজ্ঞানের একটি শাখায় যে জ্ঞান সংগৃহীত থাকে তা সীমিত, অসম্পূর্ণ, এমনকি ভ্রান্তিপূর্ণও হতে পারে। কিন্তু নতুন জ্ঞান সৃষ্টির যে ক্ষমতা বিজ্ঞানের পদ্ধতির মধ্যে নিহিত তা বিস্ময়কর।

বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও যুক্তিনির্ভরতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও অরক্ষণশীলতা, অসংখ্যের অনুসন্ধিৎসা ও অংশগ্রহণ, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ বিজ্ঞানকে সর্বজনীনতা এবং ক্রমাগতভাবে ক্রটি সংশোধনের বৈশিষ্ট্য দেয়। বিজ্ঞানকে তাই আমরা সংজ্ঞায়িত করতে পারি একটি যৌথ কর্মধারা রূপে যার ভিতর দিয়ে মানব সমাজ ক্রমাগতভাবে পূর্ণতর ও শুদ্ধতর জ্ঞান অর্জন করতে পারে প্রকৃতি সম্পর্কে এবং ক্রমাগতভাবে প্রকতির সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বাস করতে ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।

আমরা যাকে সংস্কৃতি বলি তার পেছনে কাজ করে সৌন্দর্যবুদ্ধি, উৎকর্ষ সাধনের প্রয়াস ও দীর্ঘ অনুশীলন। ক্রমাগত সংস্কার করে, চয়ন করে যে ধারণা বা বস্তু আমরা রক্ষা করতে চাই সবাই মিলে, কালের প্রভাবকে অতিক্রম করে— সেটাই আমাদের সংস্কৃতি। কিন্তু আমরা কি ভাবতে পারি সংস্কৃতির কথা এমন সমাজে যেখানে মানুষের মন পঙ্গু হয়ে আছে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে— মানুষ যেখানে শোষিত প্রতি মুহূর্তে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা কাল্পনিক ভূতের ভয়ে?

www.pathagar.com

আসলে সংস্কৃতির জন্য আলো চাই, স্বাস্থ্য চাই, মনের সুস্থতা চাই। মানুষ যেখানে দিন-রাত্রি ব্যস্ত আহার যোগাতে, যেখানে তার অবকাশ নেই, স্বাধীনতা নেই বুদ্ধি প্রয়োগের এবং যেখানে সে প্রকৃতির ঘটনা অথবা চাপিয়ে দেওয়া বিশ্বাস ও ভয়ের শৃঙ্খলে বন্দী, সেখানে সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব নয়।

বিজ্ঞান তার আদি পর্বেই যখন মানুষকে কিছু কিছু শক্তি দিয়েছে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার, প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবার পরিবর্তে, তখনই শুরু সংস্কৃতির। বিজ্ঞান সংস্কৃতির উপর প্রভাব রেখেছে দুইভাবে। প্রথমত বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের ভিতর দিয়ে সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়ত মানুষের মনকে সংস্কারমুক্ত করে, তার স্বাধীন সচেতন সৃষ্টিশীলতার উন্মেষ ঘটিয়ে। আসলে বিজ্ঞান নিজেই এক মহৎ সংস্কৃতি। অসংখ্য বিজ্ঞানীর সচেতন সাধনায় যে তত্ত্বের জন্ম হল, ক্রমাগত সংশোধন ও সংস্কারের ভিতর দিয়ে, যেখানে সৌন্দর্যবুদ্ধি ও সৃষ্টিশীলতার চরম পরাকাষ্ঠা ঘটেছে, বিকাশ ঘটছে সূক্ষ্ম যুক্তি এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির- যেমন পরমাণু ও মহাবিশ্বের গড়ন আবিষ্কারে, ডারউইনের বিবর্তনবাদ বা আইনস্ট্যাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্বে অথবা যেখানে বিজ্ঞানীরা নির্মাণ করেছে রেডিও-টেলিস্কোপ- পরমাণুর কণিকাকে ভাঙ্গার জন্য Particle Accelerator, — সেখানে বিজ্ঞানকে সংস্কৃতি না বলে উপায় কি?

কিন্তু বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে দিকটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এর পারস্পরিকতা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেমন সমাজের জীবনধারা ও চেতনাকে আমূল বদলে দিয়ে নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেয়, তেমনি সাংস্কৃতিক অনুকূল পরিমণ্ডল ছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের পেছনে বস্তুগত কারণগুলো হয়ত আমরা সহজেই প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু প্রচ্ছন্ন অথচ অত্যন্ত গভীরভাবে সমাজের সাংস্কৃতিক চেতনা যে প্রভাব রেখেছে বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তার প্রমাণ রেনেসাঁস ও শিল্প বিপ্লবের কালিক নৈকট্য।

১৪০০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল। পুরানো ঐতিহ্য, ধর্মীয় প্রভাব ও গতানুগতিকতা কাটিয়ে একটি সৌন্দর্য চেতনা, আত্মবিশ্বাস ও জীবনের প্রতি ভালবাসা সমগ্র জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। মনের জড়তা কাটিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন, উদ্ভাবন, নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যক্তি স্বাধীনতা—এ সবই সামাজিক কাজ, শ্রমের কাজ। ব্যাপক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে সমগ্র জাতির জড়তা দূর করতে না পারলে এমনটি সম্ভব নয়। কিন্তু এই শক্তির উৎস কি? বস্তুত প্রাকৃতিক নিয়মের আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে কেপলার, গ্যালিলিও, নিউটন প্রমুখ বিজ্ঞানীর অবদান যখন প্রমাণ করল পৃথিবীর বস্তু আর স্বর্গের উজ্জ্বল গ্রহগুলো গতি বিজ্ঞানের একই নিয়ম মেনে চলে — তখনই মাত্র প্রাকৃতিক ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কে বিশ্বাস এবং পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের প্রেরণা জাগ্রত হল, সাধারণ্যে। অন্ধকার কাটিয়ে এই আলোর রাজ্যে প্রবেশ, রক্ষণশীলতার পরিবর্তে গতি ও পরিবর্তনের ধারায় চঞ্চল হয়ে ওঠা, পাণ্ডিত্যের পরিবর্তে বুদ্ধি ও সৃষ্টিশীলতায় আগ্রহ, মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বিশেষের স্থানে অসংখ্যের শিক্ষায় অংশগ্রহণ— এ সবই গুণগত পরিবর্তন এনেছিল সামাজিক চেতনায় ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। বস্তুত উন্নয়ন ও পরিবর্তনের অনুকূল এ

www.pathagar.com

সমস্ত ঘটনা একই সঙ্গে ঘটতে পারে তখনি, যখন সমাজের পুরানো কাঠামো ভেঙ্গে নতুন করে সাজানো সম্ভব হয়।

প্রগতির অনুকূল ও পরিপূরক শক্তিসমূহের সমন্বয়ে সমাজের এই পুনর্বিন্যাস দ্রুত সংঘটিত হওয়াকেই জাগরণ বলে জানি। এই জাগরণ আমাদের সমাজে দৃষ্টি করতে না পারলে কুসংস্কার, অপচয়, হতাশা ও অনবধারণের প্রচণ্ড জড়তা কাটিয়ে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের শিক্ষা ও প্রয়োগের যথার্থ পথ তাই আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, ইতিহাসের স্থানাঙ্কে আমাদের বাস্তব অবস্থান বিশ্লেষণ করে। কাজটি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ তেমনি দুরূহ।

এই পর্যায়ে এসে জীবনের মান উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বিকাশে বিদ্যালয় বহির্ভূত বিজ্ঞান চর্চার প্রসঙ্গটি তুলতে চাই। আমরা লক্ষ্য করেছি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের একমাত্র পথ — এই সাধারণ সত্যটি স্বীকার করাই যথেষ্ট নয় আমাদের জন্য। বিজ্ঞানের সফল চর্চা ও প্রয়োগ একটি জটিল প্রক্রিয়া, যেখানে অনেকগুলো উপাদান বা কারণের সন্নিবেশ ঘটাতে হয়।

প্রতিটি দেশ তার প্রাকৃতিক সম্পদ, সামাজিক চেতনা, বিজ্ঞান চর্চার স্তর, জনসংখ্যা, কারিগরী দক্ষতা, রাজনৈতিক আদর্শ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিস্থিতি —এসব কিছুর ভিত্তিতে উন্নয়নের একটি বিশেষ স্তরে অবস্থান করে। সামাজিক সমস্ত শক্তির মিথস্ক্রিয়া এই অবস্থানকে কখনো গতিশীল এবং অবিচল করতে পারে, কখনো সহায়ক হতে পারে উন্নততর স্তরে উত্তরণে, কখনো বা অধঃপতন নিম্নতর স্তরে।

বিজ্ঞানের আহরিত জ্ঞান, আবিষ্কার বা উদ্ভাবন আমাদের সামনে বিকল্প সৃষ্টি করে। এই বিকল্প যত বেশী সৃষ্টি হয় তত বেশী সম্ভাব্য স্তর সৃষ্টি হয় উন্নয়নের। আর এজন্যই একটি অবিচল, দুষ্ট চক্রে আবদ্ধ সমাজের জন্য পরিবর্তনের সবচাইতে বড় নিমিত্ত হচ্ছে নতুন জ্ঞান—এবং তারো চেয়ে বড় উদ্ভাবন ও আবিষ্কার। আমাদের বিজ্ঞান চর্চার মূল লক্ষ্য হওয়া চাই নতুন জ্ঞান লাভের, আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের, বস্তুনিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক সমালোচনার দৃষ্টি লাভের— যাতে অনুন্নয়ন ও স্থবিরতার যে অন্ধ গলিতে আমরা আটকে পড়েছি, সেখান থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাই।

কিন্তু যা সম্ভাবনার তাই নিশ্চয়তার নয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জ্ঞান আহরণ, আবিষ্কার ও উদ্ভাবন একটি সম্ভাব্য উন্নয়নের পথ আমাদের জন্য সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সফলভাবে সেখানে উত্তীর্ণ হতে হলে অনেকগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক শর্ত পূরণ করতে হবে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অনেক উদ্ভাবন ও আবিষ্কার আপাতদৃষ্টিতে আমাদের সমস্যার সমাধান তুলে ধরে। পৃথিবীর সব মানুষের জন্য অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও শিক্ষা— এমনকি একটি ক্রম উন্নয়নের নিশ্চয়তা দেবার মত তত্ত্বগত জ্ঞান ও সম্পদ বিশ্বে আছে— কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এটা ঘটছে না। এর কারণ, মানব সমাজ যে অদৃশ্য জালে আবদ্ধ তার সংস্কার, স্বার্থ-বুদ্ধি, লোভ ও চেতনার সংকীর্ণতায়, তাতে আদর্শ অবস্থায় উন্নয়নের যে পথগুলো সম্ভব ছিল বাস্তব ক্ষেত্রে তা ঘটছে না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ — বাংলাদেশের অসংখ্য উন্নয়ন আগ্রহী মানুষের সমস্যা সমাধানে যা প্রয়োজন তা হল, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তবিদ্যার দক্ষতম ব্যবহার। একটি

www.pathagar.com

শান্তিকামী যুদ্ধবিরোধী, কর্মঠ ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাব সংগ্রহ করাও সম্ভব মনে হয় — কিন্তু বাস্তবে তা ঘটবে না আমরা জানি।

এই বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের ভাবতে হবে, বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে কি বিকল্প বা পরিপূরক ব্যবস্থা আমরা নিতে পারি? আধুনিক বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষা উন্নয়নের যে ধাপগুলো তুলে ধরে তা বাস্তবক্ষেত্রে আমরা গ্রহণ করতে পারছি না—সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে অথবা এই শিক্ষাকে আমরা বিদেশ থেকে অন্ধভাবে অনুকরণ করার চেষ্টা করছি বলে। একটি স্তর পর্যন্ত দেশের সমস্ত মানুষকেই শিক্ষা দেওয়া অপরিহার্য। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা অত্যন্ত ব্যয় বহুল বলে সমাজের বিরাট অংশ শিক্ষা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থায় পদ্ধতি ও নিয়ম বড় হয়ে দেখা দেওয়াতে প্রতিষ্ঠানের নিয়মের মধ্যে যারা নির্বাচিত হচ্ছে, তারা প্রধানত এর নিয়মগুলোর অন্ধ অনুসরণকারী। যারা বাদ পড়ছে তারা ব্যর্থ বলে গণ্য হচ্ছে। এর ফলে একটি বিরাট অপচয় এবং অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুধু ভুল কৌশল ও দক্ষতা শিক্ষা দিচ্ছে তাই না, এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে ভুল দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হচ্ছে - যা সামগ্রিক উন্নয়নের সহায়ক হচ্ছে না। ক্রমাগত মানুষ গ্রাম থেকে শহরে আসতে চাচ্ছে এবং কর্মহীন বেকার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আরো একটি বৈশিষ্ট্য, যা লক্ষ্য করা গেছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায়, তা হল রক্ষণশীলতা। বিদ্যালয় বহির্ভূত বিজ্ঞান শিক্ষার কথা ভাবতে গিয়ে দেখতে হবে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার যে বহুমাত্রা তার প্রতিফলন সম্ভব কিনা এখানে। কম ব্যয়ে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং সমাজের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান সম্ভব কিনা — যা বয়স, নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী বা নিয়মের বিধি-নিষেধ দ্বারা বাঁধা নয়।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা

ঐতিহ্যগতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, যার নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এর স্বশাসনের অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বলতে এর স্বায়ত্বশাসনের অধিকার বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু যথার্থ অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা হচ্ছে এর শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা, এবং তা প্রশ্ন উত্থাপনের, বিশ্লেষণের ও সমালোচনার। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিকল্প পথ অনুসন্ধান, উদ্ভাবন ও নতুন সৃষ্টির যে অপার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে অর্পিত, তারই অনিবার্য অনুষঙ্গরূপে প্রয়োজন এই স্বাধীনতা। বিভিন্ন দেশে ও কালে উচ্চ শিক্ষার পাদপিঠ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে তাই একটি দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং তা হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার সীমানা নির্ধারণ নিয়ে।

এ কথা ঠিক যে, জ্ঞান সাধনার, প্রশ্ন উত্থাপনের এবং বিশ্বজগৎকে গভীরতর রূপে উপলব্ধি ও এর রসহ্য উদ্‌ঘাটনের অন্তর্গত স্বাধীনতা ও গুরুত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কতটা এবং যে সামাজিক ধাত্রে ও কালিক ঠিকানায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থিতি, সেই দেশ ও কালের অব্যবহিত সমস্যা ও চাহিদা পূরণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে কতটা অর্পিত— সেই বিতর্কের মীমাংসা স্থান, কাল ও শিক্ষা দর্শন নিরপেক্ষ নয়। আমরা লক্ষ্য করব বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার যে সীমানা তা বদলেছে সময়ের সঙ্গে, ভিন্নতা লাভ করছে বিভিন্ন দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উপরে নির্ভর করে, এবং সেইসঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে উচ্চ শিক্ষায় দর্শন বদলে যাবার কারণে। কিন্তু যা সাধারণীকৃত সত্য রূপে পরিলক্ষিত, তা হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ লাভের সমস্ত স্তরেই এর নিজস্ব স্বাধীনতা ও এর উপরে অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে একটি গতিশীল ভারসাম্য বা টানাপড়েন অব্যাহত থেকেছে।

আমরা যদি ইউরোপের দিকে তাকাই, যেখানে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব ঘটে দ্বাদশ শতাব্দীতে, গীর্জা ও ধর্মযাজকদের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে প্রথম দিকে। বিশ্ববি্যদ্যালয়ের চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর, ডীন—এসব পদ সেই প্রভাবকেই চিহ্নিত করে। এই শতাব্দীতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গীর্জার প্রভাব মুক্ত হবার জন্য সংগ্রাম শুরু করে। দুটো প্রশ্ন তখন থেকেই উত্থাপিত হয় ঃ প্রথমত আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কিভাবে সংরক্ষিত হতে পারে? দ্বিতীয়ত অনুষদ, সিনেট, একাডেমিক কাউন্সিল ইত্যাদি পরিষদে, মুক্ত আলোচনা ও মতামত গ্রহণ কিভাবে পরিচালিত ও সমন্বিত হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার আবহে?

যদিও নতুন জ্ঞানের অনুসন্ধান এবং জ্ঞানের দীগন্তকে ক্রমাগত সম্প্রাসারিত করার অনুপ্রেরণা সর্বকালের ভাল শিক্ষকদের মধ্যে পরিলক্ষিত, সপ্তদশ শতাব্দীতেই প্রথম নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, আবিষ্কার ও উদ্ভবনের অভিনব জোয়ার আমরা লক্ষ্য করি ইউরোপে, এবং তা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কেন্দ্র করে। এই শতাব্দীতেই নতুন জ্ঞান সৃষ্টি ও গভীরতর দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎকে উপলব্ধি করার লক্ষ্যে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হল বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো কেন্দ্র করে। ইংল্যান্ডের রয়াল সোসাইটি এবং হল্যান্ডের লেইডেনে স্থাপিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর দৃষ্টান্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার প্রথম দিকে ধর্মীয় সংস্থা, রাজন্যবর্গ, এবং ধনিক ও বণিক শ্রেণী পৃষ্ঠপোষক রূপে সাহায্য করেছে বিশ্ববিদ্যালয়কে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা কাটিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক যৌথ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে শুরু করলো। শহর ও দেশের সমস্ত এলাকা সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থনে কাজ করতে শুরু করে সেই সময়। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একই সঙ্গে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করতে সক্ষম হল। বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠলো জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ, প্রতিভাবান, উদ্ভাবক, আবিষ্কারক ও বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের একটি চেতনাগত সংস্থা রূপে। অনেক সম্পদশালী বিদ্যোৎসাহী, ব্যক্তিজীবনে বড় পন্ডিত না হয়েও যুক্ত হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। এই শতাব্দীতে জ্ঞানের নতুন জগৎ সৃষ্টির প্রতি একটি সামাজিক ও জাতীয় অনুপ্রেরণা ও যৌথ আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রার সংযোগ ঘটায় ইউরোপে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ধারা বিসর্জন না দিয়েও, স্থানীয় সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার ও সমাধান দেবার বিশেষ দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিতে শুরু করে।

উনবিংশ শতাব্দীতে যেসব নতুন শিল্প গড়ে উঠেছিল, সেখানে এটা উপলব্ধি করা হয় যে, কোন দেশের উন্নয়ন ও সাফল্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথার্থ চর্চা ও প্রয়োগের উপরে গভীরভাবে নির্ভরশীল। এই উপলব্ধি থেকেই বিজ্ঞান ও প্রকৌশল শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সূচিত হয়। ইউরোপের সমাজ যে জড়তা ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়ে নতুন বিশ্বদৃষ্টি লাভ করেছিল অভূতপূর্ব প্রেরণায়, তার মূলে কাজ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বাধীনতা। বিশ্বজগৎকে জানার ক্ষেত্রে অভিনব সব সাফল্য, আবিষ্কৃত নতুন জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ, প্রযুক্তির ব্যবহারে দ্রুত সম্পদ ও প্রাচুর্য সৃষ্টি— এসবই জ্ঞান চর্চার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞান সৃষ্টির উৎসরূপে যে শক্তি ও সমর্থন লাভ করে, তারই জোরে এই প্রতিষ্ঠান সমাজ থেকে অনেকখানি স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। অবশ্য এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বৃত্তিমূলক নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠে।

এখানে বিশেষভাবে যা লক্ষণীয় তা হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্য সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের ভিত্তি এই নয় যে,

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থী দীর্ঘ সময় ধরে শিক্ষা গ্রহণ করে, এ জন্যেও নয় যে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করে একজন শিক্ষার্থী বিশেষভাবে পান্ডিত্ব ও দক্ষতা অর্জন করে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বৈশিষ্ট্য হল, এখানে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হবার কথা। জ্ঞানের এই প্রবহমানতার জন্য এবং জ্ঞানের জগতে নব নব দিগন্তের উন্মোচন সম্ভব করে তুলতে চিন্তার স্বাধীনতার অপরিহার্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা স্বভাবতই এই সৃষ্টির স্বাধীনতা, চিন্তা করবার স্বাধীনতা, উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের স্বাধীনতা থেকে উদ্ভূত।

কিন্তু কোন দেশে বা সমাজেই বিশ্ববিদ্যালয়কে হঠাৎ করে স্বাধীনতা দেয়া হয়নি বাইরে থেকে। জ্ঞান সাধনার দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে গিয়ে ধাপে ধাপে এই স্বাধীনতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্জন করতে হয়েছে।

ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, এদের সূচনা কালের পর থেকেই কয়েক শতাব্দী ধরে নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পার হয়েছে। নানা রকম বিতর্ক ও সমস্যার মুখোমুখী হয়েছে। প্রকৃতিকে জানা ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গতানুগতিক ধারা অতিক্রম করে নতুন ভাবনার ফসল রূপে নানা সাফল্য প্রদর্শন করেছে। এসবের ভিতর দিয়েই আবিষ্কৃত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত স্বাধীনতা কোথায়?

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতার একটি প্রধান দিক হল, তাৎক্ষণিকতা থেকে এবং অব্যবহিত স্থান ও কালের গণ্ডী থেকে মুক্তিলাভ। এখানকার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক তাঁদের জ্ঞান সাধনায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে নৈর্ব্যক্তিকতা, নিরপেক্ষতা ও সুদূরতা লাভ না করলে, উপলব্ধির জগতে নতুন পথ চলায় স্বাধীনতা অর্জিত হয় না।

অবশ্য কোন স্বাধীনতাই নিঃশর্ত হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ব্যয়বহুল, তদুপরি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতীয় সমৃদ্ধি এমনকি, এর স্থিতিশীলতা ও অস্তিত্ব যেখানে ক্রমবর্ধিতভাবে নির্ভরশীল নতুন জ্ঞান, তথ্য ও উপলব্ধির উপরে— যার উদ্ভবস্থল বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সমাজ ও জাতির প্রত্যাশা থাকবেই, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর বিশ্লেষণ ও সমাধান দেবার। বস্তুত স্বাধীনতা ও দায়িত্বভার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, সব দেশে ও সব কালে। যেখানে সামাজিক চ্যালেঞ্জ নেই, স্বাধীনতা যেখানে অর্জিত নয় নতুন নতুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ও গভীরতর দায়িত্ব পালনের ভিতর দিয়ে, সেখানে জ্ঞানের স্বাধীনতা নিছক পণ্ডিতাভিমান, নিষ্ফল ভাবনা, কূটতর্ক ও বাস্তববর্জিততায় পর্যবসিত হতে পারে। যেমন, প্রাচীন রোমের কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী নিয়ে যেখানে গবেষণা চলছে, সেখানে স্থানীয় এলাকার মানুষ সেচ ব্যবস্থার অভাবে জলকষ্টে ভুগবে, এটা কখনো হতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা এবং এর উপরে অর্পিত দায়িত্বের মধ্যে যে পারস্পরিকতা, তা আরো এক ভাবে আমরা প্রকাশ করতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানচর্চা ও সৃজনশীলতার স্বাধীনতা তখনই মাত্র অর্জিত ও সংরক্ষিত হতে পারে, যখন অন্য স্বাধীনতাগুলো স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত থাকে সমাজে। নিত্য প্রয়োজনীয় ভৌত সুবিধাগুলো যদি দুষ্পাপ্য হয়, বৃহত্তর সমাজ যদি থাকে নিরন্ন, রুগ্ন, গৃহহীন ও যোগাযোগহীন, যদি না থাকে অবকাশ পিছনে তাকাবার ও সম্মুখে দৃষ্টিপাতের, আনন্দ লাভের ও অনুপ্রাণিত হবার—অন্যসব স্বাধীনতার সঙ্গে জ্ঞান চর্চার ও চিন্তার স্বাধীনতাও সেখানে খর্বিত হতে বাধ্য।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে এটি গভীরভাবে উপলব্ধ হবার যে, তাদের কর্মধারায় দুটো দিকই রয়েছে। একটি দায়িত্ব তাঁদের সমাজের প্রতি, যে সমাজ তাঁদের প্রতিপালন করছে এবং তাঁদের জ্ঞান সাধনা ও গবেষণা থেকে উপকৃত হতে পারে। অন্য কাজটি হল, বিশ্বসমাজ ও বিশ্বজ্ঞান সাধনার যে বিকাশমান ধারা, সমগ্র মানবসভ্যতার যে অগ্রযাত্রা, জ্ঞান ও উপলব্ধির নতুন দিগন্তে—সেখানে সহযাত্রী হওয়া নিজস্ব উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা নিয়ে। এই দ্বৈত দায়িত্ব পালনের কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয় সংরক্ষণযোগ্য এবং বর্জনীয় ধারণা ও মূল্যবোধের মধ্যে। তাঁকে যেমন বাস করতে হয় বাস্তব জগতে, গতানুতিক সমস্যায় সমাধান ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে অবদান রাখতে, সেই সঙ্গে অংশ নিতে হয় সৃজনশীল কাজে, যেখানে কল্পনা আছে, স্বজ্ঞা আছে, অনিশ্চয়তা আছে, আছে বিশ্বজনিনতা এবং অব্যবহতি সমাজ ও কালকে অতিক্রম করে যাওয়া। এখানে উত্তরণ চাই জাতিগত, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ধারণার সীমাবদ্ধতা থেকে। সমালোচনা ও সত্যানুসন্ধানে আপোষহীন—অমোঘ দৃষ্টি এখানে হতে পারে পথ প্রদর্শক।

জ্ঞানের জগতে এই সম্মুখ যাত্রার যে আয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে, সেখানে যেমন রক্ষণশীলতা আছে, তেমনি আছে পরিবর্তনশীলতা। দীর্ঘদিন ধরে অর্জিত ও সংরক্ষিত যে জ্ঞানের জগৎ তাকে আত্মস্থ করা, শোষণ করে নেওয়া ও প্রয়োগ করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়কে নিতে হয়। সমাজের স্থিতিশীলতা যে মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠিত ধারণা ও কর্মধারার দ্বারা প্রতিপালিত, সেই জ্ঞান ও উপলব্ধি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করাও শিক্ষা প্রদানের দায়িত্বের অন্তর্গত। কিন্তু পুরনো ও প্রচলিত কোন ধারণা বা বিশ্বাসই নির্বিচারে ও বিনা সমালোচনায় গৃহীত হবার নয়। এজন্যেই সমালোচনা ও বিচারের দৃষ্টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ, বস্তুত প্রধান দিক।

কার্নিগো ইনস্টিটিউটএ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ও গবেষকদের স্বাধীনতা সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, তারই সুর ধরে বলতে পারি— বিশ্ববিদ্যালয় একটি কাঠামো মাত্র। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে স্থায়ী হল দর্শনের সেই উপাদান এবং সেই উদ্দেশ্য— যাকে ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। এই দর্শনটি হল, বিশ্ববিদ্যালয়ের যা কিছু সম্পদ, তা হল এর গবেষকগণ— যথার্থভাবে বৃত্তি প্রদত্ত ও সংরক্ষিত, যাঁদের সময় শব্দগত অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় কিনে নেয় এবং তাঁতেরকে ফিরিয়ে দেয় নিঃশর্তে —বৃত্তি হিসাবে বা উপঢৌকন হিসাবে। এখানে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে পদচারণ, অবাধ ও প্রচলিত ধারাকে অতিক্রম করে ব্যাপক সব পরিকল্পনা গ্রহণ— শুধু সীমালাভ করবে প্রাকৃতিক বাঁধা অথবা প্রতিভাবান নিরপেক্ষ গবেষকরা বিবেচনার দ্বারা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মূল লক্ষ্য এই সচলতা এবং নমনীয়তাকে সম্ভব করে তোলা।

প্রশ্ন উঠতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন অবাধ স্বাধীনতা দিলে, কার কাছে এই প্রতিষ্ঠান দায়গ্রস্ত হবে? কে বিশ্ববিদ্যালয়কে ধারণ করবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণতো বেতন প্রাপ্ত ব্যক্তি, যাদের সমাজ নিয়োগ করেছে বিশেষ দায়িত্বে। সেই দায়িত্ব পালনের নিশ্চয়তা কে নির্ধারণ করবে?

www.pathagar.com

বস্তুত কোন স্বাধীনতাই সীমাহীন নয়। যে বস্তুকণিকা মুক্তভাবে ছোটে, তার ক্ষেত্রে গতির যে প্রতিক্রিয়া সেটাই তার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন গাছের ডালে যে ফলটি ঝুলে আছে, সেখানে ডালের সঙ্গে ফলের ওজনের চলছে টানাপড়েন। কিন্তু যে মুহূর্তে ফলটি বিযুক্ত হল ডাল থেকে তখন তার উপরে কোন স্থির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কাজ করে না। কাজ করে গতির প্রতিক্রিয়া (Kinetic reaction)। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্বাধীন ও মুক্ত আবহ প্রয়োজন এই জন্যে যে, জ্ঞানের সীমান্তে এর গবেষক ও বিশেষজ্ঞগণ কাজ করবেন। যে জ্ঞান ও উপলব্ধি এখনো স্থিত হয়নি, অনিশ্চিত সম্ভাবনার মধ্যে রয়েছে, এমনকি যেখানে উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের পথ ও প্রক্রিয়া পর্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে সংজ্ঞায়িত নয়, তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে যে সৈনিক পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে কাজ করছে সীমান্তে, তাকে আগে থেকে নির্দেশ দেয়া সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়েও এটি প্রত্যাশিত যে জ্ঞানের সীমান্তে পরিবর্তনের ধারার মধ্যে উদ্ভাবন ও নতুন ধারা সৃষ্টির কাজে যাঁরা তদ্‌গত, তাঁরা কাজ করবেন স্বাধীনভাবে। কিন্তু এই স্বাধীনতা ব্যক্তিস্বার্থ, অহংবোধ বা অস্মিতার দ্বারা পরিচালিত হবার নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের যে অভিযাত্রা, তাকে আমরা তুলনা করতে পারি পথ চলার সঙ্গে। পথচলার সময় আমাদের দেহের ভারসাম্য রক্ষিত হয় গতিশীলতার মধ্যে। আসলে ক্রমাগত পতনশীলতার মধ্যে দিয়েই পথ চলতে হয়। হাঁটবার সময় আমরা যেভাবে সামনে পা বাড়াই, দাঁড়ানো অবস্থায় থাকলে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে আমরা ভূপতিত হতাম। কারণ, আমাদের দেহের ভরকেন্দ্র এই অবস্থায় আমাদের দেহের বাইর অবস্থান করে। আমরা যে পরে যাইনা তার কারণ, পরে যাবার আগেই আমাদের দেহকে সামনে এগিয়ে দেই। আমরা যদি অপরিবর্তী একটি সমাজে বাস করতাম, আমাদের সমস্ত চিন্তা ও জ্ঞানচর্চাই হত প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান ও প্রচলিত ধারণাকে ভিত্তি করে।

নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকার সময় আমাদের দেশের সমস্ত ওজন আমাদের পায়ের ভিতর দিয়ে পার হয়। স্থিতির এই ভারসাম্যতার সঙ্গে আমাদের বাস্তব ভাবনায় একটি মিল আছে। আমরা যত বাস্তববাদী হয়ে, দ্বিধামুক্ত হয়ে, আপন অবস্থানকে সংহত করতে প্রায়শ পাই, আমাদের স্থিতিশীলতা তত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু জ্ঞানের নতুন জগতে প্রবেশের জন্য প্রশ্ন করা চাই। অনুসন্ধিৎসা, অনুসন্ধ্যান, স্বজ্ঞা, সন্দেহ, অনুমান সবই চিন্তার অস্থিতিশীলতা। কিন্তু জ্ঞানের জগতে গতিলাভ করতে হলে এমনি করেই আমাদের পা বাড়াতে হবে বুদ্ধি ও চেতনার রাজ্যে। যতদ্রুত আমরা চলতে যাই তত বেশি স্থিতির ভারসাম্য আমরা হারাই। জ্ঞানের জগতেও যত দ্রুত আমরা অগ্রসর হতে চাই তত বেশি পরিমাণ কল্পনা, স্বজ্ঞা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনিশ্চিত পথকে আমরা বেছে নেই। নতুন উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতার জন্য এই মূল্য আমাদের দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা বলতে এই অনিশ্চিত পথে চলার স্বাধীনতা এই পথ ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল সৃষ্টির পথ। যত বেশি স্বাধীনতা আমরা দাবি করব বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, তত বেশি পরিমাণে আমাদের সরে যেতে হবে তাৎক্ষণিকতা ও বাস্তবতা থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান পরিব্যপ্ত স্থানের মধ্যে ও কালের মধ্যে। অর্থাৎ এর জ্ঞান ও শিক্ষাক্রমে বিশ্বজনিনতার প্রভাব থাকা অপরিহার্য। কিন্তু নিজস্ব এলাকার বাস্তবতাকে

www.pathagar.com

অস্বীকার করে নয়। একই ভাবে সমকালীন ভাবনা, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেও বিশ্ববিদ্যালয়কে অনাগত দিনের সম্ভাবনাকে ধারণা করতে হবে সৃজনশীলতায়।

কাজটি স্বভাবতই অত্যন্ত কঠিন। অতি সমালোচনার দৃষ্টি গঠনমূলক কাজকে ব্যহত করে স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে পারে, অন্যদিকে কালের যাত্রায় প্রবহমান যে বিশ্বজ্ঞানের জগৎ, সেখানে স্থায়ী অবস্থান বলে কিছু নেই। জ্ঞানের ক্ষেত্রে, মূল্যবোধের ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়ের বিচারে, সত্য মিথ্যার যাচাই আমাদের সর্বক্ষণ করতে হবে, অথচ চিরন্তন সত্য বলে কিছু নেই। অর্থাৎ চিরন্তন সত্য বা কাল নিরপেক্ষ সত্য যদি থেকেও থাকে, তা মানব জাতিকেই উদ্‌ঘাটন করতে হবে। এই উদ্‌ঘাটনের কাজ কাল-নির্ভর।

বিশ্বপ্রকৃতি হোক অথবা মানবজাতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য হোক, তা ক্রমাগত শুদ্ধতর ও নির্ভুলভাবে আবিষ্কারের যে পথ. সেই পথই হচ্ছে জ্ঞান চর্চার পথ, এবং সে-পথ অন্তহীন। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সেই প্রশস্ত পথ— সম্মুখে চলার। এই পথের মধ্যে স্থায়ী আসন পেতে বসে থাকার অবকাশ নেই। প্রশ্ন উঠতে পারে, চিরন্তন সত্য বলে যদি কিছু না থাকে, যদি প্রতিনিয়তই নতুন সত্য উদ্‌ঘাটন করতে হয়, তাকে কি আমরা বাস্তব বলতে পারি? আসলে যা কিছু পরিবর্তনশীল তাই অবাস্তব একথা বলার মধ্যে সময়কে অস্বীকার করা আছে। প্রতিটি জীবন্ত গাছই ক্রমাগত বিকাশ লাভ করছে, বদলে যাচ্ছে, কিন্তু তা প্রতি মুহূর্তেই বাস্তব। মৃত গাছ থেকে কাঠের আসবাবপত্রকে শুধু যারা বাস্তব বলে মনে, তাঁরা গাছের পল্লবিত ডালপালা, সবুজ পাতা ও ফুলকে —ফুল ফোটার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে।

আসলে জীবন্ত বৃক্ষের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনাটি আরো একটু এগিয়ে নিতে পারি। বৃক্ষের শেকড় মাটির গভীরে গ্রথিত। ঝড় হাওয়ায় টিকে থাকতে, বস্তুগত খাবার সংগ্রহ করতে এই মাটির সান্নিধ্য ও বন্ধন অত্যাবশ্যক। কিন্তু বৃক্ষের আসল পরিচয় এর পল্লবিত ডালপালায়, এর সবুজ পাতার বিস্তারে। চঞ্চল প্রবহমান অস্থির বাতাস থেকে বৃক্ষের এই অংশ কার্বনডাই অক্সাইড গ্রহণ করছে, এবং বহুযোজন দূরের সূর্য থেকে আসা আলোক ব্যবহার করছে সালকসংশ্লেষণের কাজে।

বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয়কে বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা না করে, বরং নানা রকম বৃক্ষের বাগান ভাবতে পারি। যেখানে নানা বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা আপন স্বাধীনতায় সংশ্লেষণ ঘটাচ্ছে নতুন জ্ঞানের, চেতনার ও প্রেরণার সবুজতায়, দূর বিশ্ব থেকে সত্যের আলোকে শোষণ করে নিয়ে, কিন্তু বাস্তবতার আপন ভূবন, অর্থাৎ দেশ ও জাতির সমস্যাকে অস্বীকার করে নয়।

উন্নয়নশীল দেশের প্রশ্নে মনে হতে পারে আমাদের পারিপার্শ্বিকতার দারিদ্র্যে কি করে সম্ভব পাশ্চাত্যের জ্ঞান সাধনার ও জ্ঞান সৃষ্টির উৎস বিশ্ববিদ্যালয়কে ধারণ করা? আমাদের নিজস্ব যে বাস্তবতা তার রূপই'তো লাভ করবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়।

কিন্তু এ কথা সত্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে অব্যবহিত পরিবেশ থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়, আমার দৃষ্টিতে, মরুভূমির মধ্যে মরুদ্যান। লবনাক্ত জলের বিস্তীর্ণ সমুদ্রে সোনালি ফসলের দ্বীপ। অন্ধকারের বিস্তারের মধ্যে আলোর প্রদীপ। এসব স্বপ্ন মনে হতে পারে। কিন্তু স্বপ্ন দেখার স্বাধীনতাও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় গোলযোগের কেন্দ্র নয়—ভবিষ্যতের স্বপ্নরাজ্যও

বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমাদের মনে অনেক প্রশ্ন আছে — অনেক সংশয় ও অভিযোগ এবং সেই সঙ্গে প্রত্যাশাও।

যেমন প্রশ্ন আছে—বিশ্ববিদ্যালয় আসলে কি? কখন এবং কেমন করে শুরু হল? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে স্কুল বা কলেজের শিক্ষার পার্থক্য কি? শিক্ষকরা কি করেন এখানে? কি তাঁদের প্রধান দায়িত্ব? কে নিয়ন্ত্রণ করবে বিশ্ববিদ্যালয়? বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কি সম্পর্ক বৃহত্তর সমাজের? অর্থনৈতিক উন্নয়নের? রাজনীতির? মানুষ গঠনের? বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা পড়বে? আমাদের কি আরো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন? আরো অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য?

অভিযোগ হল — বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক নৈরাজ্য। মিছিল ও হরতাল, পোস্টার দেয়ালে দেয়ালে। বোমা ও গুলির শব্দ। গাড়িতে আগুন। সংঘর্ষ ছাত্রে ছাত্রে। পথ ঘাট অন্ধকার। পুলিশের ট্রাক মোড়ে মোড়ে। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় ঘন ঘন। সেশন যায় পিছিয়ে অথবা সৃষ্টি হয় সেশন জট। শিক্ষকরা চলে যাচ্ছে দেশ ছেড়ে — কেউ আমেরিকায়, কেউ ইউরোপে, কেউবা মধ্যপ্রাচ্যে। যারা যাচ্ছে না, তাঁদেরও অনেকে মনে মনে দেশত্যাগী।

তবু বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে হবে। তরুণ তরুণীদের প্রচণ্ড ভিড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারে। জীবনের সব আশা সব স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পারলে। যদি ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়, এর প্রতিপক্ষ রূপে, তবু এখন ভর্তি হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যত অন্ধকারই থাকুক। এর ভিতর দিয়েই চলে গেছে জীবনের সমস্ত আলোকিত পথ, উত্তরণের সমস্ত সিঁড়ি। নিজের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ সম্ভব না হলে, সন্তানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ নিশ্চিত করতে হবে, দেশে অথবা বিদেশে।

একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্বীকার করবার বা পাশ কাটাবার পথ নেই, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে স্বপ্ন ভংগ— একে ঘিরে সঞ্চিত যত সব প্রশ্ন, অভিযোগ ও উৎকণ্ঠা। ফলে, সামগ্রিকভাবে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে প্রচণ্ড হতাশা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, শুধু সাধারণ্যে নয়, বিদ্বজ্জন ও বিশেষজ্ঞ মহলেও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমর্থনে সব বক্তব্যই এখন যেন কৈফিয়ত রূপে বিবেচিত। অথচ আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার সংকটময় এই পরিস্থিতিতে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা হল

www.pathagar.com

— গভীর ও সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিশ্ববিদ্যালয় নামক "জন্তু"টিকে অবধারণ করা। "জন্তু" কথাটি ইংরাজি ইবধংঃ শব্দের প্রতিকল্প রূপে এখানে ব্যবহার করেছি। বন্যজন্তুর বিশালতা আছে — প্রচণ্ডতা আছে — সেই সঙ্গে জৈবিক প্রাণবন্ততা। জন্তুর সংগে অপরিচয়তার ও ভয়ের সম্পর্ক আছে। পোষ মানাতে ব্যর্থ হলে আক্রান্ত হবার আশংকা আছে। সব মিলে আছে আকর্ষণ ও বিস্ময় মিশানো শ্রদ্ধা বোধ।

বিশ্ববিদ্যালয়কে জন্তুর সঙ্গে তুলনা করছি এই অর্থে যে, এটি কোন পোষ মানা গৃহপালিত প্রাণী নয়, যা সম্পূর্ণ দেশজ ও পরিচিতি, যাকে গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ন্ত্রণ করা যায় ইচ্ছা মতন। যা শুধু পরিচিত পথে আমাদের মাল বহন করবে অথবা শুধুই সাহায্য করবে ফসলের জমির হাল চাষে। এই জন্তুর সব প্রত্যঙ্গ আমাদের চেনা নয়, অথবা তাৎক্ষণিক প্রয়োজনবোধ দ্বারা নির্ধারিত। এর নিজস্ব একটি স্বাধীনতা আছে চলার-একটি বিকাশের ধারা। এর উদ্ভবের ঘটনার মধ্যে একটি আকস্মিক গুণগত পরিবর্তন আছে— এইটি সুদূরতা ও অস্পষ্টতা। এর সম্মুখ যাত্রায় আছে পথ চলার সংগে নতুন পথের আবিষ্কার। এই পথ অনির্ণেয়, অনিশ্চিত, অন্তহীন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জৈব অভিব্যক্তি আমরা দেখেছি আমাদের ভাষা আন্দোলনে, স্বাধীনতার যুদ্ধে, গণতন্ত্রের সংগ্রামে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একই রূপ প্রতিভাত হয়েছে ইউরোপে, আমেরিকায়, চীনে ও আফ্রিকায়-যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির মহড়ায়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা ক্রান্তিক ঘটনায়।

বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই অভিনব জীবনের রূপ ও অফুরন্ত শক্তি তরঙ্গায়িত শিক্ষক ও ছাত্রের সমন্বিত অনুপ্রেরণা, উপলব্ধি ও চেতনায়।

বিশ্ববিদ্যালয় শুধু জ্ঞান দানের ও নীতি কথা শিখবার আশ্রম নয়। তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটাবার লক্ষ্যে অথবা অব্যবহিত ঘটনার প্রতিক্রিয়া রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয় কোন জাতির নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর মূল গ্রথিত মানব সভ্যতার ইতিহাসে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব ও বিকাশ পরিব্যপ্ত স্থান ও কালের মধ্যে, আন্তর্জাতিক আবহে।

বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রতিষ্ঠান নয় মাত্র - একটি ব্যাপক আয়োজন জ্ঞান সংগ্রহ, সঞ্চারণ, উদ্ভাবন ও সৃজনের। এটি একটি ঘটনা নয়, প্রতিভাস- এক দুঃসাহসিক অভিযান নতুন অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির জগতে। প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান ও প্রচলিত বিশ্বাসের কাছে অন্ধ আত্মসমর্পণ নয়। প্রশ্ন উত্থাপন, বিশ্লেষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই, উৎপ্রেক্ষা, স্বজ্ঞা—সবকিছুর মিলে অসংখ্যের বুদ্ধিগত অংশগ্রহণ, জ্ঞানের ও উপলব্ধির জগৎকে ক্রমাগত পুনঃনির্মাণের এক যৌথ উদ্যোগ।

বিশ্ববিদ্যালয় এমন কোন সংস্থা বা সংগঠন নয় যা নির্দিষ্ট কাঠামো এবং পূর্বনির্ধারিত কিছু নিয়মের ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারে। বহতা নদীর মতই বিশ্ববিদ্যালয় নতুন জ্ঞানের প্রবাহকে ধারণ করে সতত পরিবর্তনশীল। পুরোনো জ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞান ও উপলব্ধির মিশ্রণ ও মিথস্ক্রিয়া সৃষ্টি করছে যে গতি তার একটি অভিঘাত আছে। প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের যে বেলাভূমি, সেখানে ক্রমাগত আঘাত হানছে ছোট-বড় প্রতিটি আবিষ্কারের ঢেউ। সেই অভিঘাতের প্রভাবে পার ভাঙ্গা ও পার গড়ার কাজ চলছে অনবরত।

www.pathagar.com

পরিবর্তনশীল ও অস্থায়ী হলেও নদীর পারের একটি ভূমিকা আছে। পার না থাকলে এর জলধারা হারিয়ে যেত লক্ষ্যহীনতায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমনি পাঠ্যক্রম আছে, পরীক্ষা, মূল্যায়ন, নানা নিয়ন্ত্রণের নিয়ম। কিন্তু নদীর পারের মতই জ্ঞানের প্রবাহকে শুধু লক্ষ্যহীনতায় হারিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাবলীর কাজ, নতুন ধারণা ও উদ্ভাবিত নতুন জ্ঞানের প্রবাহকে প্রতিহত করতে নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়কে এর গতিশীলতায়, পরিবর্তনের ধারায় গ্রহণ করলে এর সংজ্ঞা নির্ধারণ স্বভাবতই দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। বিশ্ববিদ্যালয় কি? এ প্রশ্নের সহজ কোন জবাব হয়তো আমরা সেক্ষেত্রে খুঁজে পাই না। বস্তুত যা সময়ের মধ্যে বিকাশমান একটি প্রতিভাস, ফলে, মুক্ত-প্রান্ত, তাকে সময়নিরপেক্ষ ভাবে সংজ্ঞায়ন সম্ভব নয়। কিন্তু যা সংজ্ঞায়ন অসাধ্য তাই উপলব্ধির অতীত নয়। বিশ্ববিদ্যালয়কে এর বাস্তবতায় ও মূল বৈশিষ্ট্যে বুঝতে হলে নানা দিক থেকে আলো ফেলে সেটি করতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়কে অবধারণ করতে হবে কিছুটা ইতিহাসের দৃষ্টিতে, এর ক্রমবিকাশের ধারায়, কিছুটা আন্তর্জাতিক পটভূমিতে এবং সেই সঙ্গে দেশের সমস্যা ও বাস্তবতার নিরিখে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি প্রয়োজনীয় জ্ঞানের দর্শন ও জ্ঞানতত্ত্বও। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ও স্বশাসনের অধিকার যেমন অপরিহার্য, তেমনি অনিবার্য, এর উপর আরোপিত এক অপরিসীম দায়িত্ব, এবং তা হল জ্ঞানের বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখা। জ্ঞানের সীমান্তে পৌঁছতে গিয়ে নির্বাচিত বিষয়ের বিশেষজ্ঞ একদিকে যেমন তার সাধনার পথকে করছেন সংকুচিত, আপন বিষয়ে গভীরতা অর্জনের লক্ষ্যে, ফলে, বিভাজন ঘটছে জ্ঞানের জগতে, তেমনি সৃষ্টি হচ্ছে আন্তঃতল জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে। জ্ঞানের জগতে এই বিছিন্নতা ও বিভক্তি অতিক্রম করে একটি সমন্বয় ও একীভবনের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে একই সঙ্গে অনেকগুলো বিস্ফোরণের চাপ কাজ করছে। যেমন, জ্ঞান ও তথ্যের বিস্ফোরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাছে মানুষের প্রত্যাশার বিস্ফোরণ, জনসংখ্যার বিস্ফোরণ এবং সেই সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষার বিস্ফোরণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে এই বহুমাত্রিক বিস্ফোরণের প্রভাব শুধু পরিমাণগত ভাবে নয়, গুণগত ভাবেও। অর্থাৎ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্ভূত এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। পরিমাণগত পরিবর্তনের সঙ্গে গুণগত অনেক রূপান্তর অনিবার্য হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আয়োজনে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত এই রূপান্তরের একটি বড় কারণ আধুনিক সভ্যতা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনের তুলনায় ক্রমাগত বেশি হারে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও তথ্যের উপরে, সেই সঙ্গে সংগৃহীত জ্ঞান তথ্যের জগৎ দ্রুত পুরোনো ও অপ্রচলিত হয়ে পড়ছে, এবং তা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের দ্বারা। এর ফলে, জ্ঞানের আহরণ ও সঞ্চারণের যে দায়িত্ব প্রধান্য পেয়ে এসেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে, তা অতিক্রম করে

www.pathagar.com

যাচ্ছে নতুন জ্ঞান সৃষ্টির কাজে এদের অংশ গ্রহণের দায়িত্ব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি, নির্মাণ ও প্রয়োগ— কৌশলের ক্রমাগত পরিবর্তন, এবং জ্ঞানের জগতে অভিনব সব সংযোজন, শিক্ষালাভের পর্যায়কে একটি সময় সীমার মধ্যে আর ধরে রাখতে পারছে না। পৌনঃপুনিক বা জীবন ভর শিক্ষার আয়োজন এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় তাই তরুণ শিক্ষার্থীদের জন্য শুধু নয়, শিক্ষাপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ ও কর্মরত বিশেষজ্ঞদের জন্যেও। বিশ্ববিদ্যালয় পুরোনোদের নতুন করে শিক্ষা লাভের ও অভিমত বিনিময়ের ক্ষেত্রও বটে। নতুন জ্ঞান সৃষ্টির কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণ অর্থাৎ গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবার ফলে, গবেষণাগার ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার যন্ত্রের চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে প্রচণ্ড ভাবে, সেই সঙ্গে গবেষণা জার্নালের। উল্লেখ্য যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেই অত্যন্ত প্রাসংগিক জার্নালের সংখ্যাই লক্ষাধিক।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই শুধু একটি বিশাল বিনিয়োগ নির্ভর ঘটনা নয়, একে সজীব ও আধুনিক রাখার কাজটিও অত্যন্ত ব্যয় বহুল ব্যাপার। উন্নয়নকামী দরিদ্র দেশগুলোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসংগিকতা, গুরুত্ব, প্রকৃতি ও প্রভাব গভীর ভাবে অবধারণের। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাসংগিকতা উদ্‌ঘাটন করতে হলে এর বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে হবে। এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ঐক্য ও সভ্যতার বিকাশে নতুন জ্ঞানের প্রভাবকে অনুধাবন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি কি? জানতে হলে, জ্ঞানের দিগন্তে কি ঘটছে? জ্ঞানের নতুন মানচিত্র কেমন করে রূপান্তরিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ও স্বশাসনের মূল উৎস কি? এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজতে হবে। কিন্তু সব প্রশ্ন উত্থাপিত হবার পর, এবং সব সমস্যার বিশ্লেষণের শেষে, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আমাদের যা করণীয় তা প্রতিফলিত হতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় এবং এর পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তব পদক্ষেপ ও যথার্থ অর্থ বিনিয়োগের সিদ্ধান্তে।

একথা সত্য যে, আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা ঘটে ইউরোপের অনুকরণে। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা বুঝায় তার উদ্ভব একাদশ শতাব্দীতে ইতালির সালোর্নো ও বলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এর আগেও উচ্চ শিক্ষার শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল ইউরোপে, কিন্তু আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ধারণা ও সম্ভাবনা তা সেখানে প্রতিফলিত ছিল না। শিশুদের শিক্ষাদানের প্রচলন যদিও আদিম সমাজেও লক্ষ্য করা গেছে, বড়দের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা সমাজে তখনই ঘটেছে, যখন অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও অবকাশ লাভের সুযোগ অর্জিত হয়েছে। বয়স্ক শিক্ষার প্রাচীনতম নিদর্শন অবশ্য খুঁজে পাওয়া যাবে আমাদের উপমহাদেশেই খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে, বনাশ্রমে, যখন আর্যদের বাসস্থান নির্মাণের ইতিহাস লিখিত হয়েছিল ঋগ্বেদ রচনার ভিতর দিয়ে। এই সময় থেকে গুরুরা নির্বাচন নিত তপবনে— জনপদের সমস্ত ব্যস্ততা ও হট্টগোল থেকে দূরে। শিক্ষা লাভের জন্য তরুণ শিষ্যরা শিক্ষকের সঙ্গে বাস করতো, দার্শনিক ভাবনা, জ্ঞানার্জন ও সত্যানুসন্ধানে নির্জন, প্রশান্ত অবকাশে। রবীন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন তপবনের অনুপ্রেরণা থেকেই শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠান করেন।

www.pathagar.com

আমাদের মহাদেশেই শিক্ষার আর একটি প্রাচীন ঐতিহ্য আমরা লক্ষ্য করি কনফিউসিয়াসের গ্রন্থে, সেখানে সম্রাট সুন খৃস্টপূর্ব ২২৫৫ থেকে ২২০৫ অব্দ পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব কালে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে দেশের প্রশাসক নির্বাচনের রীতি প্রচলন করেন। বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্ব চীনদেশে এর ফলে প্রচণ্ড ভাবে বৃদ্ধি পায় সেই প্রাচীন কালেই, যদিও সে শিক্ষা ছিল শুধু চীনের কাব্য সাহিত্যে।

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা দেখতে পাই প্লেটোর এথেনস-এ প্রতিষ্ঠিত একাডেমীতে। এটা ঘটেছিল খৃষ্টপূর্ব পাঁচ শতাব্দীতে। শিষ্য এ্যারিস্টোটল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম সাহিত্য শিক্ষার সঙ্গে গণিত ও বিজ্ঞান শিক্ষাকে সংযুক্ত করেন। অ্যাথেনীয় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি সুদূর অতীতের ফসল রূপে আমরা দেখতে পাই আলেকজেন্দ্রিয়া মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা। এখানে কৃষ্ট পূর্ব ৩২৩ অব্দ থেকে খৃষ্ট পূর্ব ৩০ অব্দ, রোমানদের উত্তর-আফ্রিকা জয় করা পর্যন্ত সময়ে, সাত লক্ষ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়েছিল। এই মিউজিয়ামটি আসলে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল, বিশেষ করে জ্ঞানের সংগ্রহের এবং গবেষণার কাজে অংশ গ্রহণে। ইউক্লিড, আর্কিমেডিস, হেরো—এরা সবাই এখানকার ফসল।

ইউরোপে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার আগে দীর্ঘসময় ধরে প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের সঞ্চিত জ্ঞান আরব বিশ্বে লালিত ও সংরক্ষিত হয়েছে। এর ফলে বাগদাদ, দামাস্কাস, কায়রো এবং আলেকজেন্দ্রিয়াতে উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে উঠে ছিল। ১০৭৬ খৃষ্টাব্দে যে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটে তার পর থেকে উচ্চ শিক্ষার এই উদ্ভাবন পৃথিবী জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশের ইতিহাসে অনেকবার স্থবিরতা এসেছে। কিন্তু এর দ্রুত বিস্তার লাভের কয়েকটি পর্যায়কে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। দ্বাদশ শতাব্দীতে বলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায় দশ হাজারে। এর পর ইউরোপের রেঁনেসা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসারকে আর একবার আকস্মিক ভাবে বাড়িয়ে দেয়। শেষ যে জোয়ার আমরা প্রত্যক্ষ করেছি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে, তা হল দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হবার পর। সেই বিকাশের ধারা এখন পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসছিল ঠাণ্ডা যুদ্ধের কারণে। সম্ভবত সেই ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানে আমরা বিশ্ব জুড়ে আর এক জোয়ার আশা করতে পারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে। এখানে উল্লেখ্য যে উচ্চশিক্ষার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের হলেও যেন কুমিল্লার শালবনবিহার বা বগুড়ার পাহাড়পুরে বৌদ্ধবিহার, যেখানে ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যন্ত শিক্ষা দেয়া হতো। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের মাটিতে প্রথম সূচিত হয় ১৯২২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার ভিতর দিয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশের দীর্ঘ যে অনেকগুলো শতাব্দী আমরা পার হয়ে এসেছি, সেখানে অনেক রূপান্তর ঘটেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, কিছু ঐতিহ্য এবং অধিকার—নানা সংগ্রামের ফসল এবং দীর্ঘ কালের প্রভাব রূপে। প্রথম যে সূত্রটি বিশ্ববিদ্যালয় লালন করে আসছে দূর অতীত থেকে তা হল, কিছু জ্ঞানের সাধক এবং তদ্গত সত্য সন্ধানীর আশ্রম এটি। যেন একটি পরিবার—

www.pathagar.com

জীবনের সমস্ত কোলাহল থেকে নির্বাসিত, জ্ঞানের অন্বেষায় একাগ্রচিত্ত ও শিক্ষাদানের ব্রতী কিছু সন্ন্যাসী। কর্মব্যস্ত ও নানা কাজে ব্যাপৃত আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক বনে নির্বাসিত না হতে পারেন, কিন্তু লাইব্রেরীর বই ও জার্নালের অরণ্যে, ল্যাবরেটরীর নিঃসঙ্গ একাকিত্বে অথবা স্বাধীন ভাবে আপন সৃজনশীল ভাবনার জগতে অবশ্যই তাকে নির্বাসিত হতে হবে প্রাচীন সন্ন্যাসীর মতন সত্যের সন্ধানে। এবং সেই অর্থে একটি তপোবনের পরিবেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যগত সূত্র রূপে টিকে আছে বলে আমার মনে হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে, যখন ইউরোপে চার্চের প্রত্যক্ষ শাসন থেকে কেউ মুক্ত ছিল না, এমন কি নৃপতিরাও, তখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মুক্ত করা হয়েছিল বিশপদের নিয়ন্ত্রণ থেকে, এবং তাঁরা স্বাধীন ভাবে নিজেদের সমাজ গড়ে তুলতে পেরেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের চ্যান্সেলর, ভাইস-চ্যান্সেলর, ডীন ইত্যাদি উপাধির মধ্যে সেই ধারা প্রত্যক্ষ করা যায়। এই ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়েছিল স্কুল অব নটরডম ডি প্যারিসে।

কিন্তু দক্ষিণ ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটি সংস্থা গড়ে উঠে। সেখানে শিক্ষদের তারা বেতনভোগী রূপে নিয়োগ করতো শিক্ষা লাভের জন্য। এক্ষেত্রে ছাত্রদের একটি আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। ইউরোপের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ল্যাটিন আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইউনিয়ন বা সংস্থার যে প্রচণ্ড ক্ষমতা, তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে এখানে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি সূত্র বা ঐতিহ্য, যা ইত্যালির সালার্নো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলে এসেছে, তা হল, পেশাগত শিক্ষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা। এর সূচনা ঘটেছিল চিকিৎসা বিজ্ঞান দিয়ে।

নতুন জ্ঞানের সন্ধান এবং জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করা বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত শিক্ষকদের বুদ্ধিগত অনুপ্রেরণার অংশ হয়ে আছে সেই প্রাচীন কাল থেকেই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে এই ঐতিহ্য বিশেষভাবে সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে।

উনবিংশ শতাব্দীতে এসে আর একটি ধারা সংযোজিত হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যে, এবং তা হল — শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির বিকাশে উদ্ভাবিত নতুন জ্ঞান ও আবিষ্কৃত প্রকৃতির নিয়মকে ব্যবহার করা। শুধু লব্ধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে প্রয়োগ করা নয়, প্রয়োগের লক্ষ্যে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজন বোধ থেকে নতুন জ্ঞানের সন্ধান ও গবেষণার কাজে অর্থ বিনিয়োগ শুরু হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশের ধারা এবং দীর্ঘকালের প্রভাবে এর অর্জিত মূল কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল, বিশ্ববিদ্যালয় একটি জীবন্ত প্রজাতির মতন দীর্ঘ বিবর্তনের ধারায় যেন অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এখানে শিক্ষকদের নিঃসঙ্গ জ্ঞানের সাধনা, চিন্তার স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রভাবমুক্ততা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের সঙ্গে প্রায়গিক জ্ঞানের অন্বেষণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের আধিপত্য — এসবই যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়কে সংজ্ঞায়িত করার প্রশ্ন তাই

www.pathagar.com

অতটা প্রাসঙ্গিক নয়, যতটা প্রয়োজন এর যথার্থ বর্ণনা উপস্থিত করা, আন্তর্জাতিক পটভূমিতে।

অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ণনা কোন স্থির চিত্র নয়, অথবা কাল নিরপেক্ষ বা স্থান নিরপেক্ষ। চয়ন ও বর্জনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আধুনিক রূপ ও বৈশিষ্ট্য, তা যান্ত্রিক নয়, অনেকটা জৈব, সহজাত এবং আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত। নিয়ন্ত্রণের অতীত বলছি এই অর্থে যে, একটি জীবন্ত প্রাণীর বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত যদি ভাবি বিশ্ববিদ্যালয়কে, তা হলে একে রুগ্ন বা স্বাস্থ্যবান করার স্বাধীনতা আছে, একে প্রাণহীন করার স্বাধীনতাও, কিন্তু একে এর মূল বৈশিষ্ট্যবর্জিত করা যাবে না, যেমন যাবে না একটি ঘোড়াকে একটি শৃগালে রূপান্তরিত করা।

দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে, বস্তুত কয়েক সহস্র বছর ধরে, পৃথিবীর নানা দেশ সভ্যতার অসংখ্য পণ্ডিত, প্রাজ্ঞব্যক্তি, জ্ঞানের সাধক, উদ্ভাবক ও সৃজনশীল মানুষের অবদান শোষণ করে নিয়ে জ্ঞানের ও উপলব্ধির যে বিমূর্ত জগৎ সৃষ্টি হয়েছে—সেই সঙ্গে বিশ্বজগৎ সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধিৎসা, বুদ্ধিগত অনুপ্রেরণা ও চেতনার—বিশ্ববিদ্যালয় এ সবকিছুর ধারক ও সঞ্চারক — শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষকের যৌথ আয়োজনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই দুঃসাহসিক, দুর্গম ও অনিশ্চত যে অভিযাত্রা, অজ্ঞানতার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে জ্ঞানের আলোকিত পথ নির্মাণ করে করে, তা নির্ঝঞ্ঝাট ও নির্বিঘ্ন হবে এটা প্রত্যাশিত নয়। সভ্যতার যে রিলে দৌড়, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে অর্পিত হয়েছে— আলোকিত পথে অতীতে যারা জ্ঞানের মশাল জ্বেলেছেন, সেই মশালকে আরো উজ্জ্বল করে তুলে দেয়া আজকের তরুণদের হাতে। কিন্তু সভ্যতার যে সম্মুখ পথ তার প্রান্ত কারও জানা নেই—সে পথ অন্তহীন বলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসনের ও স্বাধীনতার ভিত্তি আসলে এই যে, এখানে যাঁরা জ্ঞানের সীমান্তে কাজ করছে, অংশ নিচ্ছে নতুন জ্ঞান বৃদ্ধিতে ও নতুন সব তাত্ত্বিক ও বস্তুগত নির্মাণ কৌশলের উদ্ভাবনে, তাদেরকে পূর্বনির্ধারিত নীতিমালা ও আদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে স্কুল ও কলেজের শিক্ষার পার্থক্য হল — স্কুল ও কলেজের মূল দায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করা, প্রচলিত মূল্যবোধ সামাজিক নীতি মালা তাকে শিখানো, সামাজিক করে তাকে গড়ে তোলা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শিক্ষার্থীকে আপন ব্যক্তিত্বে বিকশিত হতে দেয়। তার কল্পনা শক্তি, প্রশ্ন করবার স্বাধীনতা, সমালোচনার দৃষ্টি, যাচাই করার ও সন্দেহ প্রকাশের মুক্তবুদ্ধি, জ্ঞান আহরণের আকাঙ্ক্ষা ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির অনুপ্রেরণা— সবই তার ব্যক্তিত্ব ও কর্মধারায় অনিবার্য উপাদান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চিত্র অবশ্যই নতুন। প্লেটো থেকে বেকন পর্যন্ত জ্ঞানের জগতে উত্তরণের যে ধারণা ছিল তা হল, ধর্মান্ধতা ও অন্ধবিশ্বাস থেকে দর্শন ও যুক্তিবাদে উত্তীর্ণ হওয়া। কিন্তু বিশ্বজগতকে উপলব্ধি করার ও এর রহস্য উদঘাটনের নতুন যে পথ আবিষ্কৃত হয়েছে সম্প্রতি, এবং যার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন আমেরিকার শিক্ষা দার্শনিক জন ডিউই, তা হল, যুক্তিবাদই যথেষ্ট নয়, চাই experimentation

www.pathagar.com

অর্থাৎ বুদ্ধির উত্তরণ ও উপলব্ধির বিকাশে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা — আর সে পথ স্বভাতবই অনিশ্চিত।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কি তা হলে নৈরাজ্যের কেন্দ্র ভূমি? কোন মূল্যাবোধ ও নীতি কি এখানে স্থায়ী ভাবে কাজ করেনা? বিশ্ববিদ্যালয় কি অস্থিতিশীল?

বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয়ের মুলনীতি সত্যানুসন্ধান —এবং তা পরীক্ষা নিরীক্ষা, প্রশ্ন উত্থাপন ও স্বাধীন ভাবনা ও মুক্ত বুদ্ধির ভিতর দিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা হল নতুন জ্ঞান ও অভিনব সব উদ্ভাবনকে উপলব্ধির চেতনায়, সৌন্দর্য বুদ্ধিতে বিন্যস্ত করা ও সমন্বিত করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থিতি এর গতিশীলতার মধ্যে।

এ কথা সত্যি যে প্রতিটি সমাজ, সংগঠন বা রাষ্ট্র স্থিতিশীলতা চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশ্ন উত্থাপন, মুক্ত বুদ্ধির বিকাশ ও উপলব্ধির জগৎকে ক্রমাগত পুনঃনির্মাণের যে প্রক্রিয়া চলার কথা তা সাধারণভাবে স্থিতিশীলতার সহায়ক নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটি বৈরী মনোভাব তাই স্বাভাবিকভাবে কাজ করে রাষ্ট ও সমাজের নানা স্তরের প্রশাসকদের মধ্যে। কিন্তু একথা বুঝতে হবে যে, উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য এটুকু ঝুঁকি গ্রহণ হচেছ একটি সামাজিক মূল্য যা অবশ্যই দিতে হবে ভবিষ্যতের কথা ভেবে। আমাদের পথ চলার বেলাতেও আমরা প্রতিনিয়ত ভারসাম্য হারাই। বসে থাকা বা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায়আমাদের ভরকেন্দ্র আমাদের দেশের ভিতর দিয়ে মাটিকে স্পর্শ করে। কিন্তু হাঁটার সময় বা দৌড়াবার সময় এই ভর কেন্দ্র দেহের বাইরে চলে যায়, যা পতনের পূর্ব শর্ত। আমরা যে পড়ে যাই না তার কারণ, আমরা ক্রমাগত নতুন অবস্থানে চলে যাই- নতুন এক স্থিতিশীলতায়। বস্তুত চলা মানেই ক্রমাগত পতনশীল অবস্থার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হওয়া। যত দ্রুত আমরা ছুটি তত বেশী আমরা স্থিতিশীলতা হারাই এবং গতির ভিতর দিয়ে তা থেকে রক্ষা পাই। অর্থাৎ চলা মানেই নিশ্চল স্থিতিশীলতার পরিবর্তে গতিশীল ভারসাম্য রক্ষা করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের হচ্ছে সেই গতির মধ্যে স্থিতিশীলতা রক্ষার এক ব্যবস্থা। আমরা যে সুবিন্যস্ত সুস্বাদু খাবার পাই খাবারের টেবিলে, তা রান্না ঘরের বিশৃঙ্ক্ষলার মূল্যে। কাঁচা খাবারের এক বিন্যস্ত অবস্থা থেকে রান্না খাবারের অন্য এক বিন্যস্ত অবস্থায় রূপান্তরের পথে রন্ধনশালাই সমস্ত বিশৃঙ্খলাকে ধারণ করে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে যে বিপুল অগ্রগতি এবং যে অফুরন্ত ফসল মানুষ ভোগ করছে— মাইক্রোইলেকট্রনিকস, কম্পিউটার, দ্রুত গতির যানবাহন, বায়ো টেকনোলোজী ইত্যাদির কল্যাণে, যেখানে নতুন প্রযুক্তিই শুধু আসেনি, প্রকৃতির নিয়মকে নতুন করে জানতে হয়েছে, জ্ঞানের জগৎ ও উপলব্ধির জগতে নানা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এনে। এর জন্য মূল্যও দিতে হয়েছে অনেক বিজ্ঞানীকে - কারাবাস, অবমাননা, অবজ্ঞা, এমনকি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত। শুধু বিজ্ঞানের জগতে নয়, সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্যের বেলাতেও একই প্রতিক্রিয়া ঘটে পরিবর্তনের বিরুদ্ধে।

কিন্তু পরিবর্তন মানেই অগ্রগতি নয়। অগ্রগতি বস্তুত তাৎক্ষণিক স্থিতিশীলতার মূল্যে দীর্ঘ মেয়াদী ও গতিশীল স্থিতিশীলতা এনে দেয়, যা স্থানীয় ভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলেও পরিব্যাপ্ত স্থান ও কালের মধ্যে বিন্যাস ও শৃঙ্খলা ঘটায়।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কোন ইউটোপীয় ধারনা সৃষ্টি করছি না। বিশ্ববিদ্যালয় একটি সৌখিন ব্যাপার নয় অথবা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কোন উৎস। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য মানব সম্পদ সৃষ্টি। এটা এখন অর্থনীতিবিদের কাছে স্পষ্ট যে, অগ্রগতি আসলে মানুষের প্রচেষ্টার ফসল। একমাত্র শিক্ষা প্রাপ্ত, সৃজনশীল ও অনুপ্রাণিত মানুষ তার উদ্ভাবন ও শ্রম দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থের যথার্থ প্রয়োগ ঘটাতে পারে। আমরা লক্ষ্য করছি যে, কোন শিল্পসামগ্রী যত আধুনিক তত বেশি পরিমাণে নতুন জ্ঞান ও অভিনব কৌশলের ফসল। আমরা একটি আধুনিক কম্পিউটার বা মাইক্রোচিপ এর সঙ্গে রেলগাড়ি বা জাহাজের তুলনা করতে পারি। রেলগাড়ি বা জাহাজ তৈরিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে প্রচুর নির্মাণ বস্তুর প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু কম্পিউটারের সবটা মূল্যই প্রায় এর নির্মাণ কৌশল ও তথ্যের জন্য।

আমরা যদি কম্পিউটারের Software বা নির্দেশ মালার কথা ভাবি, যার মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সম্পদ সৃষ্টিতে জ্ঞান ও তথ্যের ভূমিকা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রসঙ্গে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভাবি, তাহলে এটা স্পষ্ট যে, বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞান, প্রযুক্তির উদ্ভাবন, গবেষক সৃষ্টি এবং উচ্চমানের ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখার একমাত্র পথ, এবং এ কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের। আমরা যদি অযোগ্য, অসৎ ও দুর্বল শাসকদের হাত থেকে স্থায়ী ভাবে রক্ষা পেতে চাই, সে ক্ষেত্রেও সচেতন শিক্ষিত সমাজ চাই, সে দায়িত্বও বিশ্ববিদ্যালয়ের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা অত্যন্ত জটিল ও সৃজনশীল এক কাজ। এর কারণ সম্পূর্ণ বিপরীত দুই মেরুকে ধারণ করতে হয় এখানে। একদিকে সামাজিক দায়িত্ব, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতা, অন্যদিকে স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা, বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ ও মুক্ত বুদ্ধির প্রকাশ।

সামাজিক নিরাপত্তা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক শান্তি ছাড়া ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সৃজনশীলতার বিকাশ সম্ভব নয়। মূল্যবোধ ও নৈতিক সততা ভিন্ন মানুষ সমাজে কাজ করতেও পারেনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা তাই, এমন হতে হবে যা আমাদের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে যথার্থ ভাবে নির্বাচন করতে পারে সামাজিক পটভূমিতে। শেষ পর্যন্ত আমাদের সৃজনশীলতা ও মুক্তবুদ্ধি যেন খর্ব না হয়। একটি তরুণের নৈতিকতা যেন অন্ধ ভক্তি, সমাজ বা কোন দলের শাসনের ভয়, আজ্ঞানুবর্তিতা ও ক্ষমতাশীলের কাছে আনুগত্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়।

উচ্চ শিক্ষাকে এমনভাবে দেখতে চাই আমরা, যেখানে জ্ঞানের বিষয়ের আকর্ষণ, প্রকৃতির নিয়মের সৌন্দর্য্য ও সর্বব্যাপিতা, গণিতের যৌক্তিক শৃঙ্খলা ও শিল্পের বিন্যাস শিক্ষার্থীর মুক্তবুদ্ধি ও সৃজনশীলতা খর্ব না করেও উন্নততর এক নৈতিকতা ও আদর্শের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে।

পরিকল্পনা তাই হতে হবে অযান্ত্রিক, নমনীয়, সৃজনশীল, যা শিক্ষার্থীর মুক্ত চেতনাকে বন্দী করবে না এবং তার স্বাধীন ভাবনা ও অনুপ্রেরণাকে সজীব রাখবে।

www.pathagar.com

মনের বিকাশ ও সভ্যতার অগ্রগতিতে ভাবনা ও কাজ উভয়েরই অবদান আছে। কিন্তু বস্তুগত সভ্যতা ও যান্ত্রিক কাজ বিশ্বজগৎ ও পরিবেশ সম্পর্কে একটি বিচ্ছিন্নতার ধারণা দেয়। আমাদের ভাবনা ও মানসিক শ্রম এই বিচ্ছিন্নতাকে কাটিয়ে একটি সমন্বয় ও ঐক্য সৃষ্টি করে মনের মধ্যে। এই ঐক্য আমাদের প্রয়োজন, বিচিত্র ঘটনা মালায় ও পরিব্যপ্ত স্থান ও কালের মধ্যে আপন ব্যক্তিত্বকে অখণ্ডিত রাখতে। এই সমন্বয় আমাদের প্রয়োজন সমাজ, দেশ ও পৃথিবীর অসংখ্য মানুষের বৃহৎ এক অবিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে বাস করার জন্য।

জ্ঞানের যে নতুন মানচিত্র নির্মীয়মান, সেখানে একটি গভীর ঐক্য আমরা প্রত্যক্ষ করছি। আমরা জীনের চিত্র দেখেছি ডিএনএ এর মধ্যে, জীনের বিন্যাসে। আমরা দেখেছি বস্তুর সূক্ষ্মতম কণিকাও অনিশ্চয়তায় বিধি অনুসারে একই সঙ্গে অবস্থান আর গতির পরিচয় তুলে ধরে না যান্ত্রিক ভাবে। একেটি সম্ভাবনার নিয়ম যেন বিশ্বকে পরিচালনা করছে, যার নিকটতম সাদৃশ্য পাই মানুষের মস্তিস্ক বা মনের সঙ্গে, কোন যন্ত্র বা ইঞ্জিনের সঙ্গে নয়। কৃত্রিমবুদ্ধির এই যুগে আমাদের কম্পিউটার ও আমাদের মস্তিস্কের মধ্যে ব্যবধান যাচ্ছে কমে।

প্রকৃতিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প—সমস্তক্ষেত্রে গণিতের ব্যবহার এক নতুন সামঞ্জস্য ও সাযুজ্য উদঘাটন করছে বিচ্ছিন্ন সব বিষয়ের মধ্যে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এক সময় বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির লক্ষ্যে ও বিষয়ের গভীরে প্রবেশের প্রয়োজনে জ্ঞানের জগৎকে বিভক্ত করেছিল। কিন্তু জ্ঞানের অগ্রগতি মানুষের মনকে অভিজ্ঞতার এমন এক গভীরে নিয়ে গেছে, যেখানে উপলব্ধির অবিচ্ছিন্ন ধারা প্রবাহিত। বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা ভাবতে পারি এই গভীর ও ব্যাপক ঐক্যসৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু রূপে।

আমরা একটি বিকাশমান বিশ্বে বাস করছি। প্রাণিজগতে কয়েকশ কোটি বছরের বিবর্তনের ভিতর দিয়ে উদ্ভব ঘটেছিল মানুষের। সেই অভিব্যক্তি ছিল অন্ধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের। জ্ঞানের জগতে নতুন এক বিকাশের পথ এখন উন্মোচিত হয়েছে। অভিব্যক্তি ও উত্তরণের এই পথ অন্ধ নির্বাচনের নয়। সচেতন ভাবে জ্ঞান সাধনার, ক্রমাগত শুদ্ধতর রূপে প্রকৃতির নিয়মগুলো আবিষ্কারের ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণের, বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি গভীতর করার।

সভ্যতা আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে - বস্তুগত প্রাচুর্য, বিপুল শক্তির উৎস, প্রচণ্ড গতি, রোগমুক্তির বিস্ময়কর সমাধান, দীর্ঘ আয়ু, ব্যাপক যোগাযোগ সাধ্যতা, অভাবনীয় সব যন্ত্রের উদ্ভাবন। কিন্তু সভ্যতার সবচেয়ে বড় উদ্ভাবন হল শিক্ষা।

শিক্ষা ব্যবস্থার ভিতর দিয়েই একজন তরুণ মানব সভ্যতার দীর্ঘদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে শোষণ করে নিতে পারে দ্রুত। তার লব্ধ বুদ্ধিগত বয়স এখন আর নির্ধারিত নয় তার জন্ম তারিখ দিয়ে বরং সভ্যতার বয়সই তার নিজের বয়স। কিন্তু সঞ্চিত জ্ঞানের চেয়েও বড় যে প্রাপ্তি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী লাভ করে, তা হল, নতুন জ্ঞান সৃষ্টির স্বাধীনতা; অনভিজ্ঞাত জগতের জন্যেও নিজেকে প্রস্তুত

www.pathagar.com

করা। ভবিষ্যতের পথে সেই ত্বরান্বিত অভিযাত্রায় সমস্ত শক্তি ও প্রেরণার উৎস অবশ্যই জ্ঞান — অভিনব ও বিকাশমান। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সভ্যতার সেই বিস্ময়কর উদ্ভাবন, যেখানে সেই নতুন জ্ঞান সৃষ্টির আয়োজন চলে পরিকল্পিতভাবে। জ্ঞান সৃষ্টির এই ব্যবস্থায়, উদ্ভাবনের ভিতর দিয়ে মানুষ লাভ করেছে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা। জ্ঞান যদি ক্ষমতা হয়, জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষমতা হচ্ছে ক্ষমতার উপরে ক্ষমতা। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সেই অপার শক্তির উৎস অথবা সেই সম্ভাব্য স্বপ্নরাজ্য।

আগামী দিনে আমাদের দেশ ও পৃথিবী তাই কেমন হবে? তা নির্ভর করছে আগামী দিনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং পৃথিবীর অন্যসব বিশ্ববিদ্যালয় কি রূপ পরিগ্রহ করবে তার উপরে।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ: বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা বুঝায় বাংলাদেশের ভূখণ্ডে তার সূচনা ঘটে ১৯২১ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে। এরও আগে ভারত উপমহাদেশে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ইসাট ইন্ডিয়া কোম্পানী লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু আমাদের উচ্চ শিক্ষার ঐতিহ্য আরো প্রাচীন, কুমিল্লার শালবনে ও বগুড়া জেলার পাহাড়পুরে উচ্চ শিক্ষার যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৌদ্ধবিহার নামে, তাকেও এক অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় বলা চলে। এই সুদীর্ঘ সময়ের প্রবাহে নানা রূপান্তর ও পরিবর্তন ঘটেছে উচ্চ শিক্ষার ধারায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো আমূলভাবে বদলেছে, বৃদ্ধি পেয়েছে ছাত্র সংখ্যা ও ব্যয়বহুলতা, পরিবর্তিত হয়েছে শিক্ষাদর্শন। বস্তুত বিশ্ববিদ্যালয়কে মোকাবেলা করতে হচ্ছে একই সঙ্গে কয়েকটি বিস্ফোরণের সঙ্গে যেমন — ছাত্র সংখ্যার বিস্ফোরণ, জ্ঞানের বিষ্ফোরণ ও মানুষের প্রত্যাশার বিষ্ফোরণ, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম। শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা তোলপাড় ও বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের মধ্যেও যে বিশ্বাস ও মূল্যবোধ শিথিলতা লাভ করে ক্রমাগত দৃঢ়তর হয়েছে তা হল ঃ যথার্থ উচ্চ শিক্ষা অর্থাৎ উন্নত মানের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা হচ্ছে একটি জাতির সার্বিক অগ্রগতির মূলভিত্তি।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে, তা যতই অবাঞ্ছিত হোক, এসব ঘটনা এ কথাই প্রমাণ করে যে বিশ্ববিদ্যালয়কে পাশ কাটিয়ে থাকার বা উচ্চ শিক্ষাকে অবহেলা করার কোন অবকাশ নেই। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সর্বোপরি অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের যে প্রত্যাশা জাতির, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা অগ্রগণ্য বলেই সবার দৃষ্টি এখানে নিবন্ধ। এমনকি যারা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সবচেয়ে সমালোচনা মুখর, তাদের দৃষ্টিও। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তরুণদের উচ্চ শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষা। ফলে ছাত্র সংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে অভাবনীয়ভাবে। জ্ঞানের জগৎ ক্রমবর্ধমান হারে প্রসারিত হওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার খরচ বাড়ছে সেই অনুপাতে। নতুন নতুন গবেষণা পত্রিকা সংযোজিত হবার প্রয়োজনে লাইব্রেরীর কলেবর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারগুলোতে আধুনিক সব

www.pathagar.com

যন্ত্রের সংগ্রহ অপরিহার্য হয়ে উঠছে, সেই সঙ্গে প্রয়োজন পড়ছে বিপুল সংখ্যক উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ও গবেষণায় অভিজ্ঞতালব্ধ মেধাবী শিক্ষকের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুধু পুরানো জ্ঞান আহরণ ও সঞ্চারণ নয়, নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে অংশগ্রহণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপাদিত অদৃশ্য সামগ্রী হচ্ছে নতুন জ্ঞান ও তথ্য। বাংলাদেশ দরিদ্র এই অজুহাতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পশ্চাদপদ ও নিম্নমানের করে রাখার কোন অবকাশ নেই। জ্ঞানের উপরিতল সব সময় সমতা লাভ করতে চায়। ফলে, যে দেশ যত পিছনে পড়ে আছে তাকে তত দ্রুত অগ্রসর হতে হবে, জ্ঞানের জগতে এই সমতা লাভের জন্য। এখানে কৃপণতা ও ভীরুতাকে প্রশ্রয় দেবার বা পশ্চাদপসারণের অবকাশ নেই। জীবনের আর সমস্ত ক্ষেত্রে কৃচ্ছতা অবলম্বন করে হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান ও এর প্রসারকে উন্নত ও অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের ঐতিহ্য, উচ্চ শিক্ষার জন্য অসংখ্য তরুণ তরুণীর আকাঙ্ক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ, বস্তুগত ও মানসিক উন্নয়ন এবং সমাজ বিবর্তনের যে প্রত্যাশা— তা একদিকে যেমন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন সৃষ্টি করছে, অন্যদিকে সম্পদের সীমাবদ্ধতা, সামাজিক জড়তা, রাজনৈতিক বিরোধ, স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং নিষ্ঠুর আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বড় এক চ্যালেঞ্জরূপে উপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়কে আমাদের প্রত্যাশিত ও আকাঙ্ক্ষিত রূপ দেয়ার পথে আমরা একটি ক্রস রোডে দাঁড়িয়ে আছি। একদিকে আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা ও স্বপ্ন, অন্যদিকে সম্পদের সীমাবদ্ধতা, জড়তা ও বাস্তবতা। আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ যে পরিমাণে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যতের উপরে নির্ভরশীল, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আমাদের ভাবনা ও পরিকল্পনা সেই অনুপাতে গুরুত্বপূর্ণ।

একটা সময় ছিল যখন শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষা, মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ব্যক্তি ও জ্ঞান সাধকের বিশেষ সুবিধা ও অধিকার রূপে গণ্য হতো। উচ্চ শিক্ষার আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল প্রায় অপরিবর্তিত ও পূর্ব নির্ধারিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য, ধারাবাহিকতা ও প্রাতিষ্ঠানিক জড়তা শুধু আধিপত্য বিস্তার করেছিল তাই না, সেটাই উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য রূপে বিবেচিত হতো। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের পর থেকে উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে উৎপাদন ও সম্পদ সৃষ্টির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সৃষ্টি হবার ফলে উচ্চ শিক্ষার একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি একই সঙ্গে সুদৃঢ় ও প্রসারিত হয়েছে।

শিক্ষার সঙ্গে বস্তুগত ও মানসিক উন্নতির কার্যকারণ সম্পর্ক গভীরতর ও ব্যাপক। যে দেশ যত উন্নত অর্থনৈতিকভাবে, সে দেশ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও তত অগ্রসর। এর কারণ উন্নত ও আধুনিক শিক্ষা এক দিকে যেমন দক্ষ সৃজনশীল ও উন্নত ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও বিস্তার ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সম্ভব করেছে, অন্যদিকে উন্নত ও আধুনিক উচ্চ শিক্ষাকে বিপুল সংখ্যার শিক্ষার্থীর মধ্যে ছড়িয়ে দেবার যে অর্থনৈতিক দায়িত্ব তা গ্রহণ করবার ক্ষমতা সমাজ অর্জন করেছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি থেকে যথাযথ ও উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় সমৃদ্ধির যে সমীকরণ উন্নত দেশগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আমাদের দেশে তা সম্ভব হয়নি। ফলে, আমাদের যে পরিমাণ আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে, সেই অনুপাতে উন্নয়ন ও বিকাশের

www.pathagar.com

সামর্থ্য ও সমর্থক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো লাভ করেনি। সাধ ও সাধ্যের মধ্যে এক ক্রমবর্ধমান বিরোধ ও ব্যবধান তাই সৃষ্টি হয়ে চলেছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ও সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায়, যে অস্থিরতা ও অসন্তোষ আমরা লক্ষ্য করছি, তা এই বিরোধ ও ব্যবদান থেকে উদ্ভুত। এই সমস্যার সহজ কোন সমাধান নেই। কারণ, আমাদের তরুণদের মধ্যে প্রত্যাশা সৃষ্টি হচ্ছে উন্নত দেশগুলোর আলো ঝলমল ও আকর্ষণীয় জীবনের হাতছানি থেকে, কিন্তু উচ্চ শিক্ষার প্রত্যাশা মিটাবার সাধ্য নির্ধারিত হচ্ছে আমাদের সামাজিক বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য থেকে। এই অন্তর্নিহিত বিরোধ ও অসামঞ্জস্যকে পটভূমিতে রেখেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসরকারীকরণের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়টি এখানে উত্থাপন করতে চাই। বাংলাদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। ফলে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা বস্তুত একটি বিলম্বিত ঘটনা। আরো আগেই এ বিষয়ে গভীর ও বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত হওয়া উচিৎ ছিল। সমগ্র উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব এখনো উল্লেখযোগ্য না হলেও, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবার দাবী রাখে।

মনে রাখতে হবে অন্য দেশের, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোর, অন্ধ অনুকরণের সুযোগ আমাদের নেই। আমাদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো, মূল্যবোধ ও প্রত্যাশা, আমাদের ঐতিহ্য, জনশক্তি ও সম্পদের কথা মনে রেখেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যত পরিকল্পনায় মঙ্গল বয়ে আনুক অথবা অমঙ্গল বয়ে আনুক বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবার সূচনা থেকে এখন পর্যন্ত আমরা দেখে আসছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হলেও বাস্তবে সরকারী অনুদান ও সরকারী অধ্যাদেশ অনুসারে চলে। যেমন টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় গুলো ১৯৬১ সালে অধ্যাদেশ অনুসারেই চলছে। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো চলছে ১৯৭৩ এর অধ্যাদেশ অনুসারে। ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮০ সালের অধ্যাদেশ অনুসারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন বাজেটের মোট অর্থ এবং আবর্তক ব্যায়ের শতকারা পঁচানব্বই ভাগের বেশী আসে সরকারী অনুদান থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজে সরকারী হস্তক্ষেপ না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম পরীক্ষা করে দেখার ক্ষমতা রয়েছে সরকারের পরিদর্শন দফা বা ঠরংরঃধঃরড়হ ঈষধঁংব অনুসারে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আয়-ব্যয় ও কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করে সরকারের হয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপরে সরকারের সর্বোপরি প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও, সরকারী অর্থে পরিচালিত হবার ফলে, এর সমস্ত কর্মসূচী এর বিকাশ ও বিস্তার অর্থনির্ভরতার ভিতর দিয়ে পরোক্ষভাবে সরকারের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সামগ্রিক আর্থিক দায়, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিকাশ ও বিস্তারে গুরুভার ও দায়িত্ব একান্তভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত রেখে উচ্চ শিক্ষার সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব কিনা। একটি প্রশ্ন তত্ত্বগতভাবে উত্থাপিত হতে পারে যে, বাজার,.অর্থনীতির প্রভাবরূপে উচ্চ শিক্ষাকেও পণ্য করে তোলা সঙ্গত কি না, যেমন ভাবে সাধারণ ভোগের সামগ্রী বা পণ্যের বাজার,

www.pathagar.com

ক্রেতার ক্রয় ক্ষমতা ও চাহিদা অনুসারে, নির্ধারিত হয় মুক্ত প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে। বিশ্ববিদ্যালয়কে বেসরকারী করার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষা লাভের চাহিদা, দেশের অগ্রগতির জন্য উচ্চ শিক্ষার দীর্ঘ মেয়াদী প্রয়োগ, দক্ষ, সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মনীষা সৃষ্টির যে লক্ষ্য উচ্চ শিক্ষার— তা কি অর্জিত হতে পারবে?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে উচ্চ শিক্ষার অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের অনুধাবন করতে হবে। শিক্ষা অবশ্যই পণ্য নয় সাধারণ অর্থে। কিন্তু পণ্যের কিছু বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে রয়েছে — বিষেস করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায়। যেমন, শিক্ষা ব্যয় বহুল অর্থাৎ শিক্ষার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়, যেমন করতে হয় পণ্য সৃষ্টিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অদৃশ্য পণ্য অর্থাৎ জ্ঞান, সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে, যেমন করে—কল কারখানা ও উৎপাদন যন্ত্র। সুতরাং শিক্ষাকে পণ্য ভাবাটা যতই অশালীন মনে হোক- ততটা অবাস্তব নয়। বস্তুত সাধারণ শিক্ষা ও পণ্যের অনেক বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত। ভাল অর্থনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিজ্ঞ, সাহিত্যিক সবাই উন্নত সমাজ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সৃষ্টিতে দীর্ঘ মেয়াদী ও গভীর অবদান রাখেন। এ ছাড়া পণ্য আমরা ব্যবহার করি উপভোগ্য বস্তুরূপে, আমাদের আনন্দ ও তৃপ্তির জন্যেও। শিক্ষা দুই অর্থেই পণ্য। শিক্ষা সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে এবং সুন্দর ও উপভোগ্য রুচিশীল জীবন সৃষ্টির ভিতর দিয়ে ভোগের সামগ্রী রূপেও কাজ করে। সুতরাং উচ্চ শিক্ষার গুরুত্ব শুধু দার্শনিক দৃষ্টিতে যাচাই না করে, কট্টর অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতেও বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

সাধারণ পণ্য ও শিক্ষার মধ্যে অবশ্য একটি পার্থক্য আমাদের গভীরভাবে দেখার আছে। একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি, একজন গৃহহীন মানুষ বা একজন চিকিৎসা প্রার্থী রোগী টাকা না থাকার কারণে, খাবার, গৃহ বা ঔষধ থেকে বঞ্চিত হয় যেমন, একজন মেধাবী সম্ভাবনাময় ছাত্রও কি তেমনি উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে অর্থের অভাবে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় চালু হবার ফলে? একজন ক্ষুধার্ত মানুষ বা রোগাক্রান্ত রোগী খাবার বা চিকিৎসার অভাবে মারা গেলে শুধু সেই ক্ষতিগ্রস্থ হয় বা বড়জোর তার পরিবার। কিন্তু একটি মেধাবী, সম্ভাবনাময় প্রতিভা যদি উচ্চ শিক্ষার অভাবে তার প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে ব্যর্থ হয়, তা হলে সে ক্ষতি সমগ্র জাতির। বস্তুত সারা পৃথিবীতে, এবং বিশেষ করে আমাদের দেশে, বহু প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিভাবা মনীষী উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন, কারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মূলত চলে আসছে সরকারী খরচে।

আমাদের ন্যায় দরিদ্র দেশেও বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে বিশাল সব ক্যাম্পাসে ব্যাপক আয়োজনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে বিপুল অর্থ জনসাধারণের কাছ থেকে সংগ্রহ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়েছে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তা কি সম্ভব হবে? বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় যারা স্থাপন করবেন তারা কি উচ্চ শিক্ষার দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব দূরদৃষ্টি নিয়ে অনুধাবন করবেন?

ব্যক্তি মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত বলে এবং তার আপন জীবনেই তার সাফল্য তিনি দেখে যেতে চান বলে, তার পক্ষে দূর ভবিষ্যতকে দেখা সহজ নয়। কিন্তু জাতীয় জীবন অনেক দীর্ঘ, ফলে জাতীয় স্বার্থে যত দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ও বিনিয়োগ সম্ভব হয়ে ওঠে, ব্যক্তি মালিকানায় তা সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যেহেতু ব্যয়বহুল

www.pathagar.com

এবং এর ফসল পেতে দীর্ঘ সময় লাগে, অনেক সময় কয়েক দশক। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় সেই দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ও অর্থ বিনিয়োগ কি সম্ভব হবে? এসব প্রশ্নের যথার্থ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ কি তা আমরা বুঝতে পারবো বলে মনে হয়।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে যেমন অনেক সমস্যা আছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আদর্শগত, তেমনি কিছু সম্ভাবনাও আছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা একটি বিশেষ শিক্ষাদর্শণ ও শিক্ষা সম্পর্কিত বাঁধাধরা আদর্শবাদকে লালন করে আসছি। এটা ভাবতে ভাল লাগে যে, একটি আদর্শ, দক্ষ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে নির্ভূল পরিকল্পনা সৃষ্টি করে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে, আমাদের সমস্ত সম্ভাবনাময় তরুণ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের সুযোগ নিশ্চিত করে, তাদের অভিভাবকদের আর্থিক সামর্থ্য ও অসামর্থ্য নির্বিশেষে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটছে না। কেন ঘটছে না সে বিশ্লেষণে যাবার অবকাশ নেই এখানে।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে সংখ্যক ছাত্র এখন ভর্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আবেদন করে যোগ্যতা নিয়ে, তার বড়জোর দশ ভাগের একভাগ মাত্র ভর্তি হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাকী বিপুল সংখ্যক ছাত্র প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে শুধু বেকার থাকছে তাইনা, যথার্থ শিক্ষা লাভের অভাবে চাকরী প্রাপ্তির, যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। এদের মধ্যে অনেক, পরিসংখ্যান নির্ধারণ করা না গেলেও এদের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের মত। যে বিপুল অর্থ ও মেধা এর ফলে বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে তার দ্রুত সমাধান হল বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের যে ব্যয় তা আসতে পারে আংশিকভাবে দেশের সম্পদশালী সচেতন শিক্ষাপ্রিয় নাগরিকদের কাছ থেকে এবং আংশিকভাবে সরকারের কাছ থেকে। অভিভাবক অর্থ বিনিয়োগ করবেন, কারণ বিদেশ পাঠাবার তুলনায় অল্প খরচে দেশে আপন সন্তানদের শিক্ষা লাভ তিনি নিশ্চিত করতে পারবেন। সম্পদশালীরা অর্থ বিনিয়োগ করবেন, কারণ যথার্থ উচ্চ শিক্ষায় অর্থ বিনিয়োগ, শেষ বিশ্লেষণে, যে কোন শিল্প বিনিয়োগের তুলনায় বেশী সুফলপ্রদ। সরকার অর্থ বিনিয়োগ করবে, কারণ প্রথমত সরকারেরই দায়িত্ব ছিল উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে শুধু অর্থ ও বস্তুগত সম্পদই আবশ্যকীয় নয়, এ জন্য যথাযোগ্য শিক্ষক, গবেষক ও মননশীল বিশেষজ্ঞ অপরিহার্য। আমাদের দেশে যেমন বিপুল সংখ্যক সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থী শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি বিপুল সংখ্যক উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী রয়েছেন, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের যোগ্য ও আগ্রহী হয়েও সেই সুযোগ পাচ্ছেন না। এদের মধ্যে রয়েছেন যাঁরা চাকরী পাননি, কিংবা যারা অন্য পেশাকে বেছে নিলেও খণ্ডকালনি শিক্ষক রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের আগ্রহী ও যোগ্য।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে বেশি সাহায্য নিতে পারে সেই সব উচ্চ শিক্ষিত, যোগ্য, জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের থেকে, যারা কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণাগার থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন অথচ এখনো সুস্থ ও কর্মশক্তিপূর্ণ।

www.pathagar.com

সরকারী নিয়ম ও কাঠামোগত জড়তা থেকে মুক্ত হয়ে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনেক মুক্ত ও গতিশীলভাবে শিক্ষার পাঠ্যসূচী ও গবেষণার বিষয় নির্বাচন করতে পারে। ফলে শিক্ষাকে দেশের ও সমকালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় যেন বেসরকারী শিল্প কারখানার মত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হয়ে না উঠে। শিক্ষার মানকে জলাঞ্জলী দিয়ে সার্টিফিকেট বিক্রির আখড়া না হয়ে যায়। মেধাবী সম্ভাবনাময় তরুণরা যাতে অর্থাভাবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য সুদহীন দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ ও বৃত্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিশেষ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো এই বৃত্তি বা ঋণ দেবার ব্যবস্থা নিতে পারে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যাতে দেশ ও জাতির মূল্যবোধ , চেতনা, অধিকার ও উন্নয়ন সম্ভাবনাকে অবদমিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক মান ক্ষুণ্ন না করে, সে জন্যে ব্যাপক ভিত্তক উপদেষ্টামন্ডলী অবশ্যই থাকতে হবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। এরা অবশ্য নির্বাচিত হবেন দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এবং বিশ্ববিদ্যলয় গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মুক্তবুদ্ধির সমস্ত সুযোগগুলো গ্রহণ করবে এবং সেই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক জড়তা ও জটিলতাকে অতিক্রম করবে।

সরকারী অর্থে পরিচালিত বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় বিকল্পরূপে নয়, পরিপূরকরূপে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কাজ করতে পারে। এতে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর রাজনৈতিক প্রভাব এতে দূর হবে, সেই সঙ্গে সন্ত্রাসও, এমনটি প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কতটা সুফল বয়ে আনবে? কতটা সাফল্যের সঙ্গে সমস্যাগুলো ভবিষ্যতে কাটিয়ে উঠবে এবং এর সম্ভাবনাগুলো সার্থকতার সঙ্গে পূর্ণ বাস্তবায়িত করতে সফল হবে? তা নির্ভর করছে ভবিষ্যতে কতটা দায়িত্ব ও আন্তরিকতা নিয়ে বেসরকারী উচ্চ শিক্ষার উদ্যোক্তাগণ কাজ করবেন তার উপরে।

সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে ভবিষ্যতের বেসরকারী উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলোর তুলনা যথার্থভাবে করা সম্ভব নয়। কারণ, সরকার পরিবর্তন হয় এবং উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত সরকারী পরিকল্পনা ও বিনিয়োগও বদলে যায়। আগামী দিনগুলোর কথা যদি আমরা ভাবি তা হলে অনেকগুলো সম্ভাব্য তুলনা দেখা দিতে পারে। একটি দক্ষ ও উচ্চ শিক্ষার প্রতি দায়িত্বশীল ও আগ্রহী সরকার যদি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে, তার সঙ্গে তুলনায় আসতে পারে দক্ষ ও সার্থক বেসরকারী উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাপনা। অথবা অদক্ষ ও দায়িত্বহীন বেসরকারী ব্যবস্থাপনাতে তেমনি একটি অদক্ষ এবং উচ্চ শিক্ষার প্রতি অযত্নশীল ও দায়িত্বহীন সরকার যদি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে, ব্যয় সঙ্কোচন ও দলীয় প্রভাব দ্বারা, সে ক্ষেত্রেও তুলনা আসতে পারে দক্ষতার সঙ্গে অথবা অদক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত বেসরকারী উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রের। আমরা আশা করবো আগামীতে দুই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ই পরিচালিত হবে দক্ষতার সঙ্গে এবং একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা ও পরিপূরকতায় উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়ন ও প্রসারে যা সহায়তা করবে।

www.pathagar.com

সেশন জট যান্ত্রিক উপমার আলোকে

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নানা সঙ্কটের মধ্যে যেটি অত্যন্ত সাম্প্রতিক এবং বহুল আলোচিত তা হল, সেশন জট। কেউ কেউ একে বলছেন সেশন জ্যাম। এই শব্দ চয়নের মধ্যেই একটি সাদৃশ্য টানা হয়েছে, ব্যস্ত রাস্তায় অসংখ্য গাড়ি বিশৃঙ্খলভাবে আটকে যাওয়ার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আটকে যাওয়ার। যদি যান্ত্রিকভাবে অর্থাৎ আপাতদৃষ্টিতে সেশন জটের কারণ আমরা বুঝতে চাই, তা হলে রাস্তায় গাড়ি আটকে যাওয়ার সঙ্গে জটের তুলনাটি আরো একটু গভীরে নিয়ে যেতে পারি।

গাড়ি রাস্তায় আটকে যায় কেন? যদি চলার পথটি হয় অপ্রশস্ত গাড়ির সংখ্যার তুলনায়, রাস্তা তৈরি হয়ে থাকে পরিকল্পনাহীনভাবে অথবা ভুল পরিকল্পনায়, রাস্তায় গাড়ি চালাবার সুশৃঙ্খল নিয়ম যদি আরোপিত না হয় চালকদের উপরে, কিছু কিছু গাড়ি যদি রাস্তায় নামার অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও রাস্তায় চলার অনুমতি পায়, রাস্তায় যদি হট্টগোল বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে কেউ, রাস্তায় চলতে গিয়ে চালক যদি উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়েন অথবা হঠাৎ করে একটি রাস্তা যদি সামনে বন্ধ হয়ে যায়– আমরা জানি রাস্তায় গাড়ির গতি রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ঘটনাটি ওখানেই শেষ হয়ে যায় না, চালক তার ধৈর্য্য হারায়। ক্রমাগত রাস্তায় চলার নিয়ম বেশি করে বিঘ্নিত হতে থাকে এবং বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে থাকে দ্রুত। বস্তুত বিশৃঙ্খলাই যখন নতুন করে বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে পড়ে তখন ঘটে বিপর্যয়।

পদার্থ বিদ্যার ভাষায় একে ক্রান্তিক ঘটনা বা Critical phenomena বলতে পারি। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সেশন জট যে সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে, তা একটি ভয়াবহ রূপ নিতে পারে সমস্যার গুণগত পরিবর্তন এনে। তখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শুধু শিক্ষা হারাবে না বরং সারা শিক্ষা ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়তে পারে।

আমি আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে টানতে পারি। নদীতে পানির স্রোত যেখানে সুড়ঙ্গের মধ্যে বাতাসের স্রোতে অনিয়ত প্রবাহ বা Turbulent সৃষ্টি করে তার সঙ্গে সেশন জটের মিল আছে। একটি নদী বা সুড়ঙ্গ যে পরিমাণ পানি বহন করতে পারে বা যে পরিমাণ চাপ বা বিভব পার্থক্যে স্বাভাবিক প্রবাহকে ধারণ করতে পারে, তার চাইতে বেশি পরিমাণ চাপ সৃষ্টি হলেই অনিয়ত প্রবাহ সৃষ্টি হয়। অবশ্য কি পরিমাণ পানি

www.pathagar.com

একটি নদী বা নল দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে একক সময়ে তা নির্ধারিত পানির সঙ্গে এর ধারকের তলের ঘর্ষণ এবং সেই সঙ্গে পানির অণুদের মধ্যে পারস্পরিক ঘর্ষণ বা সান্দ্রতার দ্বারা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একটি নদীর প্রবাহের বা রাস্তায় গাড়ি চলার এই সাদৃশ্য বা তুলনা থেকে আমাদের সমস্যার স্বরূপ বুঝতে একটু সুবিধা হবে বলে মনে করি এবং সেই সঙ্গে সমস্যার সমাধানের পথ অনুসন্ধানও। এ কথা আগেই বলে রাখতে চাই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে যান্ত্রিক কোন ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা সঙ্গত নয়। কারণ, শিক্ষার ব্যাপারটি অনেক বেশি জটিল ও সূক্ষ্ম। কিন্তু এই ত্রুটিটুকু মেনে নিয়েও একটি সুবিধার দিক আমরা চিন্তা করতে পারি। তা হল, শিক্ষা প্রদান একটি সামাজিক কর্মকাণ্ড রূপে সামাজিক নানা মূল্যবোধ, সংস্কার এবং সেই সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক ও মানবিক নানা ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত। ফলে, নৈর্ব্যক্তিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষা সমস্যার বিশ্লেষণ দুঃসাধ্য হয়ে উঠে। প্রকৃতিবিজ্ঞান যে সমাজ বিজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশি সুনির্দিষ্ট ও প্রমাণসাধ্য নিয়ম বা সূত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম সেটাও এই জন্যে যে, প্রকৃতি বিজ্ঞানে মডেল সৃষ্টি ও বিমূর্ত তত্ত্বের উদ্ভাবন অনেক সহজ। আমরা যদি সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার একটি যান্ত্রিক মডেল তৈরি করি সেটা মডেল হিসাবে অযথার্থ হবে ঠিকই, কিন্তু সেই অনুপাতে সমাধান যোগ্যতা অর্জন করবে। সেশন জটের যে অংশটুকু যান্ত্রিক কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অর্থাৎ শিক্ষার গভীর তত্ত্ব ও দর্শনে না গিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থাপনা বদলিয়ে সমাধান করা সম্ভব, তা আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি — আমাদের মডেল অর্থাৎ রাস্তায় গাড়ির জ্যাম ও সেশন জটের তুলনা থেকে।

কারণগুলো এবার আরো স্পষ্ট করা যাক। উচ্চ শিক্ষার যে আয়োজন আমাদের দেশে সৃষ্টি হয়েছিল ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে। এমনকি স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত যেটুকু বিস্তার ঘটেছিল নতুন কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করার মাধ্যমে, গত দুই দশকের বেশি সময়ে তার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ আমাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই সঙ্গে উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও, কিন্তু উচু শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়নি।

আমাদের পুরনো উপমাটিকে আবার ব্যবহার করে দেখা যাক এবার। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর স্বভাবতই আমাদের গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু রাস্তাই কি কম বেড়েছে? আমাদের আরো যানবাহনের প্রয়োজন আছে এবং সেই জন্য প্রশস্ততর রাস্তারও। কিন্তু আমাদের উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি আমাদের রাস্তায় গাড়ি চালানোর তুলনায় কম? এবং সেই কারণে আমাদের নতুন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি বা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির? কোন পরিসংখ্যান ব্যবহার না করেও আমরা বলতে পারি আমরা যে পরিমাণে নতুন রাস্তা নির্মাণ করেছি, যা অবশ্যই প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, আমরা উচ্চ শিক্ষার পথকে সে তুলনায় অনেক কম প্রসারিত করেছি।

আমাদের শহরে এখন রাস্তায় রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঠাসা ঠাসি, আর ভীড়ে সৃষ্টি হয় জ্যাম। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও যে তা ঘটবে এটাই স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

কিন্তু আমাদের অসমতল, অমসৃণ ও অবহেলিত রাস্তার চেয়েও অনেক বেশি অবহেলিত আমাদের উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলো। আমাদের ভাঙ্গা পথে চলার অযোগ্য গাড়িগুলোর চেয়েও উচ্চ শিক্ষা লাভের অযোগ্য ছেলে মেয়ে ভিড় করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। আমি তাদের বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্গত যোগ্যতা সম্পর্কে অবমূল্যায়ন করছি না। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা লাভের যে লক্ষ্য, আগ্রহ, অনুপ্রেরণা একজন শিক্ষার্থীকে তদ্‌গত করে জ্ঞানের সাধনায় তা অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের নেই। কারণ যাই হোক না কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য যে জ্ঞান সাধনা ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির যে প্রস্তুতি ও মানসিকতা প্রয়োজন তা খুব সহজলভ্য নয়।

কিন্তু উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে জট আমরা লক্ষ্য করছি তার একটি বড় কারণ অবশ্য এই যে উচ্চ শিক্ষার যে রাজপথ তা আমাদের শিক্ষার্থী বা শিক্ষকদের কোন গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছে না।

উচ্চ শিক্ষার যে মূল লক্ষ্য নতুন জ্ঞান সৃষ্টি, নতুন উদ্ভাবন, নতুন উপলব্ধি ও মূল্যবোধ তা মূল্য প্রাপ্ত নয় আমাদের সমাজে। দার্শনিক ভাবেতো নয়ই–নিছক চাকরী সৃষ্টি ও নিয়োগ সম্ভাবনা সৃষ্টির দ্বারাও নয়। উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য ও উচ্চ শিক্ষার জন্য সামাজিক চাহিদা যদি না থাকে তা হলে শহরের রাজপথটি হঠাৎ বন্ধ করে দিলে যা ঘটে গাড়ি জ্যাম হয়ে যাবার ক্ষেত্রে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও তাই ঘটছে।

কিন্তু শুধু ছাত্রের চাপ বৃদ্ধি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতাই কারণ নয় সেশন জটের। এদেশের সমস্ত রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান, রাজনৈতিক শক্তি প্রয়োগ এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সংগ্রামে ছাত্র সমাজ ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু ব্যবহৃত হয়নি, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ই হচ্ছে এক মাত্র এলাকা যেখানে শিক্ষা ও তারুণ্য অত্যন্ত ঘনিভূতভাবে অবস্থান করছে, সমস্ত প্রতিবাদের ও সংগ্রামের কেন্দ্রবিন্দু রূপে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কাজ করছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে রাজনৈতিক শক্তি ও অস্ত্রের শক্তি। শিক্ষার জন্য যে সুস্থ পরিবেশ প্রয়োজন তা সৃষ্টি করতে অবশ্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে সাজাতে হবে।

যে পুরনো ধারণা ও পরিবেশে উচ্চ শিক্ষার আয়োজন ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ নতুন করে হয়তো সাজাতে হবে। নিছক পরীক্ষা নির্ভর, সার্টিফিকেট নির্ভর শিক্ষা নয়–শিক্ষার লক্ষ্যকে আরো প্রসারিত ও গভীর করেই মাত্র ছাত্র ও শিক্ষকের সেই সম্পর্ক সৃষ্টি হতে পার, যেখানে যান্ত্রিকতাকে আমরা অতিক্রম করতে পারি।

শিক্ষাকে জীবনের দীর্ঘতর সময়ের মধ্যে বিস্তারিত করলে, পরীক্ষার ফল দ্বারা নয়, জ্ঞানের সত্যিকার অর্জনের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্য যাচাই হতে পারে। তখন সেশন জটের সমস্যাটি ভিন্ন রূপ নেবে। অর্থাৎ পরিমাণগত পরিবর্তন নয় গুণগত পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে ঐ সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে।

www.pathagar.com

পরীক্ষা ব্যবস্থা

প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, এই প্রবন্ধের শিরোনাম যতটা ব্যাপক এবং যতটা প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত বহন করে, মূল প্রবন্ধ সে তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত হবে পরিসরে, এবং সীমিত, আলোচনার বিষয় নির্বাচনে। এর সবটাই সময়ের অপ্রতুলতা এবং প্রবন্ধকারের অক্ষমতার জন্যে নয়। অন্তত সে জন্যেই নয়। বরং এ জন্যেও যে, সেই প্রচেষ্টা, প্রবন্ধকারের মতে, এই মুহূর্তে অতটা আবশ্যকীয় নয় এবং সংগতও নয়। বিশেষ করে ১৯৮৬ তে জাতীয় ভিত্তিক পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির পেশকৃত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে। উল্লিখিত কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রফেসর মুহাম্মদ শামসউল হক এবং সদস্য ছিলেন বিরাট সংখ্যক উল্লেখযোগ্য শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ।

বিভিন্ন অগ্রসর ও উন্নয়নশীল দেশের পরীক্ষা পদ্ধতির পর্যালোচনা, পরীক্ষা পদ্ধতির তত্ত্বগত দিক বিবেচনা, পূর্বের নানা কমিটি ও কমিশনের পরীক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ পরীক্ষা করে দেখা, পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের মতামত যাচাই এবং সবকিছুর ভিত্তিতে একটি সমন্বিত সুপারিশমালা প্রণয়ন, এমন একটি ব্যাপক কর্মকাণ্ড, যার পটভূমিতে পরীক্ষাব্যবস্থা ও এর উন্নয়ন সম্পর্কে কথা বলা দুঃসাধ্য শুধু নয়, দুঃসাহসিকতাও। এবং সেটা একাধিক কারণে। পুনরাবৃত্তির আশ্রয় না নিয়ে নতুন কিছু বলা এক্ষেত্রে যতটা দুঃসাধ্য, এতে গুণীজনের দ্বারা এত বড় আয়োজনে সম্পন্ন প্রতিবেদনের বাইরে কিছু বলা ততটাই বিপজ্জনক।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে একটি অনুকূল যুক্তিও আছে এই দুঃসাহসিক কাজে অবতীর্ণ হবার পক্ষে। তা হল, যে অভিমত সহজেই গ্রহণীয় হবে না নির্বিচারে, সে অভিমত সহজে কোন ক্ষতিও করতে পারে না সমাজের । বস্তুত কোন বক্তব্য বা অভিমত অগ্রাহ্য হবার সম্ভাবনা যত বেশি, তত বেশি স্বাধীনতা নিয়ে, শঙ্কাহীনভাবে তা প্রকাশ করা যায়। এই প্রবন্ধে আমার ব্যক্তিগত মত প্রকাশের ক্ষেত্রে অরক্ষণশীলতা যদি সীমা ছাড়িয়ে যায় কখনো, ঔদ্ধত্য বিবেচনা না করে ক্ষুদ্রতরের অধিক স্বাধীনতা বলে বিবেচনা করাই সঙ্গত হবে।

শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনার সঙ্গে পরীক্ষা পদ্ধতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একথা আমরা শুনেছি। কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে পরীক্ষার জড়িত বা সম্পর্কিত হবার

www.pathagar.com

প্রক্রিয়াটিও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বস্তুত এই সম্পর্ক পারস্পরিক। শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষার প্রকৃতি ও লক্ষ্যের সঙ্গে পরীক্ষা অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর যাচাই পদ্ধতি অবশ্যই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। যা পরিমাপ করছি এবং যার সাহায্যে, যে ভাবে তা পরিমাপ করছি, উভয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক অবশ্যই থাকতে হবে। মাহাকর্ষ মাপার জন্য চাই ভর, কিন্তু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র মাপতে টেষ্ট-চার্জ চাই। জ্ঞানের বা শিক্ষার প্রকৃতির দ্বারা এর পরিমাপের পদ্ধতি এভাবে প্রভাবিত বা নির্বাচিত হবার ব্যাপারটি অত জটিল নয়, যেমন জটিল এর বিপরীত সম্পর্কটি। অর্থাৎ পরীক্ষা পদ্ধতি যেখানে শিক্ষার প্রকৃতি ও ধারাকে বদলে দেয়, সেখানে এই ব্যাপারটি ঘটে আমাদের ইচ্ছা, আমাদের পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এক্ষেত্রে পরীক্ষা ব্যবস্থা জ্ঞান বা মেধার পরিমাপক রূপে কাজ করছে না, বরং শিক্ষার নিয়ন্ত্রক রূপে কাজ করছে।

অবশ্য পরীক্ষা-ভীতি, পরীক্ষার ফলের প্রতি শিক্ষার্থীর প্রদত্ত গুরুত্ব ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক যদি জানা থাকে, সেই সম্পর্ক ব্যবহার করে পরীক্ষাকে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার রূপে কাজে লাগাতে পারি। কিন্তু সেখানে দুটো আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। প্রথমত পরীক্ষা শব্দটির অভিধাকে আমরা বদলে দিচ্ছি। দ্বিতীয়ত ভীতি প্রদর্শনের কাজে পরীক্ষাকে ব্যবহার করার মধ্যে একটি অসততা আছে— পদ্ধতিগত ও উদ্দেশ্যগত। একথাটি এখানে উল্লেখ্য যে, পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির প্রতিবেদনে পরীক্ষা পদ্ধতির নানান ত্রুটি বিশ্লেষণ ও নানা পরিবর্তনের সুপারিশ থাকলেও শিক্ষার উপরে পরীক্ষা নামক প্রতিভাসটির যে সুক্ষ্ম, পরোক্ষ ও সুদূর প্রসারী প্রভাব আছে তার বিশ্লেষণ নেই।

অনেক শিক্ষাবিদ অবশ্য পরীক্ষাকে মূল শিক্ষার বহির্ভূত একটি যান্ত্রিকতারূপে গণ্য করেছেন এবং পরীক্ষা সম্পর্কে যতটা সম্ভব উদাসীন থাকতে সচেষ্ট হয়েছেন। ব্যাপক আয়োজনে বহিঃপরীক্ষা গ্রহণের তাণ্ডব প্রভাব সম্পর্কে ১৯৮২ সালে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন মন্তব্য করে যে, এই ব্যবস্থা ছাত্র এবং শিক্ষকের কাছে পরীক্ষাকে প্রধান চিন্তার বিষয়ে পরিণত করেছে। রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছিলেন ঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেন একজামিন পাসের কুস্তির আখড়া হয়ে না উঠে।

একথা অবশ্যই সত্য যে, শিক্ষা যেমন নিজস্ব দাবীতে প্রতিষ্ঠিত, পরীক্ষা তা নয়। শিক্ষার বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের কথা বাদ দিলেও, শুধু শিক্ষার জন্য শিক্ষা এ কথা আমরা ভাবতে পারি। কিন্তু পরীক্ষা নিতে হলে এর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও সার্থকতা থাকতে হবে, নতুবা শুধু ছাত্রদের নাজেহাল করার একটি অস্ত্র হিসাবে পরীক্ষা যন্ত্রটিকে পরীক্ষকদের হাতে তুলে দেবার কোন যথার্থতা থাকতে পারে না।

প্লেটো তার রিপাবলিকে পরীক্ষা নেবার যৌক্তিকতা বহু আগেই ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁর কালের মূল্যবোধে। তাঁর কথায়, "আমাদের অবশ্যই সবচাইতে উপযুক্ত প্রতিনিধি বাছাই করে নিতে হবে...। তাঁদের গুণাগুণ বিচার করার জন্য তাঁদেরকে বিভিন্ন বাধা, পরিশ্রম ও কষ্টের ভিতর দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। চুল্লীতে সোনা যাচাই করার চাইতে কঠিন পরীক্ষায় তাঁদের ফেলতে হবে। এসব পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হয়ে আসবে তাঁরাই শুধু সর্বসাধারণের ও নিজের মঙ্গল করতে সক্ষম হবে"। প্লেটোর বক্তব্যে এটাই

www.pathagar.com

প্রতীয়মান হয় যে, সমাজ ও ব্যক্তি কল্যাণের জন্য এমন শিক্ষা চালু হওয়া উচিত যার মধ্য সমাজের বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি সম্ভব হয়। বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি ও বাছাই এই দুই কাজই শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গীভূত। শিক্ষালাভের ক্ষমতার মধ্যে শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মক্ষমতা ও চারিত্র্য পরিলক্ষিত হবার কথা। সুতরাং শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে বাছাই করার কাজটিও অন্তর্ভূক্ত।

খৃষ্টপূর্ব প্লেটোর যুগ থেকে আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা ও চিন্তাধারায় অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। ফলে, শিক্ষাব্যবস্থা ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে প্লেটোর ধারণার সঙ্গে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ না মিলবারই কথা। প্লেটো শুধু প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞদের শিক্ষিত করে তোলা ও বাছাই করে নেবার প্রয়োজনে পরীক্ষার কথা বিশেষভাবে বলেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের শিক্ষা সম্পর্কে তেমন গুরুত্ব প্রকাশ করেন নি। আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন ও শিক্ষা লাভের দাবি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, শিক্ষা বলতে সমগ্র জনগণের শিক্ষা কথাই এখন বোঝায়। গণতান্ত্রিক চেতনাবোধের পটভূমিতে বিংশ শতাব্দীর শিক্ষাব্যবস্থায় ভীষণ জটিলতা ও গভীর পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। এই পরিবর্তন কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়। সমাজের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ এই পরিবর্তনের ধারাকে অনিবার্য করে তুলেছে।

শিল্প বিপ্লবের আগে দেশের অর্থনীতির সঙ্গে শিক্ষার বিশেষ যোগসূত্র স্পষ্টভাবে কারো চোখে ধরা পড়তো না, এবং কারিগরি শিক্ষায় বিপুল সংখ্যক নাগরিককে শিক্ষিত করে তোলার অর্থকরী প্রয়োজনও তখন দেখা দেয়নি। ফলে, ব্যক্তিগত উৎসাহ ও কৌতুহল নিয়ে তখনকার দিনের অল্প সংখ্যক লোক শুধু বিজ্ঞান শিক্ষা লাভে ব্রতী হতো। তখন বিজ্ঞান, কারিগরিবিদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যার এমন বিপুল বিকাশ ঘটেনি এবং জটিলতাও এত ব্যাপক ছিল না। ফলে, বিজ্ঞান চর্চা আজকের মত ব্যয়বহুল ছিল না।

প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সমস্ত অর্থ সঞ্চিত ছিল বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত না হয়ে ব্যক্তি বিশেষের দানছত্রের উপরে নির্ভরশীল ছিল। এর ফলে শিক্ষা একটি সামাজিক ব্যাপার না হয়ে অনেকটা সৌখিনতা হিসাবে পরিগণিত হতো। সমাজের এক শ্রেণীর লোক সাধারণত উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ পেত। খুব এক নগণ্য সংখ্যক গরীব মেধাবী সন্তান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অধিকার পেত, কিন্তু শিক্ষা ও মেধার প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে সামাজিক স্তর বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটতো না। ফলে সমাজের স্তরগুলো ছিল বংশনির্ভর ও স্থিতিশীল। বিভিন্ন পেশাদার শ্রেণী যেমন কৃষক, ছুতার, কর্মকার তন্তুবায়—এরা বংশ পরম্পরায় তাদের পেশা চালিয়ে যেত। হাতে কলমে নিজ নিজ গৃহে এরা শিক্ষা লাভ করতো, একটি বিধিবদ্ধ বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের প্রয়োজনবোধ করতো না। কোন প্রতিযোগিতার প্রশ্ন উঠতো না।

বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা ব্যক্তি বিশেষের কৌতূহল বা অনুসন্ধিৎসার ব্যাপার মাত্র নয়। এটি আর এক রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদ থেকে উদ্ভূত।

www.pathagar.com

প্রকৃতি বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিদ্যা, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান— এসব জটিল বিষয়েও বিপুল সংখ্যক মানুষকে শিক্ষিত করে তোলা আর এক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সমগ্র জনসংখ্যা থেকে প্রতিস্তরে মেধা ও প্রবণতার ভিত্তিতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বাছাই করে তাদের যথার্থ শিক্ষায় প্রস্তুত করার গুরুভার শিক্ষা প্রতিষ্ঠাগুলোর উপরে অর্পিত। জাতীয় উন্নতি দ্রুততম গতিতে এগিয়ে নেবার প্রয়োজনে এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এক মারাত্মক পরীক্ষার সম্মুখীন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হলে শিক্ষাক্ষেত্রে দুটো দায়িত্ব সমান নিপুণতার সঙ্গে পালিত হওয়া প্রয়োজন— শিক্ষা প্রদান ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে যথার্থ শিক্ষার মাধ্যমে তার যোগ্য কাজের দায়িত্বে নিয়োগ করা। দ্বিতীয় দায়িত্বটি সুষ্ঠু পরীক্ষা পদ্ধতির দ্বারাই শুধু সম্ভব। পরীক্ষা ব্যবস্থা তাই অল্প সংখ্যক বিশেষজ্ঞ ও প্রতিনিধি বাছাই করার কাজে নিয়োজিত নয়। এর লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই প্রকৃত মূল্যায়নের মাধ্যমে সমাজের বিশিষ্ট কাজে নিয়োজিত করা, — তাদের যোগ্যতার মান নিশ্চিত করার ভিতর দিয়ে।

প্রগতিশীল প্রতিটি সমাজ এক গতিশীলতার মধ্যে এর ভারসাম্য রক্ষা করছে। প্রতিদিন নতুন সমস্যা নতুন প্রতিকুলতা ও বাধার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নতুন সমাধান, নতুন আবিষ্কার ও নতুন সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে নিত্য সংগ্রামে বিজয়ী হবার অস্ত্র হিসাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে উপযুক্ত ও সার্বিক করে তোলা তাই অপরিহার্য। সামাজিক প্রয়োজনের বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মেধা ও প্রবণতার পার্থক্যের কারণে সবাইকে একই শিক্ষা প্রদান সম্ভব নয়। সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থায় এই বৈচিত্র্যকে সমাজ ও ব্যক্তির কল্যাণে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বৈচিত্র্যকে বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত করে কোন এক শ্রেণী যেন অন্য এক শ্রেণীর উপরে শোষণ চালাতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সবাইকে সমান সুযোগ প্রদান এবং মেধা ও প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিন্যস্ত করা। সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থাই শুধু সমাজে সেই গতিশীলতা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সেই সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থা কি? — তা নির্ধারণের জন্য পরীক্ষা সম্পর্কে কিছুটা তত্ত্বকথার অবতারণা প্রয়োজন।

সাধারণভাবে যেসব লক্ষ্য পরীক্ষার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব তা হলোঃ শিক্ষা লাভের মান বিচার ও তার মাধ্যমে শিক্ষার মান বজায় রাখা। পরীক্ষার্থীদের শিক্ষা লাভের ক্ষমতা যাচাই করা। বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি প্রবণতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে বা শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে মেধা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে স্তর বাছাই করা। নতুন চিন্তা ও সৃজনশীল প্রতিভা যাদের আছে তাদের অনুসন্ধান করা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃজন করা। শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা করতে বাধ্য করার জন্য পরীক্ষাকে একটি ভীতি প্রদর্শনী অস্ত্র অথবা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ সৃষ্টির কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা। পরীক্ষায় ছাত্রদের সাফল্যের ভিত্তিতে শিক্ষকতার মান ও সাফল্য যাচাই করা। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগে স্থান সংকুলান না হওয়ায় একটি কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র সংখ্যার চাপের মোকাবিলা করা। শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতি ও সমাজের ক্ষমতা সম্পন্ন শ্রেণীর প্রভাব যাতে সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি সুবিচার ও গণতান্ত্রিক অধিকার বিনষ্ট করতে না

www.pathagar.com

পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য পরীক্ষাকে একটি প্রশাসনিক কৌশল হিসাবে ব্যবহার করা।

উপরে উল্লিখিত কর্মিক বা ফাংশনাল যে বৈশিষ্ট্য পরীক্ষার, তার প্রয়োগ দক্ষতর করার নানা চেষ্টা চলছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন বলতে পরীক্ষা ব্যবস্থার এই কর্মিক দক্ষতা বৃদ্ধিকেই বুঝানো হয়ে থাকে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি যান্ত্রিকতা আছে। পরীক্ষা ব্যবস্থায় এই যান্ত্রিক বা কৌশলগত দক্ষতা প্রশাসনিক উন্নয়ন ও আনুষ্ঠানিক কর্মসূচির মাধ্যমে বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত যে ত্রুটি, তার তত্ত্বগত ও দার্শনিক অসামঞ্জস্যের বিশ্লেষণ ছাড়া মূল সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে যে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সম্ভব তার সবটাই মঙ্গল কর নাও হতে পারে। অন্তর্নিহিত ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর প্রভাব রাখতে পারে শিক্ষা ক্ষেত্রে ও সামাজিক বিকাশে। আর পরীক্ষা ব্যবস্থা থেকে নেতিবাচক ও যান্ত্রিক উপাদানগুলো কমিয়ে এনে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও কার্যকর পদ্ধতিরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষানীতি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শিল্পায়ন, যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মসংস্থান, সব কিছুর মূলে কাজ করতে পারে একটি সুষ্ঠু পরীক্ষা কাঠামো। পরীক্ষা সে ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের হাতে তুলে দেয়া অস্ত্র নয়। শিক্ষার্থীদের জন্যেও নিজের যোগ্যতা যাচাইয়ের একটি সুযোগরূপে কাজ করতে পারে।

আকাঙ্ক্ষিত সেই সুষ্ঠু পরীক্ষা ব্যবস্থা যান্ত্রিকভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, প্রশাসনিক কয়েকটি পদক্ষেপের মাধ্যমে। অথবা যান্ত্রিকভাবে একটি চমৎকার ব্যবস্থাপত্র উদ্ভাবিত হবার নয়, পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নযনকল্পে। বরং সমগ্র ব্যাপারটি জৈব অভিব্যক্তি বা সজীব বিকাশের মতন ঘটতে হবে। উপরের বক্তব্যকে স্পষ্ট করার লক্ষ্যে পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির কয়েকটি উৎকণ্ঠার দিক এবং আনুষঙ্গিক সুপারিশ কিছুটা বিশ্লেষণ করা যাক।

নকল প্রবণতা দূর করার জন্য প্রতিনিধি সম্মেলনের নানা রকম সুপারিশের মধ্যে রয়েছে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা সীমিতকরণ, পরীক্ষা কেন্দ্রের স্থানীয় প্রশাসনের সক্রিয় ও অতি কঠোর তত্ত্বাবধান ইত্যাদি। মনে করা যাক, এসব ব্যবস্থা নিয়ে নকল বন্ধ করা গেল, কিন্তু তাতে নকল প্রবণতার যে মূল ক্ষতিকর প্রভাব শিক্ষার উপরে, তা কি দূর হবে? নিশ্চয়ই নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়- যে মুখস্ত করে এবং যে নকল করে তারা দুজনেই এক গোত্রের। প্রথম জন প্রাচীন পন্থী, সে কষ্ট করে নকলটা মাথার মধ্যে ধারাণ করে রাখে। দ্বিতীয় জন অন্তত আধুনিক, সে ছাপাখানার সাহায্য নিয়েছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, পরীক্ষা ব্যবস্থায় মূল ত্রুটি হল— সৃজনশীলতা ও মৌলিকতা যাচাই করার কোন ব্যবস্থা আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতিতে নেই।

নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা প্রবর্তন করে নকল প্রবণতা হ্রাস এবং পরীক্ষার ফলের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির যে সমাধান সুপারিশ রয়েছে, সেটিও বিশ্লেষণ করে দেখতে চাই এখানে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষার ফলকে পরীক্ষক নিরপেক্ষ করে তোলা। অর্থাৎ প্রশ্নটি এমন হবে যার উত্তর বিচার করতে পরীক্ষকের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা এবং অনির্বচনীয় ব্যক্তিত্বের অনন্য বৈশিষ্টগুলো যেন ক্রিয়াশীল

www.pathagar.com

না হয়, প্রশ্নের জবাব যাচাই করতে। প্রশ্ন ও জবাবের এই নৈর্ব্যক্তিকতার শর্ত স্বভাবতই পরীক্ষার্থীর সৃজনশীলতাকে পরীক্ষণ অযোগ্য করবে। কারণ, একটি সৃষ্টিশীল মনের যে গভীর, জটিল ও বিচিত্র প্রতিচ্ছবি তা ধারণ করতে ও উপলব্ধি করতে আর একটি গভীর ও সৃজনশীল মন চাই। মনের সঙ্গে মনেরই শুধু মিথস্ক্রিয়া ঘটতে পারে। সৃজনশীলতাকে সৃজনশীলতা দিয়ে পরিমাপের যে অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা তাকে অস্বীকার করলে বা বর্জন করতে চাইলে সৃজনশীলতাকেও অস্বীকার করতে হবে।

নৈর্ব্যক্তিক সংক্ষিপ্ত জবাব স্বভাবতই যান্ত্রিকভাবে যাচাই করা যায়। আর সে জন্যেই কম্পিউটার ব্যবহার করেও প্রশ্নের জবাব যাচাই এখানে সম্ভব। বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য কম, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে। কিন্তু যা পৌনঃপুনিক তাই সত্য নয়। বরং একটি অনিশ্চয়তার বিধি যেমন কোয়ান্টাম তত্ত্বে কাজ করে, কোন কণিকায় অবস্থান ও ভরবেগ একই সঙ্গে নির্ধারণ করতে গেলে,পরীক্ষার মাধ্যমে কোন শিক্ষার্থীর সত্যিকার প্রতিভা বা মেধা যাচাইয়েও তেমনি একটি ব্যাপার আছে বলে মনে হয়।

কোন কণিকার অবস্থান নিশ্চিত করে জানতে গেলে অধিক শক্তির অর্থাৎ ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক কণিকা ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু বেশি শক্তির আলোক কণিকা বা ফোটনের অভিঘাতে পর্যবেক্ষণের কণিকাটির ভরবেগের অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ভরবেগের অনিশ্চয়তা কমাতে যদি অল্প শক্তির অর্থাৎ বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ফোটন ব্যবহার করি, তখন কণিকার অবস্থান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। কোন পরীক্ষার্থীর সত্যিকার মেধা, বিশেষ করে তার সৃজনশীলতা, প্রেষণা, বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি যাচাই করতে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা কার্যকর নয়। এখানে বিভিন্ন পরীক্ষকের বিচারের মধ্যে পার্থক্য কমাতে গিয়ে পরীক্ষার্থীর জ্ঞান সম্পর্কে অনিশ্চিত হয়ে পড়ছি আমরা। ব্যাপারটি আরো একভাবে দেখতে পারি আমরা।

পরীক্ষার সব প্রশ্নের জবাব যেখানে বাধ্যতামূলক, সেখানে পরীক্ষার্থীর জবাব থেকে সে কি জানে তাই শুধু আমরা জানতে পারি না, সে যা জানেনা সেটাও আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু এক্ষেত্রে সব পরীক্ষার্থী সমান সুবিচার লাভ করে না। কিছুটা ভাগ্য অর্থাৎ সম্ভাবনার নিয়ম কাজ করে। পরীক্ষকের প্রশ্ন নির্বাচনের উপরে বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে পরীক্ষার্থীর ফল, কারণ, পরীক্ষার্থীর প্রশ্ন বাছাই করার সুযোগ থাকেনা। পরীক্ষা পদ্ধতির এই অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলো কাজে লাগাতে হলে প্রতিটি পরীক্ষার উদ্দেশ্য আগে থেকেই নিরূপণ করা প্রয়োজন। পরীক্ষার ফলের মধ্যে যেন এই উদ্দেশ্যগুলো প্রতিফলিত হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে। অন্যদিকে যে মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়, পরীক্ষার ফলের মধ্যে তার উল্লেখ অবান্তর। শিক্ষাদানের ও শিক্ষা গ্রহণের মতন শিক্ষার মান যাচাই অর্থাৎ পরীক্ষাও একটি সৃজনশীল ও বুদ্ধিগত ব্যাপার হতে হবে।

বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল, পরীক্ষার্থীদের মেধা যাচাই আনুভূমিক। অর্থাৎ প্রশ্নপত্রগুলোর মানগত ধাপ প্রায় অভিন্ন। সব প্রশ্নই প্রায় একই রকম কঠিন বা সহজ। শিক্ষার্থী কতগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম তা এক্ষেত্রে নির্ভর করে কত বেশি প্রশ্নের জন্য সে প্রস্তুত এবং কত ভাল করে সে মুখস্ত করেছে এসব প্রশ্নের জবাব।

www.pathagar.com

কিন্তু প্রশ্নগুলো জটিলতার ক্রমানুসারে সাজানো যায়, সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, মেধা ও বুদ্ধির ধাপগুলো অনেক নিশ্চিতভাবে যাচাই করা সম্ভব হবে। একে বলতে চাই উল্লম্ব বিচার। সমতলে কতদূর হাটতে পারে তার বিচার নয়। পর্বত আরোহনের মতই কতটা উর্ধ্বে উঠতে পারে পথিক তার বিচার হবে এক্ষেত্রে। ত্রিকোণ কাচ বা প্রিজমের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন রং এর আলো যেমন বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে, পরীক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত দক্ষতা ও জ্ঞানের গভীরতার ভিত্তিতে সে তেমনি পৃথক হয়ে পড়বে অন্যান্যদের থেকে। এই ধরনের প্রশ্নপত্র অবশ্যই অত্যন্ত সৃজনশীলতার সঙ্গে প্রস্তুত করতে হবে।

বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থায় অনেকগুলো প্রশ্ন থেকে কয়েকটি প্রশ্নকে বাছাই করে নিতে পারে পরীক্ষার্থী। যে প্রশ্নগুলোর সে জবাব দেয় তার ভিত্তিতে তার জ্ঞানের বিচার হয়। কিন্তু যে প্রশ্নগুলোর সে জবাব দিল না, সে সম্পর্কে তার অজ্ঞতা যাচাই করার কোন পথ থাকে না। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের বিচার হল, কিন্তু তার অজ্ঞতার যাচাই হল না। মৌখিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু এ রকম ঘটে না। আর সেই কারণেই মৌখিক পরীক্ষা অনেক বেশি নির্ধারক পরীক্ষার্থীর প্রকৃত জ্ঞানের। সব প্রশ্নেরই জবাব দেবার প্রচলন ঘটলে, ছাত্রের পক্ষে বাছাই করে মুখস্ত করার প্রবণতাও কমবে।

রচনামূলক প্রশ্নের জবাব ছাত্ররা যে মুখস্ত করে, এই ব্যাধি দূর করবার একটি পদ্ধতি হলো প্রশ্নপত্রকে গতানগতিক না করে, সুনির্দিষ্টভাবে ও বিস্তৃতভাবে সংলাপের মতন দীর্ঘ প্রশ্ন তৈরি করা। অর্থাৎ প্রশ্নের প্রতিটি বাঁক প্রতিটি ধাপ ও কাঠামো দীর্ঘ সময় ধরে বুঝে, মেপে সাজিয়ে উত্তর দিতে হবে পরীক্ষার্থীকে। এক্ষেত্রে প্রশ্নপত্র স্বভাবতই দীর্ঘ হবে, কিন্তু পরীক্ষার্থী যতটা সময় নেবে প্রশ্ন বুঝতে ও চিন্তা করতে সে অনুপাতে জবাব হবে সংক্ষিপ্ত। এক্ষেত্রে মুখস্ত বিদ্যার চাইতে প্রাসঙ্গিক বিসয় সম্পর্কে উপলব্ধি ও জ্ঞানের গভীরতা বেশি প্রয়োজন পড়বে।

পাঠ্যসূচিতে যা কিছু অন্তর্ভুক্ত তার সব কিছু সমান গুরুত্ব পাবে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের সময়। ফলে, পাঠ্যসূচির নির্বাচিত অংশ মুখস্ত করে ভাল ফল আশা করবেনা কেউ। গৃহ শিক্ষক ও নোট বইয়ের সাহায্য নেবার প্রবণতা এতে কমে যাবে। পরীক্ষার খাতা দেখার সময় প্রতিটি প্রশ্নের জবাব পৃথকভাবে যাচাই করা হয় বর্তমানে। এর ফলে যে পরীক্ষার্থী একটি প্রশ্নে খুব অল্প নম্বর পেল সে অন্য একটি প্রশ্নে অনেক বেশি নম্বর পেতেও পারে। বুঝতে হবে, আমরা সমগ্র ছাত্রটিকে যাচাই করছি। বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্নভাবে কিছু তথ্য বা প্রশ্নের জবাব জানা নয়, বরং বস্তুত সমগ্র খাতাটি পড়ে একটি সামগ্রিক বিচার অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য।

পরীক্ষার্থীর মেধার মূল্যায়নের বর্তমান ব্যবস্থায় একটি বিষয়ে ফেল করলে পরীক্ষার্থীকে সার্বিকভাবে অকৃতকার্য বলে ঘোষণা করা হয়। এ ক্ষেত্রে বরং ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে লব্ধ নম্বর বা গ্রেড উল্লেখ করে পৃথকভাবে পাস করানো যেতে পারে। কিন্তু একটি বিষয়ের কতকগুলো প্রশ্নে অসম্ভব অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েও অন্য প্রশ্নগুলোতে উচ্চ নম্বর লাভ বেশি অসঙ্গতি পূর্ণ। সমন্বিতভাবে খাতাকে যাচই করার জন্য পরীক্ষককে অবশ্যই অত্যন্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ এবং চিন্তাশীল হতে হবে।

যে কথা আগেই উল্লেখ করেছি— পরীক্ষার্থীর সামগ্রিক মন ও পরীক্ষকের সামগ্রিক মনের মধ্যে অনুরণন ঘটতে হবে। একজন শিক্ষার্থীর মেধা যাচাই করে প্রাপ্ত

www.pathagar.com

নম্বর দ্বারা তা প্রকাশিত হয়। কিন্তু একটি নম্বরের মধ্যে এক একক বা এক বিট তথ্য থাকে। অন্যদিকে একটি বিসয়ে পরীক্ষার্থীর পারদর্শিতা একটি বহুমাত্রিক ব্যাপার। শিক্ষার্থীর প্রবণতা, জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা, সৃজনশীলতা, অর্জিত জ্ঞানের পরিমাণ, বিষয়ের প্রতি আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলো, পৃথক পৃথক তথ্য বহন করে শিক্ষার্থী সম্পর্কে। এই বহুমাত্রিক তথ্যকে একটি নম্বরে প্রতিফলিত করার মধ্যে মারাত্মক সংক্ষেপণ আছে। এর অর্থ অনেক বিট তথ্য পরীক্ষার ফলের মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু ও কথাটি অত্যন্ত ব্যতিক্রমী মনে হবে সবার কাছে জানি। যদি নম্বর তালিকায় বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব না হয়, অন্তত পরীক্ষার ফলের এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ একটি ক্রটিপূর্ণ বা অসম্পন্ন পরীক্ষার ফলকে সব কিছুর পরিমাপ বলে গণ্য করা উচিত নয়।

যেখানে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছে, শিক্ষকের সংখ্যা, শিক্ষার মান, এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে বিনিয়োগকৃত সময় ও শ্রম সীমিত, সেখানে এই মুহূর্তে পরীক্ষা ব্যবস্থা বা পদ্ধতিকে নির্ভুল ক্রটিমুক্ত করা হয়তো সম্ভব হবে না। কিন্তু সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল, পরীক্ষার ফল ও সার্টিফিকেট পরীক্ষার যোগ্যতা সম্পর্কে যতটটুকু তথ্য নিভরযোগ্য ও পরিমাণগতভাবে ধারণ করে, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব আমরা এর উপরে চাপাচ্ছি। অর্থাৎ পরীক্ষার ফল অতি ব্যবহৃত হচ্ছে ।

বিভিন্ন বোর্ডে পরীক্ষার্থীদের যে ক্রমিক মেধা তালিকা তা কি নির্ভরযোগ্যভাবে বা নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা যায়? পরীক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত অনিশ্চয়তার কথা হিসাব করলে? যদি না যায, তা হলে এদেরকে বিভিন্ন গ্রেডে ভাগ করে দেখালে অসুবিধা কোথায়? বস্তুতপক্ষে প্রথম দ্বিতীয় ইত্যাদি মেধাগত অবস্থান তুলে দিলে মেধাবী ছাত্ররা ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা ছেড়ে অনেকটা নিশ্চত ভাবে তাদের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত ও গভীর করতে পারতো। তাদের চিন্তা করবার ও সৃজনশীল কাজে অংশ নেবার সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি, বৃত্তিলাভ বা চাকরির ক্ষেত্রে পৃথক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচন ঘটতে পারে।

কম্পিউটারের সাহায্যে ফল প্রকাশের ফলে কখনো কখনো বিভ্রাট দেখা দিচ্ছে। একজন মেধাবী ছাত্র সব পরীক্ষায় ভাল ফল করেও হঠাৎ করে অস্বাভাবিক রকম খারাপ নম্বর পেয়ে অকৃতকার্য বলে ঘোষিত হবার ঘটনা ঘটেছে। বলা হচ্ছে, কোন নম্বর ভুল হওয়াতে অথবা সামান্য কোন চিহ্নের ক্রটির কারণে এই অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে, যা আগের প্রচলিত নিয়মে হত না। আসলে পুরানো প্রচলিত পদ্ধতিতে অনেক বাড়তি বা অপ্রয়োজনীয় তথ্য থাকতো, ইংরাজিতে যাকে আমরা Redundant intformation বলি। এ জন্যেই সাধারণ ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন ভুল হলে তা সংশোধন করা সম্ভব হয়, অতিরিক্ত তথ্যের সহায়তা নিয়ে ও অসামঞ্জস্য যাচাই করে। লিখিত ভাষার তুলনায় মৌখিক ভাষায় এই বাড়তি তথ্য আরো বেশি থাকে, কারণ এক্ষেত্রে একজন বক্তা, একজন লেখকের তুলনায় বেশি ভুল করে থাকে। যা আপাত দৃষ্টিতে বাড়তি মনে হয় তা আসলে ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়।

কম্পিউটার ব্যবহারের বেলায় সমস্ত বাড়তি তথ্য বাদ দিয়ে দেয়া হয়। এবং এটা করা হয় নৈর্ব্যক্তিক হবার ও দ্রুততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে। এর ফলে কোন সামান্য ভুল

www.pathagar.com

হলেও তা ধরবার বা অন্য বাড়তি তথ্যের সাথে সামঞ্জস্য যাচাই করে সংশোধন করার অবকাশ থাকে না। এই সমস্যা সমাধানের একটি পথ হল, কম্পিউটারে বাড়তি তথ্য সংযোজন করা। অর্থাৎ কম্পিউটারে আমাদের সাধারণ ভাষায় কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসা। খুব সহজেই নতুন প্রোগ্রাম এভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে যেখানে বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য যাচাই করে ভুল সংশোধনের অবকাশ থাকবে।

একজন শিক্ষার্থী কোন বিশেষ একটি পাবলিক পরীক্ষায় কতটা পারদর্শিতা দেখালো তা থেকে তার বুদ্ধিগত ও গুণের বিকাশের ধারা জানা সম্ভব নয়। কিন্তু পরীক্ষায় গ্রহণের এটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত যে শিক্ষার্থী সময়ের ভিতর দিয়ে কেমন ভাবে তার জ্ঞানের ও যোগ্যতার উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। এ জন্য পাবলিক পরীক্ষায় নম্বর পত্রের সঙ্গে শিক্ষার্থীর স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে পাওয়া নম্বর পৃথক ভাবে সন্নিবেশিত হতে পারে। শিক্ষার্থীর পাবলিক পরীক্ষার ফল ও স্কুলের পরীক্ষার ফল একত্রে যোগ করে তার মেধা যাচাই ঠিক হবে না। কারণ তুলনা করা আর যোগ করা এক কথা নয়। দুটো ভিন্ন জিনিস তুলনা করা যায়, কিন্তু যোগ করা যায় না। গণিতের নিয়ম অনুসারে যে-সব সংখ্যা যোগ করা যায় তারা একই সেটের ইলিমেন্ট হতে হয়। স্কুলের পরীক্ষার ফল ও পাবলিক পরীক্ষার ফল, এদিক থেকে একত্রিত হবার নয়, শুধু তুলনা করার যোগ্য। এই ব্যবস্থা যদিও শ্রম সাধ্য, কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এতে আমরা পেতে পারি, বিভিন্ন স্কুলের পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণের মান সম্পর্কে।

পরীক্ষার কাজে কম্পিউটার এখন ব্যবহৃত হচ্ছে শুধু নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর যাচাই, প্রাপ্ত নম্বর সমূহের বিন্যাস, মেধানুসারে পরীক্ষার্থীদের অবস্থান নির্ধারণ ইত্যাদি গতানুগতিক কাজে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ে কম্পিউটারকে অনেক বেশি সৃজনশীল ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। শিক্ষার্থীর তথ্য জানা, তথ্য বিশ্লেষণের দক্ষতা, কল্পনা শক্তি, ভাষা বোঝার দক্ষতা, সৃজনশীলতা, উপলব্ধির ক্ষমতা ইত্যাদি হচ্ছে তার ভিন্ন ভিন্ন পারদর্শিতা। এগুলো যাচাই করার জন্য সৃজনশীল ভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের ধারা প্রবর্তন করা যেতে পারে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা পৃথক ভাবে মূল্যায়ন ও তার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের কাঠামোকে সিমুলেট করা যেতে পারে কম্পিউটারের সাহায্যে।

প্রাপ্ত নম্বরগুলোর বিশ্লেষণ ও নানা রকম মিশ্রণ ঘটিয়ে এটি করতে হবে। এজন্য শুধু উপাত্ত সংগ্রহ নয়, তত্ত্ব উদ্ভাবনের ব্যাপার আছে, এবং তা যাচাই করার। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ শুধু উপাত্ত দেয়। কিন্তু এই উপাত্ত থেকে প্রকৃতির রহস্যোদঘাটন একটি জটিল প্রক্রিয়া, যেখানে তত্ত্ব নির্মাণ, তত্ত্ব যাচাই ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। সেখানে একটি আবিষ্কারের ব্যাপার আছে সৃজনশীলতার। পরীক্ষা ব্যবস্থাও তেমনি শিক্ষার্থীর সমস্ত ব্যক্তিত্ব, তার অর্জিত জ্ঞান, তার মেধা, প্রবণতা ও সম্ভাবনা যাচাইয়ের একটি পদ্ধতি রূপে ক্রমাগত শুদ্ধতা ও যথার্থ্যতা লাভ করতে পারে। কম্পিউটার এখানে সহযোগী রূপে কাজ করতে পারে একজন পরীক্ষকের।

www.pathagar.com

মোট কথা পাবলিক পরীক্ষার উপর থেকে চাপ কমাতে হবে, একে অসততার হাত থেকে রক্ষা করতে। বস্তুত সৃজনশীল কোন কর্মক্ষেত্রে — এমনকি খেলোয়াড়, সঙ্গীতকার বা চিত্রশিল্পীকে যাচাই করতে পরীক্ষার নম্বর নয়, বরং নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত সাফল্য দেখিয়ে টিকে থাকতে হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট একমাত্র মাপকাঠিরূপে ব্যবহৃত হবার ফলে একে অসাধুভাবে অর্জনের প্রবণতা এত বেশি। আমাদের দেশে সার্টিফিকেট বাজারের নোটের মতই মালিক নিরপেক্ষভাবে মূল্যপ্রাপ্ত। সেই জন্যই একে অসাধুভাবে অর্জন করলেও একে ব্যবহার করতে অসুবিধা হয় না। পরীক্ষায় অসাধুতা ও বিশৃঙ্খলা সামাজিক দুর্নীতির উপর যেখানে নির্ভরশীল, সেখানে শুধু প্রশাসনিক কৌশল এবং নিয়মের কঠোরতা বৃদ্ধি করে তা দূর করা সম্ভব নয়। কর্মক্ষেত্রে জ্ঞানবৃদ্ধি, সৃজনশীলতা ও দক্ষতার মূল্য ও প্রয়োজন না থাকলে মিথ্যা সার্টিফিকেটের লোভে অসাধুতা অব্যাহত থাকবে। আর এ জন্যই পরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের একটি সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থাপত্র দেয়া সম্ভব নয়।

প্রবন্ধটি ১৯৮৬ সালে কুমিল্লা বোর্ডের রজতজয়ন্তীতে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত।

www.pathagar.com

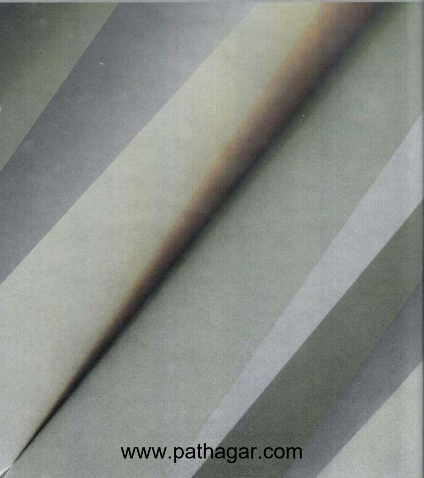

www.pathagar.com